KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর রহমান
Title চতুরঙ্গ	Size 7" x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ৫৭/১ ৫৭/২ ৫৭/৩	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪ কার্তিক-পৌষ ১৪০৪
	Condition : Brittle Good ✓
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ২ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম. ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

রামমোহনের ২২৫ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদের পরম্পরায় তাঁর দিগদর্শনকারী ভূমিকার মূল্যায়নে প্রবাদপ্রতিম প্রফেসর আর. কে. দাশগুপ্তর সন্দর্ভ।

এতদিনের যাবতীয় আলোচনার দুটি পর্যায়কে অতিক্রম করে রামমোহন-চর্চাকে ভিন্ন পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার দুঃসাহসী প্রয়াসে ড. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে রামমোহন : তৃতীয় পর্যায়'।

'ঔপনিবেশিক পূর্ব ভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক' — সন্দর্ভটির এবারেই দীর্ঘতম শেষ কিস্তি।

'অভিনয় প্রসঙ্গে' — শম্ভু মিত্র। চতুরঙ্গের পুরনো সংখ্যা থেকে আজও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক নিবন্ধটির পুনর্মুদ্রণ।

এই সঙ্গে ভারতীয় থিয়েটারের মাইলস্টোন রূপে চিহ্নিত শম্ভু মিত্র-র তিনটি নাট্যপরিচালনাকে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে স্মৃতি থেকে জাগরূক করেছেন তাঁরই এককালের অনুজপ্রতিম সহকর্মী কুমার রায়।

প্রাগে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বিদুষী চেক অধ্যাপিকার মৌলিক বাংলা নিবন্ধ — 'পারিবারিক জীবনের মনোবিজ্ঞানী আশাপূর্ণা দেবী'।

সিলেটের এক বিস্মৃতপ্রায় কবি আব্দুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীর জীবন ও কবিতা নিয়ে আলোচনা।

উচ্চশিক্ষার হাল এবং অধ্যাপকদের দায়িত্ব নিয়ে ইউ. জি. সি. কমিটির রিপোর্টের নানা দিক খতিয়ে দেখছেন প্রফেসর অতীন্দ্রমোহন গুণ।

বহু আলোচিত 'অনুমোদিত জীবনী' গ্রন্থটির আলোচনা প্রসঙ্গে স্বয়ং জ্যোতি বসুর ব্যক্তিত্বের স্বরূপসন্ধান।

চতুরঙ্গ

... মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মনের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা...
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে...
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে...

— শ্রীমা

বর্ষ ৫৭ সংখ্যা ২
শ্রাবণ-আশ্বিন ১৪০৪

■ রাজা রামমোহন রায় এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পরম্পরা	রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত	১০৮
■ ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে রামমোহন : তৃতীয় পর্যায়	শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়	১১৪
■ দূর থেকে	কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	১৩০
গান	সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	১৩১
ছুটি নিতে হবে	সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	১৩২
সাতান্নেও মনে হয়	পবিত্র মুখোপাধ্যায়	১৩৩
ধ্বনিমণ্ডল	আনন্দ ঘোষহাজরা	১৩৪
উপাদান	মঞ্জুষ দাশগুপ্ত	১৩৫
এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে-৭	উত্তম দাশ	১৩৬
বেশ তো স্বপ্ন রচনা করছো	মেঘ মুখোপাধ্যায়	১৩৭
■ ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক	বিনয় চৌধুরী	১৩৮
■ পীরথানে আজ প্রদীপ জ্বালতে দেবে না	অশোকেন্দু সেনগুপ্ত	১৫৩
■ অভিনয় প্রসঙ্গে	শম্ভু মিত্র	১৫৯
■ শম্ভু মিত্র: চৈতন্যে সম্পৃক্ত তিনটি নাটক	কুমার রায়	১৬১
■ পারিবারিক জীবনের মনোবিজ্ঞানী আশাপূর্ণা দেবী	হানা প্রাইনহেলত্রোভা	১৬৮
সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি		
■ বঙ্কিম প্রসঙ্গে : 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর রচয়িতা কে?	আদিত্য ওহদেদার	১৭৩
■ আজকের সিলেট এবং এক বিস্মৃতপ্রায় কবি	দেবযানী দত্ত, রণবীর সমাদ্দার	১৮১
গ্রন্থসমালোচনা		১৮৬
পুলকনারায়ণ ধর ■ দিব্যেন্দু হোতা ■ ভবানী-প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ■ অশোকেন্দু সেনগুপ্ত		
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত ■ অসীম রেজ ■ রণেন্দ্রনাথ দেব ■ বেণু গুহঠাকুরতা ■ আবদুর রউফ		
শিক্ষা		২০৫
■ উচ্চশিক্ষার হাল এবং অধ্যাপকদের দায়িত্ব	অতীন্দ্রমোহন গুণ	
বিতর্ক		২১১
■ প্রসঙ্গ 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'	নজরুল ইসলাম	
চিঠিপত্র		২১৪
■ সন্তোষকুমার দে, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, সুজন বন্দ্যোপাধ্যায়, বনশ্রী চৌধুরী, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়		
■ সম্পাদকের নিবেদন		২১৮

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক ইম্প্রেশন হাউস, ৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত,
অক্ষর বিন্যাসে র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, ৪৩ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

অফিস : ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা-১৩ দূরভাষ : ২৭-৩৭৭০
শিল্প পরিকল্পনা : রণেন আয়ন দত্ত
সম্পাদক : আবদুর রউফ

Philips, Siemens, Siemens Matsushita, Tatas, ACC, Reliance, Helios, GEC-Alsthom, Dun & Bradstreet, Price Waterhouse, Gestetber, Simoco, Modi Telstra, RPG Sprint, IBM, HCL-HP, Sema, Apple, PCL.

The key Players are in action

In West Bengal

Today electronics majors from India and the world crowd the planned infrastructure of Saltlec, India's only fully integrated electronics complex in Calcutta. With a modular, walk-in, Standard Design Factory and an in-home, modern, all world telecommunication network run by Videsh Sanchar Nigam Ltd (VSNL). With several test houses of international standard, an indo-German Vocational Training Centre for Electronic Test Engineering (CETE), a Software Technology Park. A future compatible infrastructure for IT—'Infinity, the intelligent City is coming. The work on the first phase of Infinity—Think Tank Towers is progressing as scheduled.

Work on many more such facilities are commencing shortly. Side by side training centres, finishing schools and new technical institutes are coming up with special emphasis. Exclusive electronic complexes are coming up in various districts of the state.

All of these have made Webel the leading electronics industry development agency in India—a resource base for the country and beyond. Major projects are proceeding apace not only in Calcutta but out in the districts of West Bengal—the choice of key electronics companies from across the globe.

Webel West Bengal Electronics Industry Development Corporation Limited

Webel Bhawan, Block EP & GP, Sector V, Salt Lake, Calcutta 700 091, India
Phone : 91-33-357 1710/1725/1740 Fax : 91-33-357 1739/1708
E.Mail Webel @giasclo1.vsnl.net.in.

রাজা রামমোহন রায় এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের পরম্পরা

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

রাজা রামমোহন রায়ের আন্তর্জাতিকতাবাদ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তাঁর ইংরেজি জীবনীকার সোফিয়া ডবসন কোলেট লিখেছেন: 'রাজা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যভাবাপন্ন প্রাচ্যপুরুষ ছিলেন না, ছিলেন না একজন ইউরোপীয়ের সংশয়াচ্ছন্ন হাবভাবসম্পন্ন মার্জিত হিন্দু... আমরা দেখব যে তিনি আমাদের চালিত করেছেন এমন এক সভ্যতার দিকে যা পাশ্চাত্যেরও নয় প্রাচ্যেরও নয়, উপরন্তু এই দুটির যে কোনও একটির চেয়ে বৃহত্তর এবং মহত্তর কিছু।'[১]

এটা যে আধুনিক ভারতের প্রথম আন্তর্জাতিকতাবাদীর বিশ্বজনীন আত্মার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এক মূল্যায়ন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদ নিছক রাজনৈতিক আন্তর্জাতিকতাবাদ ছিল না: তা আসলে ছিল মানুষে মানুষে পারস্পরিক সৌহার্দের প্রতি এমন এক আস্থা, যা দুনিয়ার অগ্রগতিকে সম্ভব করে তোলে। ইউরোপের ইতিহাসে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রথম প্রকাশ ঘটেছিল আইনের ধারা হিসাবে। যে-আইনে যুদ্ধকালে এবং কূটনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সমঝোতামূলক আচরণবিধি নির্দেশ করা হত। ওয়েস্টফেলিয়া কংগ্রেস (১৬৪৮), উট্রেকটের শান্তি চুক্তি (১৭১৩), ভিয়েনা কংগ্রেস (১৮১৪-১৫) এবং ভেরোনা সম্মেলন — এগুলি সবই ছিল আন্তর্জাতিকতার মাপকাঠিতে অত্যন্ত রক্ষণাত্মক সমঝোতা। এমনকী আন্তর্জাতিক আইনের সেই কালজয়ী গ্রন্থ De Jure Belli ac Pacis যেটি লিখেছেন হুগো গ্রোটিয়াস, সেটি জাতিতে জাতিতে রাজনৈতিক এবং রণনৈতিক সদাচার বজায় রাখার সূত্রসন্ধান মাত্র — এর মধ্যে বিশ্বভ্রাতৃত্বভাবনা নেই। আবার টেনিসন যখন 'Locksley Hall' (১৮৪২)-এ 'The Parliament of Man, the Federation of the World' এর কথা বললেন তাতেও মাছ ধরার অধিকারের কিছু সুবিধাজনক রেগুলেশন প্রবর্তন ছাড়া আর বেশি দূর এগোয়নি সেদিনের সেই আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। ইংলিশ চ্যানেলে ১৮৪৩ সালে ফরাসিদের অনধিকার প্রবেশের ফলে যে-উদ্যোগ নেওয়া জরুরি হয়ে পড়েছিল। তার বহু বছর পরে যখন ওয়াল্ট হুইটম্যান বলেছিলেন, 'ভূমণ্ডল কি তবে এতদিনে অভিন্ন হৃদয় হয়ে উঠছে?' তখনও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক তৎপরতা বেরিং সাগরে সামুদ্রিক সিল শিকার নিয়ন্ত্রণ করার কিছু ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল (১৯১১)।

উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক শৃঙ্খলা সম্বন্ধে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গি, মূলত এক মানবিক অথবা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা যখন বিশ্বসমাজ বিষয়ে রামমোহনের অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘোষণার কথা স্মরণ করি, সম্ভবত আধুনিক যুগে একজন এশিয়াবাসীর তরফে এ ধরণের ঘোষণা এই প্রথম, আমরা তৎক্ষণাৎ আবিষ্কার করি, কোনও রাজনৈতিক সুবিধালাভের প্রেরণায় এই ঘোষণা উচ্চারিত হয়নি। এই ঘোষণা মূলত সমগ্র মনুষ্যপ্রজাতির একতায় গভীর বিশ্বাসের এক অভিব্যক্তি। ১৮৩২-যে লন্ডনে বসে ফরাসি বিদেশমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে রামমোহন লিখেছিলেন:

> *'এটা সাধারণত এখন স্বীকার করা হয়ে থাকে, কেবল ধর্মই নয় বরং পক্ষপাতশূন্য কাণ্ডজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণানির্ভর নিখুঁত অনুমানের দ্বারা এমন সিদ্ধান্তে আসা যায় — সকল মনুষ্যপ্রজাতি একটি বিরাট পরিবার যাতে বিদ্যমান নানা জাতি উপজাতিগুলি বিচিত্র শাখাপ্রশাখা ছাড়া আর কিছুই নয়।'*[২]

এই হচ্ছে ইতিহাসে ইউরোপের এক রাজধানীতে পাঠানো প্রাচ্য-ভাবনার আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধের প্রথম দৃষ্টান্ত। এই দৃষ্টান্ত এই কারণে তাৎপর্যপূর্ণ — এ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতার বোধ একই সঙ্গে ধর্মীয় এবং বিজ্ঞাননির্ভর চিন্তাপ্রসূত। হয়ত এই লক্ষণও সমান মূল্যবান — রামমোহন কোনও কাব্যিক বা দার্শনিক স্তরে তাঁর ভাবনাকে বিমূর্ত করে তোলেননি। ওই চিঠিরই অন্য জায়গায় তিনি একটি অনুচ্ছেদে লিখেছেন:

> *'সাংবিধানিক সরকারের লক্ষ্য বেশ ভালভাবেই অর্জন করা যাবে, যদি উভয়পক্ষের পার্লামেণ্ট থেকে সমসংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত এক কংগ্রেসের কাছে দু'দেশের রাজনৈতিক মতপার্থক্যগুলি উপস্থিত করা যায়; সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত উভয় জাতিই মেনে নেবে এবং প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে এক এক জাতির মধ্যে থেকে কংগ্রেসের চেয়ারম্যান মনোনীত হবে...'*

অর্থনৈতিক অবরোধ, বাণিজ্যিক বাধাদান অথবা সশস্ত্র হস্তক্ষেপের কোনও প্রস্তাবই তিনি দেননি। মধ্যস্থতা হবে সংঘর্ষহীন এবং মানবিক পন্থায়। তাঁর অভিমত ছিল:

> *'এই ধরনের এক কংগ্রেসে সাংবিধানিক সরকার দ্বারা শাসিত দুটি সুসভ্য দেশের অধিবাসীদের স্বার্থহানি হচ্ছে এমন সমস্ত মতপার্থক্য — তা রাজনৈতিক বা বাণিজ্যিক যাই হোক না কেন — বন্ধুত্বপূর্ণভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে উভয় দেশেরই সন্তোষ সাপেক্ষে মীমাংসা করে নেওয়া উচিত। এবং প্রজন্মের পর প্রজন্মব্যাপী তাদের মধ্যে গভীর শান্তি ও বন্ধুভাব বজায় রাখা উচিত।'*[৩]

সম্ভবত আন্তর্জাতিকতাবাদের আলোচনায় রামমোহনের এই পত্রটির ঐতিহাসিক তাৎপর্য এখনও স্বীকৃত হয়নি। তা সত্ত্বেও বলা যায় রামমোহনের কাল থেকে ধরলে এই চিঠিটির অন্তর্নিহিত ভাবই ভারতীয় আন্তর্জাতিকতাবাদের ভিত্তি। এই ঘোষণায় দুটি জিনিস লক্ষ করার মতো। প্রথমত, বিশ্বসংসারের এক অখণ্ড রূপের প্রতি গভীর বিশ্বাসের দ্বারা চিঠিটি অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক শান্তি সংস্থাপনের উপায় স্বরূপ যে-আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলা হবে তা কিন্তু নিজেদের স্বার্থ দেখার জন্য সমবেত হয়েছে এমন শক্তিমান জাতিগুলির সংগঠন হবে না। বরং সেই সংগঠন সুখী ও প্রগতিশীল এক মানবসমাজ গঠনের লক্ষে উদ্যোগী মানব প্রজাতির সমবেত বিবেকের মূর্তরূপ হিসাবে প্রতিভাত হবে। রামমোহন মানব ভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক সংগঠন বিষয়ে ইউরোপের এক রাষ্ট্রনায়কের কাছে তাঁর পর্যবেক্ষণলব্ধ ধ্যানধারণাগুলি প্রকাশ করতে ব্যগ্র হয়েছিলেন — এরকম ব্যগ্রতার সম্ভাব্য কারণ বলে যা মনে হয়, তিনি জানতেন, একজন উদারনীতিবিদ ইংরেজ ইতিমধ্যেই ইউরোপ মহাদেশে এ ধরনের ভাবনাগুলিকে আলোচনার বিষয়বস্তু করে তুলেছিলেন। এটা জেনে বেশ ভাল লাগে ইউরোপীয় চিন্তাবিদ্‌দের মধ্যে আন্তর্জাতিকতাবদীরূপে রামমোহনের ভূমিকার প্রথম সমঝদার ছিলেন জেরেমি বেন্থাম — তিনিই 'আন্তর্জাতিক' শব্দটি উদ্ভাব করেছিলেন।[৪] এই একেশ্বরবদী দার্শনিক রামমোহন সম্বন্ধে বলেছিলেন যে তিনিই হলেন তাঁর 'মানবসেবাকর্মের অতি প্রশংসাভাজন এবং একান্ত প্রীতিভাজন সহযোগী'।[৫] বেন্থাম নিজে কান্টের 'লিগ ফর পিশ'-এর[৬] আদর্শের দ্বারা কতদূর পর্যন্ত প্রভাবিত হয়েছিলেন তা বলা কঠিন। কিন্তু রামমোহন যে তাঁর সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের আদর্শের একজন অত্যুৎসাহী সমর্থকরূপে বেন্থামকে খুঁজে পেয়ে অতীব সুখী হয়েছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এক শতাব্দীরও অধিক সময় পরে বার্ট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেছিলেন 'Promised benefits of Governments' চিরস্থায়ী করতে একটি 'new international social contract.'[৭] বেন্থাম এবং রামমোহন তেমনটিই কামনা করে ছিলেন। উভয় মনীষীই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে তাঁদের চিন্তাভাবনা আগ্রহের দ্বারা তাড়িত হয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।

রামমোহনের বিশ্বচিন্তা পরাধীন দেশের একজন মানুষের পক্ষে অতি আশ্চর্যজনক ঘটনা। স্পেনে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম এবং অষ্ট্রিয়ার জোয়াল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে ইতালির সংগ্রাম তিনি গভীর আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করেছিলেন। ভাল সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য আয়ারল্যান্ডের বিক্ষোভ আন্দোলন তাঁকে উত্তেজিত করেছিল ঠিক যেমন আমেরিকার দাসপ্রথা নিয়ে সংঘর্ষ তাঁকে গভীরভাবে উদ্দীপিত করেছিল। নেপল্‌সে জনকল্যাণমুখী আন্দোলনের ব্যর্থতার কথা শোনার পর তিনি তাঁর বন্ধু বাকিংহামকে লিখেছিলেন:

> *'এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে আমি বাধ্য হচ্ছি, ইউরোপের জাতিগুলির স্বাধীনতার সার্বিক রূপায়ণ আমি দেখে যেতে পারব না। এবং এশিয়ার জাতিগুলিরও, বিশেষ করে যেগুলি ইউরোপের উপনিবেশ। এখন তারা যেসব সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ অধিকার তাদের করায়ত্ত হয়েছে — এমন অবস্থা আমি দেখে যেতে পারব না। এরকম অবস্থায় আমি নেপোলীয়দের অভীষ্টকে আমার নিজের অভীষ্ট বলেই বিবেচনা করছি, তাদের শত্রুকে আমার শত্রু মনে হচ্ছে। স্বাধীনতার শত্রুরা এবং স্বৈরতন্ত্রীদের বন্ধুরা কখনও শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পারেনি আর কখনও পারবেও না।'*[৮]

১৮৩০-এর জুলাইতে প্যারিসে যে তিনদিনের বিপ্লব ঘটেছিল সে খবর তাঁর কানে এলে তিনি অপরিসীম উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন। স্পেনে সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার ঘটনাটিকে উদ্‌যাপন করার জন্য কলকাতায় এক নাগরিক

ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন। হাউস অব লর্ডসে পেশ করা (এপ্রিল ১৮৩২) রিফর্ম বিলটি দ্বিতীয়বার পড়ার পর তিনি তাঁর এক ইংরেজ সুহৃদকে লিখেছিলেন: *'সংগ্রামটা কেবল সংশোধনপন্থী এবং সংশোধনবিরোধীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। বিশ্বব্যাপী নিপীড়ন এবং মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, ন্যায় এবং অন্যায়, ঠিক ও বেঠিকের মধ্যে এই সংগ্রামটা চলছে।'*[৯]

আন্তর্জাতিক বিষয়ে রামমোহনের প্রবল আগ্রহ এবং আন্তর্জাতিকতার আদর্শের মূল নিহিত ছিল জনসাধারণের কল্যাণ চিন্তার মধ্যে। এই আন্তর্জাতিক কল্যাণ প্রয়াসের ফলেই এক একটি স্বতন্ত্র জাতির মঙ্গল সুনিশ্চিত হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর ইংরেজি জীবনীকার মন্তব্য করেছেন, রামমোহন অত্যন্ত গভীরভাবে 'স্বর্গত রাসেল লওয়েলের মতোই অনুভব করতেন, *'কোনও জাতির কোনও লাভ বা লোকসানের সমান হকদার আর বাকি জাতিগুলি'*।[১০] ইংলন্ডে ও অন্যান্য দেশে যাঁরা রামমোহনকে কাছ থেকে দেখেছিলেন তাঁর উদার ধ্যানধারণা তাঁদের সকলকেই অভিভূত করেছিল। আমেরিকান একেশ্বরবাদী চ্যানিংকে এক চিঠিতে লুসি একিন লিখেছেন: 'ঠিক এই মুহূর্তে আমার অনুভূতিগুলি আগেকার চেয়ে ঢের বেশি বৈশ্বিক হয়ে উঠেছে। রামমোহন রায়ের সাক্ষাৎ লাভের পর থেকে তাবৎ বিশ্ব ব্যাপারে আমি ব্যক্তিগত আগ্রহ বোধ করি।'[১১]

এটা অদ্ভুত মনে হতে পারে যে এক পরাধীন জাতির প্রতিভূ হয়েও তিনি অন্যান্য জাতির স্বাধীনতা নিয়ে কেমন চিন্তিত ছিলেন অথচ নিজের দেশে জাঁকিয়ে বসা বিদেশি প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি কথাও উচ্চারণ করেননি। প্রকৃতপক্ষে, পরবর্তীকালের উপনিবেশবিরুদ্ধতা এবং পশ্চিমের আধিপত্যবাদের বিপক্ষে এশিয়ার দেশগুলির আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি রামমোহনের দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চয়ই বিস্ময় উদ্রেক করে। কিন্তু আন্তর্জাতিক সহযোগিতার চিন্তাই তাঁর মধ্যে জন্ম দিয়েছিল এ ধরনের মানসিকতা। তিনি মনে করতেন ভারতে ব্রিটিশের আগমন সৃষ্টি করেছে এমন এক ঐতিহাসিক সম্ভাবনা যাকে স্বাগত জানানোই বাঞ্ছনীয়। কারণ এর ফলে আধুনিক ইউরোপের জ্ঞান, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বীজ এশিয়ার জমিতে প্রোথিত হবে।'[১২] পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয় মনের সম্ভাব্য সৃজনশীল প্রতিক্রিয়ার যে ভাবনা তাঁর মাথায় এসেছিল তা ছিল মেকলের চিন্তার পূর্বগামী। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় শিক্ষানীতি বিষয়ে লর্ড আমহার্স্টকে সেই সময় তিনি যে ঐতিহাসিক পত্র দিয়েছিলেন ১৮৩৫-এর শিক্ষানীতি বিষয়ক প্রস্তাবের খসড়া রচনায় তার প্রভাব অনস্বীকার্য।[১৩]

অধ্যাপক টয়নবি যাকে রামমোহনের syncretism বলেছেন, তা কিন্তু জাতীয় জীবনে শিকড়হীন ধর্ম এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তাঁর চিত্তের বৈচিত্র্যময় অথচ অগভীর ঔদার্যের ব্যাপার ছিল না মোটেই। তাঁর বিশ্বজনীনতায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বর্জনের আহ্বান ছিল না। ধারণাটা স্পষ্ট হবে না যদি না আমরা উপলব্ধি করি রামমোহন তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের চেতনায় রাজনৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় জীবনকেই অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। এটা ছিল সারত এক ধরনের অখণ্ড আন্তর্জাতিকতাবাদ। কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা বিস্তারের অভিপ্রায়ে, এমনকী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেও জাতিগুলির সম্মেলন হিসাবে তিনি এটাকে ভাবেননি। তাঁর আন্তর্জাতিকতার ভাবনা যে-কোনও জাতির কিংবা ব্যক্তির জীবনের অখণ্ডতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল — সমস্ত মানবিক চাহিদা — বৌদ্ধিক, নৈতিক অথবা আধ্যাত্মিক — যাবতীয় প্রয়োজনের সঙ্গে এর যোগ ছিল। যে কারণে আন্তর্জাতিকতাবাদকে তিনি ভেবেছিলেন মানবসভ্যতার বিকাশে একটি সৃজনশীল আদর্শরূপে। তাই তো অমল হোমের মতো বিশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তি যথাযথভাবেই এই কথাগুলি বলেছেন:

> 'রাজার দৃষ্টিভঙ্গিতে, তাই, আন্তর্জাতিকতাবোধের বিবর্তন, এমনকী সর্বজনীন রাষ্ট্রের অর্থ মোটেই এরকম ছিল না যে জাতীয়তার পার্থক্য অথবা বৈচিত্র্যগুলি বিলিন হয়ে যাবে। কিংবা ঐতিহাসিক ধর্মগুলি একটি অপরটির সঙ্গে মিশে যাবে। তার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। বরং প্রত্যেকটি মহান জাতির ঐতিহাসিক ধর্মগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে ও সংযোগে এবং সমকেন্দ্রাভিমুখতায় পূর্ণতররূপে বিকশিত হবে।'[১৪]

ভারতের উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর উদারনৈতিক আন্দোলনের পিছনে রামমোহনের আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রভাব সন্ধান করতে চাইলে আমাদের অবশ্যই এর আধ্যাত্মিক মূলটিকে বুঝতে হবে। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বেলায় আন্তর্জাতিকতাবাদের অর্থ এমন এক আধ্যাত্মিক আদর্শের উপলব্ধি যে-উপলব্ধি বিশ্বজোড়া প্রাণের ঐক্যের বিশ্বাস দ্বারা পরিপুষ্ট। আরও লক্ষ করার বিষয়, পরবর্তীকালের অতিমাত্রায় রাজনীতিমনস্ক ভারতীয় দেশপ্রেমিকরা, এমনকী যাঁরা সশস্ত্র ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তাঁরাও রামমোহনের আধ্যাত্মিকতাবাদের শক্তি উপলব্ধি করতে ভুল করেননি। তাঁদের অন্যতম একজন, বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন: 'রামমোহনের দেশপ্রেম ছিল বিশ্বজনীন মানবতার অনুরাগে উত্তরণের একটি সোপান, যে-অনুরাগ ব্যাপ্ত ছিল মনুষ্যকুলের সমস্ত জাতির প্রতি। এমনকী বিশ্বমানবতার প্রতি এই অনুরাগ ছিল তাঁর ভগবৎপ্রেমের পূর্ণতম উপলব্ধির পথেও একটি পদক্ষেপ।'[১৫]

স্পষ্টতই ভারতীয় জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা লাভের ফলেই রামমোহনের মনে ঐক্যের এবং বিশ্বজনীনতার প্রতি একান্ত উষ্ণ অনুরাগের উদ্ভব ঘটেছিল। বহু জাতি, ধর্ম এবং ভাষার বৈচিত্র্যময় এক দেশে স্থায়ী সামাজিক এবং রাজনৈতিক

শৃঙ্খলা স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় উদ্যোগী এক সংস্কারক রূপে রামমোহন জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থেই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের চূড়ান্ত গুরুত্ব অতি গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, জাতিকে রাজনৈতিক দিক দিয়ে স্বাধীন করার কোনও পরিকল্পনা না থাকায় তাঁর মতো একজন সংস্কারক সমস্ত ধরনের উগ্র এবং অন্ধ জাতীয়তাবাদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছিলেন। তৃতীয়ত, সর্বজীবে ঐক্যের বৈদান্তিক জ্ঞান এবং নানক, দাদু কবিরের মতো মধ্যযুগের অতীন্দ্রিয়বাদীদের ধর্মীয় সমন্বয়বাদী প্রয়াসের[১৬] প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এক বিশ্বজনীন মানবসমাজ স্থাপনে তাঁর বিশ্বাসকে দৃঢ় করেছিল। চতুর্থত, তিনি ছিলেন প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন এক ধর্মতত্ত্ববিদঃ হিন্দু, ইহুদি, খ্রিস্টীয় ও ইসলামের ধর্মশাস্ত্রগুলি মূলভাষাতেই তিনি পড়েছিলেন এবং পড়েছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদের আলোকে, ফলে তাঁর পক্ষে সকল ধর্মের মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল।

বেদ বাইবেলের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে তাঁর যে পদ্ধতি, মনোযোগ দিয়ে তা অনুধাবন করলে দেখা যাবে মূল পাঠের ভাষ্যরচনায় তিনি সর্বপ্রযত্নে যে-কোনও ধরনের জবরদস্তিমূলক সমতাসাধনের প্রবণতা থেকে বিরত থাকতেন। তিনি ধর্মসমূহের মতবাদিক স্বচ্ছতাকে মূল্যবান জ্ঞান করতেন আর যুক্তিতর্কে সুবিধা লাভের জন্য কখনও একটি শব্দেরও বিকৃতি ঘটাননি। বৈদান্তিক ধর্ম, একেশ্বরবাদী খ্রিস্টনীতি এবং ইসলামের মধ্যে তিনি মৌলিক ঐক্য আবিষ্কার করেছিলেন। এই আবিষ্কারের নিরন্তর প্রয়াসের ফলে তিনি এমন একটা স্তরে পৌঁছেছিলেন যেখানে তাঁর তাত্ত্বিক অনুসন্ধানলব্ধ সিদ্ধান্ত তাঁর ধর্মীয় অভিজ্ঞতাকে গভীরতা দান করেছিল। যারা একটি বিশেষ ধর্মের মানুষ হয়ে জন্মায়নি তারা কীভাবে সেই ধর্মকে অভ্যর্থনা জানাবে, তা নিয়ে সেন্ট পলের মতো উদ্বেগে তিনি বিন্দুমাত্র ভুগতেন না। যেহেতু তাঁর ধর্মান্তরকরণের কোনও পরিকল্পনা ছিল না তাই অভ্যর্থনার ব্যাপারেও তিনি মোটেই ভাবিত ছিলেন না।[১৭] আসলে ধর্মবিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অর্জনের এবং যাবতীয় আলোচনার উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় ঐক্য সাধন। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে মনিয়ের উইলিয়ামস মন্তব্য করেছিলেন, সারা বিশ্বে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র নিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক একাগ্রচিত্ত সত্যসন্ধানী যাঁরা জন্মেছেন, সম্ভবত রামমোহন ছিলেন তাঁদের পুরোগামী।[১৮] তাঁর অন্বেষা ছিল বিজ্ঞানভিত্তিক এবং ধর্মীয় সত্যের সর্বজনীনতা আবিষ্কার ছিল তাঁর লক্ষ্য। রামমোহন বৈশ্বিক ঐক্য সাধনের সূত্র হিসাবে মূল্য দিতেন এই ধর্মীয় বিশ্বজনীনতার বোধকে। তিনি তাঁর Precepts of Jesus (1820) পুস্তিকার মুখবন্ধে লিখেছিলেন,

> *'তামাম মানবজাতির মধ্যে শান্তি এবং সংহতি বিধানের লক্ষ্যেই নৈতিক উপাদেশাবলী পরিচালিত। যে সব উপদেশ শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত সবার কাছেই সমান বোধগম্য। এ সবের সঙ্গে আধিবিদিক প্রাককথনের কোনও সম্পর্ক নেই।'*[১৯]

ধর্মীয় অনৈক্য এবং অসহিষ্ণুতার কারণে বিভেদপূর্ণ এক দুনিয়ায় রামমোহন আন্তর্জাতিক সংহতি বিধানের কথা ভাবতে পারতেন না। রাজার প্রয়াণের শতবার্ষিকী উপলক্ষে অক্সফোর্ডের ম্যানচেস্টার কলেজে দেওয়া ভাষণে ড. ডব্লিউ. এইচ. ড্রামণ্ড তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে এই প্রবল ধর্মীয় উপাদানের ওপর জোর দিয়ে বলেছিলেন, 'তাঁর ঈশ্বরানুরাগ তাঁকে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী করে তোলেনি। এই অনুরাগ তাঁকে সংযুক্ত করেছিল সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে, কেননা সকল মানুষই কি ঈশ্বরের সন্তান নয়? তাঁর আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রকৃত উৎস নিহিত ছিল এই ভাবনার মধ্যে'।[২০] □

উল্লেখপঞ্জি :

১. সোফিয়া ডবসন কোলেট, Life and Letters of Raja Rammohun Roy, কলকাতা, ১৯১৩, পৃষ্ঠা ২২৭
২. অমল হোম সম্পাদিত Rammohum Roy, The Man and his work, কলকাতা, ১৯৩৩, পৃষ্ঠা ১১৭
৩. ঐ
৪. জেরেমি বেন্থাম, Introduction to the Principles of Morals and Legislation, ১৭৮৯ Chapter xvii সেকশন ২৫-এর ফুট নোট। C.K. Ogden সম্পাদিত জেরেমি বেন্থামের The Theory of Legislation, ১৯৫০ Pg. xxi; C.J. Colombus সম্পাদিত Jeremy Bentham's Plan for an Universal and Perpetual Peace, ১৯২৭ পৃঃ ৩। G.P.Goock কান্টকে বলেছেন 'The founder of sane internationalism', 'The French Revolution as a World Force', F.S.Marvin সম্পাদিত The Evolution of World Peace, ১৯২১ পৃঃ ১১৭।
৫. রামমোহনকে লেখা বেন্থামের পত্র : J. Bowring সম্পাদিত The Works of Jeremy Benthem, ১৮৪৩, পৃঃ ৫৮৯।
৬. ১৭৯৫ তে তাঁর Pepetual Peace গ্রন্থে কান্ট 'advocates a federation of free states, bound together by a convenant forbidding war' দ্রষ্টব্য বারট্রান্ড রাসেলের History of Western Philosophy ১৯৪৬, পৃঃ ৭৩৮।
৭. বারট্রান্ড রাসেল Histoy of Western Philosophy, ১৯৪৬, পৃঃ ৬৬৪–৬৫
৮. ১-এর অনুরূপ, পৃঃ ৭২
৯. ঐ পৃঃ ১৯৩
১০. ঐ পৃঃ ৭২
১১. মেরি কারপেন্টার The Last Days in England of the Raja Rammohun Roy, কলকাতা, ১৯১৫, পৃঃ ১২৩

১২. The English Works of Raja Rammohun Roy, এলাহাবাদ, ১৯০৬, পৃঃ ৪৭২
১৩. আর. কে. দাশগুপ্ত, 'Macaulay's Writings on India'। C.H. Philips সম্পাদিত Historians of India, Pakistan and Ceylon, ১৯৬১, পৃঃ ২৩৭
১৪. অমল হোম সম্পাদিত Rammohun Roy, The Man and His Work ১৯৩৩, পৃঃ ১০৩
১৫. ঐ পৃঃ ২০৪
১৬. The English Works পৃঃ ৯৬, ২১১
১৭. R.C. Zaehiner, Foolishness to the Greeks, ১৯৫৩, পৃঃ ১৩
১৮. Monier Williams, 'Religious Thought and Life in India' ১৮৮৩, পৃঃ ৪৭৯
১৯. The English Works পৃঃ ৪৮৪–৮৫
২০. ১৪-এর অনুরূপ পৃঃ ৫১৭

রামমোহন রায়ের রচনাসংগ্রহ

ক. আরবি-ফারসি

১. তুহ্‌ফত্‌-উল-মুওয়াহিদিন — ১৮০৩-০৪ (আরবি ভূমিকা সমন্বিত মূল বিষয় ফারসি ভাষায় রচিত। ওবেইদুল্লাহ এল ওবেইদির ইংরেজি অনুবাদ A Gift to Deists প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল আদি ব্রাহ্ম সমাজ, কলকাতা থেকে ১৮৮৪ তে। পরে এলাহাবাদ থেকে ১৯০৬-তে প্রকাশিত The English works of Raja Rammohun Roy গ্রন্থে এবং কলকাতা থেকে ১৯৪৯-তে প্রকাশিত English Works-এর শতবার্ষিকী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। ১৮৯৯-তে ধর্মতত্ত্ব নামে এক পাক্ষিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে গিরিশচন্দ্র সেন কৃত এর বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছিল। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দাস কৃত যে-বাংলা সংস্করণ বেরিয়েছিল তা ছিল ওবেইদুল্লাহ এল ওবেইদির ইংরেজি থেকে অনুবাদ।)

খ. বাংলা

২. বেদান্ত-গ্রন্থ — ১৮১৫
৩. বেদান্ত সার — ১৮১৫
৪. তলবকারোপনিষৎ — ১৮১৬ (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের আলোকে কেনোপনিষদের বাংলা অনুবাদ)
৫. ঈশোপনিষৎ — ১৮১৬ (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের আলোকে অনুবাদ)
৬. ভট্টাচার্যের সহিত বিচার — ১৮১৭ (মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকৃত তাঁর বেদান্তচন্দ্রিকা (১৮১৭) গ্রন্থে বেদান্ত গ্রন্থ-এর সমালোচনার উত্তর)
৭. কঠোপনিষৎ — ১৮১৭ (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের আলোকে অনুবাদ)
৮. মুণ্ডকোপনিষৎ — ১৮১৭ (ঐ)
৯. গোস্বামীর সহিত বিচার — ১৮১৮ (জনৈক বৈষ্ণবের বিরোধিতার উত্তর)
১০. সহমরণ বিষয়ে — ১৮১৮ (সতী বিষয়ক প্রথম বাংলা রচনা)
১১. গায়ত্রীর অর্থ — ১৮১৮ (ঋগ্বেদের গায়ত্রী মন্ত্রের উপস্থাপনা)
১২. মুণ্ডকোপনিষৎ — ১৮১৯ (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের আলোকে অনুবাদ)
১৩. আত্মনাত্মবিবেক — ১৮১৯ (শঙ্করাচার্যের ভাষ্যের আলোকে অনুবাদ)
১৪. সহমরণ বিষয়ে — ১৮১৯ (সতী বিষয়ক ২য় বাংলা রচনা)
১৫. কবিতাকারের সহিত বিচার — ১৮২৮
১৬. সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার — ১৮২০
১৭. ব্রাহ্মণ সেবধি — ১৮২১ (ক্রিশ্চান মিশনারিদের আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুধর্মের সমর্থনে লেখা)
১৮. চারি প্রশ্নের উত্তর — ১৮২২
১৯. প্রার্থনাপত্র — ১৮২৩ (একেশ্বর আরাধনা বিষয়ে রচনা)
২০. পাদ্রী ও শিষ্য সংবাদ — ১৮২৩? (ট্রিনিটিবাদী খ্রিস্টধর্মীদের সমালোচনা। এ জাতীয় এক মিশনারি এবং তিনজন ধর্মান্তরিত চৈনিকের মধ্যে কাল্পনিক কথোপকথন।)
২১. গুরুপাদুকা — ১৮২৩ (পাওয়া যায়নি যদিও ১৮৫৫ তে প্রকাশিত জেমস লঙের Descriptive Catalogue of Bengali Books-যে উল্লেখ রয়েছে।)
২২. পথ্যপ্রদান — ১৮২৩ (কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের পাষণ্ড পীড়ন (১৮২৩)-এর উত্তর)
২৩. কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার — ১৮২৬
২৪. বজ্রসূচি — ১৮২৭ (ব্রাহ্মণ্যবাদী জাতিভেদপ্রথা বিষয়ে মহাযান বৌদ্ধদের এক গ্রন্থের অনুবাদ)
২৫. গায়ত্র্যাপরমোপাশনাবিধানম — ১৮২৭
২৬. ব্রহ্মোপাসনা — ১৮২৮
২৭. ব্রহ্মসঙ্গীত — ১৮২৮
২৮. অনুষ্ঠান — ১৮২৯
২৯. সহমরণ বিষয়ে — ১৮২৯
৩০. গৌড়ীয় ব্যাকরণ — ১৮৩৩

গ. ইংরাজি

৩১. *Abridgment of the Vadant*, 1816.
৩২. *Kena Upanishad*; 1816.
৩৩. *Ishopanishad*; 1816. (Translation)
৩৪. *A Defence of Hindoo Theism*, 1817.
৩৫. *Counter-Petition ... Against Suttee*, 1818.
৩৬. *Tract on Suttee*, 1818. (Translation from the Bengali)
৩৭. *Moonduk Opunishud*, 1819 (Translation)
৩৮. *Kuth-Opunishud*, (Translation)

৩৯. *An Apology for the Pursuit of Final Beatitude*, 1820. (Tanslation of *Subrhmanyer Sahit Vichara*)

৪০. *Tract on Sutee*, 1820. (Translation fom the Bengali)

৪১. *The Precepts of Jesus, 1820.*

৪২. *An Appeal to the Christian Public*, 1820.

৪৩. *Second Appeal to the Christian Public*, 1821.

৪৪. *The Brahmanical Magazine*, 1821. (A vindication of Hinduism against the attacks from Christian missionaries)

৪৫. *Brief Remarks Regarding Modern Encroachments on the Ancient Rights of Females according to the Hindoo Law of Inheritance*, 1822.

৪৬. *The Brahmanical Magazine*, 1823.

৪৭. *Final Appeal to the Christian Public*, 1823.

৪৮. *Humble Suggestions to His Countrymen who Believe in One True God*, 1823.

৪৯. *Petitions Against the Press Regulations*, 1823.

৫০. *A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians*, 1823

৫১. *A Letter to Lord Amherst on Western Education, 11 December* 1823.

৫২. *A Letter to Rev. Henry Ware on the Prospects of Christianity in India*, 1824.

৫৩. *Translation of a Sanskrit Tract on Differnt Modes of Worship*, 1881.

৫৪. *Bangalee Grammar in English Language*, 1826.

৫৫. *Translation of Sanscrit Tract, Including the Divine Worship*, 1827.

৫৬. *Answer of a Hindoo*, 1827.

৫৭. *Symbol of the Trinity*, 1828?

৫৮. *The Universal Religion*, 1829.

৫৯. *Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the Resumption of Lakheraj Lands*, 1829.

৬০. *Address to Lord William Bentinck Upon the Passing of the Act for the Abolition of Suttee*, 1830.

৬১. *Essay on the Rights of Hindoos over Ancestral Property*, 1830.

৬২. *Letters on Hindoo Law of Propety*, 1830.

৬৩. *Counter-Petition to the House of Commons against the Memorial of the Advocates of Suttee*, 1830.

৬৪. *Hindu Authorities in favour of Slaying the Cow and Eating its Flesh* (Unpublished).

৬৫. *Exposition of the Practical Operation of the Judicial and Revenue Systems of India*, 1832.

৬৬. *An Appeal to the British Nation Against a Violation of Common Justice and A Breach of Public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants*, 1832?

৬৭. *An Autobiographical Letter*, 1833. (First published in the Athenaeum, 5 October 1833).

ঘ. ইংরাজি রচনাসংগ্রহ

1. Jogendra Chunder Ghosh, ed. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Vol. 1. 1885, Vol. II, 1887. (Second edition in three volumes in 1901).
2. *The English Works of Raja Rammohun Roy*, Allahbad, 1906. (with an introduction by Ramananda Chatterjee)
3. *The English Works of Raja Rammohun Roy, 1845–51* (Centenary edition in seven parts)

ঙ. বাংলা রচনাসংগ্রহ

১. রাজনারায়ণ বসু এবং আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ — রাজা রামমোহন প্রণীত গ্রন্থাবলী — ১৮৭৩

২. রামমোহন গ্রন্থাবলী — বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ

৩. সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী — আধুনিক ভারতের জনক, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১৯৩৩ □

রামমোহনের মূল্যায়ন : তৃতীয় পর্যায় — ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে

শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়

রেনেসাঁস কথাটি উচ্চারিত হলেই যে-সব নেতি বায়ুগ্রস্ত বিদ্যাবাগীশ্ 'জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্র-অঙ্কিত বঙ্কিমী পলায়নদৃশ্য মঞ্চস্থ করে থাকেন তাঁদের পশ্চাৎগামী বীরত্বকে অনুসরণ করার আর প্রয়োজন নেই। কেননা রেনেসাঁস সংক্রান্ত গবেষণা এখন প্রথম-দ্বিতীয় পর্যায় অতিক্রম করে তৃতীয় পর্যায়ে প্রবেশোন্মুখ। প্রথম পর্যায়ে ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কে গড়ে তোলা হয়েছিল একটি বিশুদ্ধ আলোকোজ্জ্বল ধারণা[১], দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্লেষণাত্মক গবেষণার নামে ভেঙে ফেলা হয়েছে তার অধিকাংশ মিথ। দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে Darker Vision of the Renaissance-এর দিকে।[২] এখন রেনেসাঁস বিচারে শুরু হয়েছে তৃতীয় যুগ।[৩] স্থিতপ্রজ্ঞ ভাষ্যকারদের সৌজন্যে ইতালীয় রেনেসাঁস এখন রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার মতো বলতে পারে —

আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী
নহি দেবী, নহি সামান্যা নারী।
পূজা করি মোরে রাখিবে উর্ধ্বে
সে নহি নহি,
হেলা করি মোরে রাখিবে পিছে
সে নহি নহি।

বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারে প্রথমযুগ বহু পূর্বেই অতিক্রান্ত। নেতিবাদী দ্বিতীয় যুগটিকে আর টেনে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন।[৪] এখন শুরু করা যেতে পারে তৃতীয় যুগটিকে অভ্যর্থনা জানানোর কাজ। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহনের ২২৫ তম জন্মবার্ষিকী আমাদের সামনে এনে দিয়েছে সেই সুযোগ। ইতালীয় রেনেসাঁস সম্পর্কিত ভিত্তিগত ধারণার আলোকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহনকে পুনর্বীক্ষণ করে শুরু করা যেতে পারে সেই সুযোগের সদব্যবহারের কাজ।

রেনেসাঁস বিপ্লব নয়, ব্যক্তি প্রতিভার বিস্ফোরণ

—— কী রেনেসাঁস ?

রেনেসাঁস হচ্ছে পরিবর্তনের একটি বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। বিবর্তন ও বিপ্লবের মধ্যে এর অবস্থান। বিপ্লব হচ্ছে দীর্ঘদিনের আটকে থাকা পরিবর্তনের একটি বিস্ফোরক রূপ। আর বিবর্তন হল দীর্ঘতর সময়ে বিস্তারিত বিপ্লব। রেনেসাঁস হচ্ছে বিবর্তনের থেকে হ্রস্বতর এবং বিপ্লবের থেকে দীর্ঘতর একটি পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার নাম। বিবর্তন হচ্ছে বিশ্ব পরিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, বিপ্লব সমাজ পরিবর্তনে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া আর রেনেসাঁস সমাজ পরিবর্তনের সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া। সামাজিক পরিবর্তন যখন রাজনৈতিক ক্ষিপ্রতাকে আশ্রয় করে তখন হয় বিপ্লব, আর সামাজিক পরিবর্তন যখন চেতনা ও নান্দনিকতা জড়ানো সাংস্কৃতির পথ ধরে তখন হয় রেনেসাঁস।

রেনেসাঁসের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তিপ্রতিভার বিকাশ, বিচ্ছুরণ ও কৃতিত্বেরই ইতিহাস। ইতিহাসের একটি নির্দিষ্ট ক্রান্তিপর্বে অতি নির্দিষ্ট একটি ভৌগোলিক পরিসীমার মধ্যে বিকশিত বহু মননশীল ও সৃজনশীল ব্যক্তিপ্রতিভার ধারাবাহিক উত্থান ও বিস্ফোরণই রেনেসাঁস। চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের ইতালিতে এ জিনিস দেখা গিয়েছিল। জর্জ ভাসারি ১৫৫০ খ্রিষ্টাব্দে রচিত তাঁর 'শিল্পীদের চরিতমালা' নামক গ্রন্থে জনা কুড়ি শিল্পীর জীবনী লিপিবদ্ধ করে প্রথম এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫] পরে এই আলোচনা আরও গভীরতা

ও বিস্তৃতি পায়। ভূমিনির্ভর সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে বাণিজ্যিক ধনতন্ত্রে উত্তরণের সময়[৬] ইতালিতে দেখা দেন নতুন ধরনের মননশীল ও সৃজনশীল মানুষসব[৭] — গ্যারিনের ভাষায়, 'নিউ টাইপ অব ম্যান'।[৮] এঁরা মননশীলতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে বদলে দেন মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির গড্ডলপ্রবাহ। হিউম্যানিস্টদের কলম ও শিল্পীদের তুলি ছাড়া রেনেসাঁস অকল্পনীয়। শিল্পীরা ছিলেন রেনেসাঁসের নান্দনিক রূপকার আর হিউম্যানিস্টরা ছিলেন তার বৌদ্ধিক নির্মাতা[৯]। এঁরা চিন্তাশীলতা ও সৃজনশীলতা দিয়ে আঘাত ও লঙ্ঘন করেছিলেন পুরাতন পৃথিবীর অতিনিরূপিত সীমা ও রচনা করেছিলেন নতুন যুগের অভ্যর্থনাপত্র। উনিশ শতকের বাংলাতেও দেখা যায় প্রায় একই ঘটনা। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অসামান্য ব্যক্তিপ্রতিভার একটি মিছিল এখানে আসে। মাত্র তিনপুরুষ সময়কালের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্যক্তিপ্রতিভার যে অভূতপূর্ব বিস্ফোরণ এখানে ঘটেছে তার তুলনা ইতালিতে মেলে।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পেত্রার্কা

ইতালিতে যেমন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রার্কা (১৩০৪–১৩৭৪) বাংলাতে তেমনই রামমোহন রায় (১৭৭২ (?)–১৮৩৩)। বঙ্গ সংস্কৃতির ইতিহাসে রামমোহনই সেই মানুষ যিনি পুরনো বিশ্বাসের জড়তা থেকে জীবনকে উদ্ধার করার তাগিদ মর্মে মর্মে অনুভব করে বিদ্যা ও জ্ঞানের কর্ষণ দিয়ে জীবন ও সমাজের সংরচনা কর্মে প্রথম এগিয়ে এসেছিলেন। রেনেসাঁসের মধ্যে উত্থিত অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক ব্যক্তিত্বে[১০] যে-বৈশিষ্ট্যগুলি ক্রিয়াশীল থাকে রামমোহনের মধ্যেই তা প্রথম পূর্ণমাত্রায় দেখা গিয়েছিল।

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা বিস্মৃত ও বিলুপ্ত প্রাচীনকে উদ্ধার করতে নেমেছিলেন 'to awake the dead'[১১] পরিবর্তিত সময়কালের প্রেক্ষিতে অগ্রগামী চিন্তা সম্বলিত নীতি তাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন। অন্যতর ভাষা ও সংস্কৃতির হাতিয়ার নিয়ে তাঁরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছিলেন;[১২] একই সঙ্গে নবোদ্ভিন্ন জীবন ও যুগকে সঞ্জীবিত করে তুলেছিলেন। রেনেসাঁসের মানুষ একই সঙ্গে 'ক্রিটিক্যাল' ও 'জেন্টল'; ঐতিহ্যসন্ধানী ও আধুনিক। তাঁরা ক্রিটিক্যাল অমানবিক সংস্কার ও জীর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে; বিদ্যাচর্চা ও নান্দনিক রুচির দিক থেকে তাঁরা অভিজাত, মার্জিত, শানিত ও পরিশীলিত। ধর্মাচরণের দিক থেকে গোঁড়ামিমুক্ত ও মূলত জীবনবাদী। তাঁরা চার্চের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। তাঁরা যত না স্বাদেশিক[১৩] তার চেয়ে বেশি 'কসমোপলিটান'[১৪]। তাঁরা ছিলেন বহুদেশ ভ্রমণকারী, বহু ভাষাবিদ, বিভিন্ন বিদ্যায় পারদর্শী; মননশীল ও সৃজনশীল সক্রিয়তার অধিকারী। রেনেসাঁসের মানুষ গড়পড়তা ও গতানুগতিক মানুষের সীমা ও সাধ্য অতিক্রম করে অনন্য, বহুমুখী ও বৈশ্বিক মানুষ হিসাবে দেখা দিয়েছিলেন। সমতলভূমির মধ্যে যেমন মাথা তোলে সুউচ্চ ভঙ্গিল পর্বত — রেনেসাঁসের মানুষ তেমনই।

রেনেসাঁস-ম্যান রামমোহন

মৌল অর্থেই রামমোহন ছিলেন রেনেসাঁসম্যান। গড়পড়তা কোনও গতানুগতিক মানুষ তিনি ছিলেন না। 'টাইমস্' পত্রিকার সম্পাদক এম. ডি. ম্যাকোস্টা লিখেছেন, প্রথম দর্শনেই তাঁকে মনে হয়, — 'He is above mediocrity'। রেনেসাঁস-ম্যানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে উইল ডুরান্ট লিখেছেন, This Renaissance Man was always in motion and discontent, fretting at limits, longing to be a 'Universal Man' — bold in conception, decisive in deed, eloquent in speech...[১৬] রামমোহন সম্পর্কে এ সব কথা খাটে। ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান হয়েও প্রচলিত মূর্তিপূজার বিরোধিতা করে ষোল বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন,[১৭] উচ্চাবচ বহু দেশ ভ্রমণ করে শেষ পর্যন্ত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছোন ইউরোপে। নিরন্তর এক চলিষ্ণুতা, নিরন্তর এক সন্ধিৎসা তাঁকে এক দেশ থেকে অন্য দেশে, এক ধর্ম থেকে অন্য ধর্মে, এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় প্রচালিত করেছিল। তিনিও ছিলেন ভ্রামণিক, বহু ভাষাবিৎ, অধ্যয়নশীল ও নানা বিষয় বিশারদ। তাঁর মননশীল ও সৃজনশীল সক্রিয়তায় বাংলার বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক জগতে এক গুরুতর পরিবর্তন সূচিত হয়। একদিকে তিনি যেমন ধরেছিলেন ঐতিহ্যের হাত অন্যদিকে তেমনই আধুনিকতার সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসায়, বিচারে, বিতর্কে, সক্রিয়তায়, সংরচনায় অসম্ভব গতিশীল ও প্রাণচঞ্চল একটি সাংস্কৃতিক বিচ্ছুরণ উনিশ শতকের বাংলায় দেখা গিয়েছিল। রামমোহন থেকেই তার সূচনা। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের মৌলচিন্তাসূত্রগুলি তাঁর মধ্যেই প্রথম মূর্ত হয়। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের সঙ্গে তুলনা করলে রামমোহনের ব্যক্তিত্বপূর্ণ প্রতিভার রূপটি বহুক্ষেত্রেই উজ্জ্বলতর রূপে প্রতিভাত হয়। এখন আমরা প্রবেশ করব রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের মৌল লক্ষণগুলি রামমোহনের মননশীল সক্রিয়তায় কীভাবে ক্রিয়াশীল বিকাশ লাভ করেছিল সেই আলোচনায়।

রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা দু'ধরনের রচনার মধ্য দিয়ে ইতালির সাংস্কৃতিক পৃথিবীকে বদলে দিয়েছিলেন। ১. প্রস্তাব বা পুস্তিকা জাতীয় রচনা। ২. উদ্ধারীকৃত প্রাচীন পুঁথির সটীক সম্পাদিত অনুবাদকর্ম।

রেনেসাঁসের হাতিয়ার : প্রস্তাব ও পুস্তিকা

ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা বিভিন্ন বিষয়ে পরিবর্তিত মূল্যবোধ ও প্রজ্ঞাদায়ী প্রচুর প্রস্তাব রচনা করেছিলেন। প্রচলিত ধ্যানধারণায় অতৃপ্তি, অসন্তোষ এবং নতুন মূল্যবোধ ও মূলানুগ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে এগুলির জন্ম। এই সব নিবন্ধধর্মী রচনাগুলি হিউম্যানিস্ট অভিধেয় রেনেসাঁসের প্রাগ্রসর বুদ্ধিজীবীদের নবার্জিত বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচার ও মূল্যবোধের ব্যক্তিগত ফসল। প্রস্তাবগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এগুলির মধ্যে ছিল প্রভূত পরিমাণ প্রাচীন ও মূলানুগ গ্রীক ও রোমানবিদ্যার তথ্য ও তত্ত্বগত উপাদান, দ্বিতীয়ত, এগুলির মধ্যে ছিল ইহবাদী বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। তৃতীয়ত, এগুলি ছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিচার ও বিতর্কপ্রবণ। চতুর্থত, এগুলি রচিত হয়েছিল বিভিন্ন বিষয়ে প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে নতুন ধারণা গড়ে তোলার জন্য।

রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক হিসাবে কথিত পেত্রার্কা (১৩০৪–১৩৭৪) 'ফেমিলিয়ারিজ', 'লেটার্স টু দ্য এনসিয়েন্ট ডেড' প্রভৃতি রচনায় মধ্যযুগীয় স্কলাস্টিক দর্শনকে আক্রমণ করে প্রাচীন রোমান বিদ্যার দিকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন ইতালির মুখ।[১৮] লরেঞ্জো ভাল্লা (১৪০৫–১৪৫৭) 'ডিক্লামেশনস্ কনসার্নিং দ্য ফলস ডোনেশনস্ অব কনস্টান্টাইন' নামক রচনায় খসিয়ে দেন পোপের পার্থিব রাজত্বের ভিত্তি। আলবের্তি (১৪০৪–১৪৭২) 'অন দ্য ফেমিলি' নামক একটি লেখায় বলেন, 'মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে যত বেশি সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠা।' পিকো দেল্লা মিরানদোল্লা (১৪৬৩–১৫৩৬) তাঁর 'অরেশন অন্য দ্য ডিগনিটি অব ম্যান' (১৪৮৬) নামক প্রস্তাবে মানুষের মহত্ত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই প্রত্যয় সেখানে ব্যক্ত যে 'মানুষ নিজেকে ইচ্ছা মতো রচনা করতে পারে।' এরাজমুস (১৪৬৯–১৫৩৬) 'অন দ্য প্রেইজ অব ফোলি' নামক রচনায় আক্রমণ করেন মানুষের মূর্খামিকে। সালুতাতি (১৩৩১–১৪০৬) 'অন দ্য ওয়ার্লড অ্যান্ড রিলিজিয়ন' নামক প্রস্তাবে ধর্মের তাত্ত্বিকদের প্রকৃত ধার্মিক হতে আহ্বান জানান। হিউম্যানিস্টদের রচিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলি তীক্ষ্ণ ছুরিকার মতো উত্থিত হয়েছিল গতানুগতিক পৃথিবীর জড়ত্বকে দ্বিখণ্ডিত করার জন্য। প্রথমদিকে এগুলি ছিল পাণ্ডুলিপির আকারে, পরে মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তায় দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।[১৯]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ রামমোহন রচিত '— বিচার', '— উত্তর', '— আবেদন', '— সংবাদ' অভিধেয় প্রস্তাব বা পুস্তিকাগুলিতে আছে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের চারিত্র্য। ইতালীয় রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টদের রচিত প্রস্তাবগুলির মতো এগুলিও একইরকম প্রাচীন ও মূলানুগ বিদ্যার তত্ত্ব ও তথ্য সমর্থিত; এগুলির মধ্যেও রয়েছে ইহবাদী, বাস্তবমুখী, মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি। এগুলিও তীক্ষ্ণভাবে বিচার ও বিতর্কপ্রবণ। এই প্রস্তাবগুলিও নতুন ধরনের জ্ঞানের যোগানদার। এই প্রস্তাবগুলির সৌজন্যেই কলকাতায় একটি বৌদ্ধিক বিপ্লব সূচিত হয়। মুদ্রণযন্ত্রের সহায়তায় ও প্রধানত সাময়িকপত্রের আশ্রয়ে প্রকাশিত হওয়ার জন্য এগুলিকে অনেক সময় আলাদা করে চেনা যায় না। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের সময় এদের স্বরূপেই দেখা গিয়েছিল।

তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্ : বিচ্ছুরিত প্রথম রশ্মি

রামমোহনের প্রথম লেখা হিসাবে যেটি হাতে পাচ্ছি সেটি ফার্সিতে লেখা (আরবি ভূমিকা সম্বলিত) তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্[২০] (১৮০৪)। 'একেশ্বরবাদীদিগকে উপহার' নামক এই পুস্তিকাটি রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলছেন,

> 'সংক্ষেপে হলেও এই অধমের মতে বিশেষভাবে বিবেচ্য ও কার্যকর এই কয়েকটি কথা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের মতামত অগ্রাহ্য করে এই আশায় নিবেদন করা হল যে স্থিরবুদ্ধি লোকেরা সংস্কারমুক্ত লোকেরা সংস্কারমুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর বিচার করবেন।'

এখানে তিনি মানব জাতিকে চারটি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রথমত যারা প্রতারক। যারা সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ধর্মবিশ্বাসের নানা তত্ত্ব উদ্ভাবন করে। দ্বিতীয়ত, যারা প্রতারিত — যারা প্রকৃত তথ্যের অনুসন্ধান না করে অপরের অন্ধ অনুসরণ করে। তৃতীয়ত, যারা প্রতারক ও প্রতারিত — যারা বিনা বিচারে অপরের কথা মেনে নেয় ও অপরেও যাতে সে কথা মানে তার চেষ্টা করে। চতুর্থত, যারা নিজেরাও প্রতারিত হয় না, অপরকেও প্রতারিত করে না। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষরা সৎ ও সত্যান্বেষী।

রামমোহন সারাজীবন ধরে যা করে গেছেন তা হল প্রথম শ্রেণীর (প্রতারক) হাত থেকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর (প্রতারিত) মানুষদের মুক্ত করে চতুর্থশ্রেণীর (সৎ ও সত্যান্বেষী) সংখ্যা বৃদ্ধি করা। এই পুস্তিকাটিতে রয়েছে তার প্রথম খসড়া। তিনি এখানে আহ্বান জানিয়েছেন,

> 'প্রচলিত আচার ও রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণ না করে নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালোমন্দ এরূপ ভাবে বিচার করা চাই যাতে ঈশ্বরদত্ত এই মহামূল্য দান (বিচারবুদ্ধি) যেন অকেজো করে ফেলা না হয়।'

তুহ্‌ফত্‌-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন্‌ বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সেই প্রথম রশ্মি যা দিয়ে শুরু হয়েছিল অন্ধকার অপসারণের কাজ। তাই রামমোহনের কলকাতা বসবাস (১৮১৪) থেকে নয়, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনা ধরা উচিত এই পুস্তিকাটির রচনাকাল থেকে (১৮০৪)।

অন্যান্য বিচার ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব

রামমোহন এই ধরনের বিচার ও বিতর্কমূলক প্রস্তাব ও পুস্তিকা লিখেছেন অনেক।

১. ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে বা সাকারবাদের বিরুদ্ধে

ক) উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার (১৮১৬) সংস্কৃতে লেখা

খ) শঙ্কর শাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮১৭) — ইংরাজিতে লেখা

গ) ভট্টাচার্যের সহিত বিচার (১৮১৭) — বাংলাতে লেখা

ঘ) গোস্বামীর সহিত বিচার (১৮১৮) — বাংলা

ঙ) কবিতাকারের সহিত বিচার (১৮২০) — বাংলা

চ) সুব্রহ্মণ্যশাস্ত্রীর সহিত বিচার (১৮২০) — সংস্কৃত, হিন্দি, বাংলা

১৮–২০ পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যের এই পুস্তিকাগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে পাঠকদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাতে চাই না। প্রতিটি পুস্তিকাই তথ্য ও তত্ত্বে ঠাসা; প্রচলিত বিশ্বাস ও ভ্রান্ত যুক্তির বিরুদ্ধে ঝলসে ওঠা ছুরির মতো তীক্ষ্ম ও ধারালো। এসব পুস্তিকা স্মরণ করিয়ে দেয় ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট হিসাবে খ্যাত লরেঞ্জো ভাল্লার কথা। তিনি নেপলসে বসে পোপের বিরুদ্ধে একের পর এক পুস্তিকা রচনা করে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিলেন।[২১] পোগ্গিও (১৩৮০–১৪৫৯) ও ফাইলেলফো (১৩৯৮–১৪৮১) একে অপরের বিরুদ্ধে রচনা করেছিলেন শানিত প্রস্তাব। যদিও অনেকক্ষেত্রেই তা ব্যক্তিগত কুৎসার পর্যায়ে পৌঁছেছিল।[২২] রামমোহন কখনও আক্রমণের মধ্যেও সম্ভ্রম বা শালীনতা থেকে বিচ্যুত হননি। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বিচারমূলক পুস্তিকা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২–১৮১৯) রামমোহনের বক্তব্যের বিরুদ্ধে ও প্রতিমা পূজার সপক্ষে পাঁচ দফা যুক্তি দেখিয়ে 'বেদান্তচন্দ্রিকা' লিখেছিলেন। রামমোহন তাঁর প্রত্যেকটা যুক্তি খণ্ডখণ্ড করেন এই পুস্তিকায়।

২. হিন্দুদর্শনের পক্ষে বা পাদ্রি সাহেবদের বিরুদ্ধে বিতর্কমূলক রচনা।

ক) ব্রাহ্মণ সেবধি

খ) অ্যান অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক (১৮২০)

গ) সেকেণ্ড অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক

ঘ) ফাইনাল অ্যাপীল (১৮২৩)

বিতর্ক শুধু রক্ষণশীল হিন্দুদের সঙ্গে বেধেছিল তা নয়, বিতর্ক বেধেছিল আগ্রাসী খ্রিষ্টান পাদ্রিদের সঙ্গেও। শ্রীরামপুরের এক পাদ্রি ১৮২১ সালে ১৪ জুলাই সমাচার দর্পণ পত্রিকায় ন্যায়, মীমাংসা, পাতঞ্জল, সাংখ্য, পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপূর্ণ বক্তব্য প্রকাশ করলে রামমোহন 'ব্রাহ্মণ সেবধি, ব্রাহ্মণ মিশনারি সং ১ 'Brahminical Magazine, The Misionary & the Brahmin No.1' এই নামে একখানি দ্বিভাষিক সাময়িক পত্রাকার পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এর বাঁ পৃষ্ঠায় বাংলা, ডান পৃষ্ঠায় ইংরাজি অনুবাদ থাকত। তিনি এতে লেখেন, 'যেহেতু নিন্দা ও তিরস্কারের দ্বারা লোভ প্রদর্শন দ্বারা ধর্ম সংস্থাপন করা যুক্তি ও বিচারসহ হয় না'...পাদ্রি মহাশয় হিন্দু ধর্মে সাকারবাদের বিরুদ্ধে বলেছেন, কিন্তু 'আমি আশ্চর্য জ্ঞান করি যে ঈশ্বরের কপোতরূপ গ্রহণ করা আপনি স্বীকার করিয়াও কিরূপে হিন্দুকে উপহাস করেন।'[২৩]

রামমোহন খ্রিষ্টের উপদেশ সংকলনমূলক গ্রন্থে খ্রিষ্টের ঈশ্বরত্ব, অলৌকিক অংশ বর্জন করলে মার্শম্যান তাঁকে আক্রমণ করেন। 'অ্যান অ্যাপীল টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক (১ম, ২য় ও শেষ) মার্শম্যানের সঙ্গে খ্রিষ্টতত্ত্ব নিয়ে রামমোহনের বাদ-প্রতিবাদের ফসল। বিস্তারিত আলোচনায় না গিয়ে রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য অনুসরণ করে শুধু ফলাফলটা জানিয়ে দিই। —

> 'মার্সম্যান সাহেব স্বমত সমর্থন জন্য বাইবেল হইতে বহুল প্রমাণ প্রদর্শন করিলেন। রামমোহন রায় ইংরেজী অনুবাদে সন্তুষ্ট না হইয়া গ্রীক ও হিব্রু ভাষায় লিখিত মূল বাইবেল হইতে প্রমাণ সকল উদ্ধৃত করিয়া তাহা স্বয়ং ইংরাজীতে অনুবাদপূর্বক দেখাইলেন যে মার্শম্যান সাহেবের কথা তাঁহার অবলম্বিত ধর্মশাস্ত্র সম্মত নহে। মার্শম্যান সাহেব পরাস্ত হইলেন।'[২৪]

প্রাচীন শাস্ত্রের (বাইবেল) মূল পাঠে পৌঁছুনোর জন্য ক্লাসিক্যাল ভাষার চাবিকাঠি এরাজমুসও ব্যবহার করেছিলেন। এই প্রয়াস হিউম্যানিজম সম্মত। মেরী কার্পেন্টার জানিয়েছেন,

> 'he devoted some of the most important years of his life to the study of Hebrew and Greek that he may judge the real meaning of the Christian Scriptures.'[২৫]

৩. সতীদাহের সমর্থকদের বিরুদ্ধে

ক) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের সংবাদ (১৮১৮)

খ) সহমরণ বিষয়ে প্রবর্তক ও নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ (১৮১৯)

গ) সহমরণ বিষয়

শাস্ত্র বা ধর্মাচরণের দোহাই দিয়ে নিরপরাধ বিধবাদের স্বর্গের লোভ দেখিয়ে মৃত স্বামীর সঙ্গে বেঁধে জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত পোড়ানো হত। রামমোহন এই অমানবিক প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন প্রস্তাব বা পুস্তিকাকে হাতিয়ার করেই।

প্রথম সংবাদে প্রবর্তক উদ্ধৃত শাস্ত্র বচন প্রসঙ্গে নিবর্তক বলছে —

> 'ঐ সকল বচনেতে ঐ বচনানুসারে তোমাদের রচিত সঙ্কল্প বাক্যেতে স্পষ্ট বুঝাইতেছে যে পতির জ্বলন্ত চিতাতে স্বেচ্ছাপূর্বক আরোহন করিয়া প্রাণত্যাগ করিবেক কিন্তু তাহার বিপরীত মতে তোমরা অগ্রে ঐ বিধবাকে পতি দেহের সহিত দৃঢ়বন্দন কর পরে তাহার উপর এত কাঠ দেও যাহাতে ঐ বিধবা উঠিতে না পারে তাহার পর অগ্নি দেওনকালে দুই বৃহৎ বাঁশ ছুপিয়া রাখ। ঐ সকল বন্দনাদি কর্ম্ম কোন্‌ হারিতাদির বচনে আছে যে তদনুসারে করিয়া থাক'...[২৬]

বিদ্যাসাগরও রামমোহন সূচিত পথেই পুস্তিকাকারে রচনা করেছিলেন 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য়)। ইতালীয় রেনেসাঁসে শত শত প্রস্তাব ও পুস্তিকা রচিত হলেও সতীদাহ প্রথা রদ বা বিধবা বিবাহ চলিত করার মতো সামাজিক নৃশংসতারোধকারী মানবতাবদী প্রস্তাব দুর্লভ বলা চলে।

হিউম্যানিজম : রিভাইভাল অব লার্নিং

সাইমন্ডসের ভাষায় রেনেসাঁস হচ্ছে 'রিভাইভাল অব লার্নিং'।[২৭] হিউম্যানিজম কথাটির মৌল অর্থ 'a philosophy of education that favoured clsssical studies'[২৮] রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা মধ্যযুগের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের প্রয়োজনে নেমে পড়েছিলেন প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধারের কাজে। এ কাজ শুরু করেন পেত্রার্কা। তিনি ইতালির জ্ঞানচর্চার মুখ ঘুরিয়ে দেন প্রাচীন রোমান বিদ্যার দিকে। সেই কারণে তাঁকে বলা হয় 'ফাদার অব হিউম্যানিজম'। তিনি বোক্কাচিওর মনে জাগিয়ে দেন প্রাচীন গ্রীক চর্চার আগ্নেয় আকাঙ্ক্ষা। তারপর ক্রাইসোলরস, ভাল্লা, মানেত্তি, ব্রুনি, গুয়ারিনো, ভিত্তোরিনো, ফাইলেলফো, পোগ্গিও, ফিকিনো, পম্পোনাজ্জি, পিকোদেল্লা, মিরানদোল্লা, এরাসমুস প্রমুখ হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন লাতিন ও গ্রীক পুঁথির পুনরুদ্ধার, অনুবাদ, সটীক সম্পাদনা ও মুদ্রিত আকারে প্রকাশের মধ্যে দিয়ে ইতালির জ্ঞানচর্চার জগতে গতানুগতিকতা ভঙ্গ করে নিয়ে আসেন নতুন আবহ।[২৯] যে জ্ঞান চলে গিয়েছিল দৃষ্টির অগোচরে তাকে অজ্ঞতা ও উপেক্ষার অন্ধকার থেকে বর্তমানের গোচরে নিয়ে আসা ও জীবনবাদী ধ্রুপদী বিদ্যার আলোয় জ্ঞানের জগৎকে নতুন করে আলোকিত করা হিউম্যানিস্টদের প্রধান কাজ। ক্রিস্টলার লিখেছেন, 'হিউম্যানিস্টরা বিশ্বাস করতেন ক্ল্যাসিকাল বিদ্যার পঠন-পাঠন জনিত জ্ঞান মানুষকে মুক্ত ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান করে তোলে।'[৩০]

রামমোহনকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের জনক বলা যায় এই কারণে যে তিনিও বাংলার গতানুগতিক চিন্তা ও সংস্কারচ্ছিন্ন পৃথিবীতে নিয়ে আসেন নতুন সংস্কৃতির বার্তা। এবং তা আনেন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের পথ ধরেই। আরব্য ও পারস্য ভাষার পথ ধরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন ঐশ্লামিক সংস্কৃতির ভুবনে। মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে ও একেশ্বরবাদের পক্ষে তাঁর লড়াইয়ের রসদ শুধু উপনিষদ দিয়েছিল একথা ভাবলে ভুল করা হবে। 'জবরদস্ত মৌলভী' হিসাবে পরিচিত রামমোহনের চিন্তার গঠনে ইসলামের অবদান অনস্বীকার্য।[৩১] সংস্কৃত চর্চার পথ ধরে তিনি পৌঁছেছিলেন বেদ-উপনিষদের আলোকিত জ্ঞানের জগতে। প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার আলোকিত দিকগুলি সম্পর্কে জমে উঠেছিল অজ্ঞতার পাহাড়। লোকে ভুলে গিয়েছিল বেদ-উপনিষদে কি আছে না আছে। নানা রকম লৌকিক আচার-ব্যবহার, ভেদবাদ, অমানবিক প্রথা, মূর্তিপূজা, অবতারবাদ পুরোহিতরা চালাচ্ছিলেন বেদে আছে বলে। রামমোহন বেদ ও উপনিষদের সারাংশ অনুবাদ করে প্রকাশ করলেন ভ্রান্তি অপনোদনের জন্য। যে-জ্ঞান সংস্কৃতের আধারে ঢাকা ছিল তার অনুবাদ ও সার বাংলা, ইংরাজি, কখনও হিন্দিতে প্রকাশ করে ভেঙে দিলেন পুরোহিতদের একচেটিয়া অন্ধকারের আধিপত্য। গ্রীক ও হিব্রু ভাষার পথ ধরে তিনি পৌঁছুতে চেয়েছিলেন খ্রিষ্টধর্মের শুদ্ধ পাঠে।[৩২] এ পথও হিউম্যানিস্টের পথ। গোঁড়া পাদ্রিরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর উপর। প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ও জীবনবাদী অন্যতর সংস্কৃতির চর্চাই রেনেসাঁসের প্রধান চাবিকাঠি। রামমোহন রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের সেই চাবিকাঠি দিয়েই উন্মুক্ত করেছিলেন বঙ্গীয় জাগরণের দ্বার।

প্রাচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার

প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার পুনরুদ্ধারমূলক রামমোহনকৃত অনুবাদগ্রন্থগুলি এই রকম —

বেদান্ত :

১. বেদান্ত গ্রন্থ — ১৮১৫, ২. বেদান্ত সার — ১৮১৫

উপনিষদ :

৩. তলবকারউপনিষৎ — ১৮১৬, ৪. ঈশোপনিষৎ — ১৮১৬,৫. কঠোপনিষৎ — ১৮১৭, ৬. মান্ডুক্যোপনিষৎ — ১৮১৭, ৭. মুণ্ডকোপনিষৎ — ১৮১৯

অন্যান্য অনুবাদ :

৮. গায়ত্রীর অর্থ — ১৮১৮, ৯. আত্মানাত্মবিবেক — ১৮১৯, ১০. বজ্রসূচী — ১৮২৭

এছাড়া প্রচীন বিদ্যার উপর ভিত্তি করে রামমোহন কয়েকটি উপাসনা পদ্ধতিমূলক মৌলিক প্রস্তাব বা পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন।

প্রার্থনাপত্র — ১৮২৩, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ — ১৮২৬
গায়ত্র্যাপরমোপাসনাবিধানং — ১৮২৭,
ব্রহ্মোপাসনা — ১৮২৮, অনুষ্ঠান — ১৮২৯

হিউম্যানিস্ট রামমোহনকে চিনতে এগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অনুবাদগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পাঠকদের ধৈর্যের উপর অহেতুক অত্যাচারের নামান্তর হবে। উদাহরণ হিসাবে শুধু দু'একটি অনুবাদ বিষয়ে দু'চার কথা বলি।

বেদান্ত গ্রন্থ (ব্রহ্মসূত্রের ভাষা বিবরণ)

ব্রহ্মজ্ঞানের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সূত্রগুলি শঙ্করাচার্য্য ব্যাখ্যা সহ প্রচার করেছিলেন বহু আগে। রামমোহন ওই গ্রন্থখানি অনুবাদ করেন 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে। ৫৫৮ সূত্র-সমন্বিত এ গ্রন্থের তিনটি অংশ — ভূমিকা, অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ। গ্রন্থ অংশে সংস্কৃত সূত্রাংশ উদ্ধৃত করে তারপর বাংলা ব্যাখ্যা, তারপর আবার পরবর্তী সূত্র ও তার বাংলা ব্যাখ্যা — এই ভাবে গ্রন্থটি রচিত। ইতালীয় রেনেসাঁসেও দেখা যায় অনুবাদকাররা মূল গ্রন্থের সটীক অনুবাদ করার সময় দ্বিভাষিক সূত্র অবলম্বন করতেন। যেমন এরাজমুস ১৫১৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে গ্রীক নিউটেস্টামেন্ট সটীক সম্পাদনা করেন। সঙ্গে দিয়ে দেন তার পরম্পরাক্রমিক লাতিন অনুবাদ।[৩৩] মূল এবং তার অনুবাদ দু'-ই তাঁরা রাখতেন পাশাপাশি। রামমোহনের প্রায় সমস্ত অনুবাদে এই দ্বিভাষিক সূত্র অনুসৃত। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' নামক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন,

> 'সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য সর্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন।'[৩৪]

'ব্রহ্মোপসনায়' রামমোহন লিখেছেন,

> 'এই শ্রুতির পাঠ এবং ইহার অর্থ চিন্তন কৃতার্থের হেতু হয়। অর্থ চিন্তনের ক্রম সংস্কৃতেএবং ভাষাতে জানিবেন।'[৩৫]

ইতালিতে রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের আন্দোলনকে চারটি পর্বে ভাগ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি পর্বের নাম 'age of translation'।[৩৬] অনুবাদ ছাড়া প্রচীন বিদ্যার পুনরুদ্ধার ছিল অকল্পনীয় ও অসম্ভব। রামমোহন যে সচেতনভাবেই হিউম্যানিস্টের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেদান্ত গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকায় তিনি স্বয়ং যা লিখেছেন তা অনুধাবন যোগ্য —

> 'সংস্কৃত ভাষারূপ অন্ধকার যবনিকার অন্তরালে ইহা লুক্কায়িত থাকায় এবং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকেই এই গ্রন্থের ব্যাখ্যার এমনকি এতাদৃশ পুস্তকের স্পর্শে অধিকারী করিয়া রাখায়, এই বেদান্ত গ্রন্থ যদিও ইহা নিরন্তর প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়া থাকে, তথাপি সাধারণের নিকট অল্পই পরিচিত এবং বাস্তবিক অতিশয় অল্প সংখ্যক হিন্দুরই আচরণ ইহার উপদেশের কথঞ্চিৎ অনুযায়ী। আমার মত সমর্থনের জন্য আজ পর্যান্ত সাধারণের নিকট অপরিচিত এই বেদান্ত গ্রন্থের তথা ইহার সারভাগের হিন্দী ও বাংলা অনুবাদ আমার সাধ্যানুসারে করিয়া বিনামূল্যে আমার স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে যতদূর ব্যাপকভাবে বিতরণ করা আমার পক্ষে সম্ভব, তত দূর বিতরণ করিয়াছি।'[৩৭]

গায়ত্রী বেদাংশ তাই শূদ্র ও মহিলাদের পক্ষে অশ্রাব্য — এই ছিল ধারণা। রামমোহন তা বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত বা বাংলায় অনুবাদ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা করে প্রকাশ করালেন। 'বজ্রসূচী' নামক অনুবাদমূলক রচনায় জাতিভেদ প্রথার মৌল কাঠামোটিকে আক্রমণ করা হয়েছে।

এছাড়া 'প্রিসেপ্টস্ অব জেসাস' (১৮২০) নামে একটি রচনায় রামমোহন নিউ টেস্টামেন্ট থেকে শুদ্ধ পাঠের একটি সংকলন প্রকাশ করেন। এখানে পাদ্রিদের পরম্পরাবাহিত গ্রন্থকে অভ্রান্তজ্ঞানে গ্রহণের পরিবর্তে বিচারশীল মন নিয়ে মূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তিনি দেখান খ্রিষ্টানরা যেভাবে যিশুকে লোক সমক্ষে দেবতা বা অবতার বানিয়ে প্রচার করছে তার সমর্থন মূল গ্রন্থে নেই।

পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিগ্রহণ

ইতালিতে রেনেসাঁস সম্ভব হয়েছিল প্রধানত প্রাচীন গ্রীক ও প্রাচীন লাতিন বিদ্যার নিবিড় কর্ষণের ফলে। ওয়াল্টার উলমান একটি আলোচনায় বলেছেন, ইতালির হিউম্যানিস্টরা প্রাচীন ভাষার চর্চা করেছিলেন নিছক প্রাচীন সংস্কৃতির চর্চা করার জন্য নয়, তাঁরা মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদের প্রয়োজনে প্রাচীন সংস্কৃতির শরণাপন্ন হয়েছিলেন।[৩৮] মধ্যযুগীয় খ্রিষ্টীয় নীতি তত্ত্বের চাপে জীবন যখন প্রায় বিশুষ্ক হয়ে এসেছিল, পরিবর্তিত

সময়ের ডাকে সাড়া দিতে তখন তার বুদ্ধিজীবী ও শিল্পীরা অধিকতর জীবনবাদী সংস্কৃতির সন্ধানে প্রবেশ করেছিলেন ক্লাসিক্যাল বিদ্যার ভুবনে। আসল উদ্দেশ্য জীবনকে সঞ্জীবিত করা।[৩৯] অন্যভাবে দেখতে গেলে, ভিন্নতর জীবনবাদী ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চাকে উজ্জীবনী উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা। ইতালিতে গোটা রেনেসাঁস জুড়ে চলেছিল প্যাগান জীবনবাদের সঙ্গে খ্রিষ্টীয় নীতিতত্ত্বের সাংস্কৃতিক সংঘাত ও সংশ্লেষণের গূঢ় প্রক্রিয়া।[৪০] তার চিত্রকলার দিকে তাকালে এটা বোঝা যায়।

বঙ্গীয় রেনেসাঁসে উজ্জীবনী উপাদানের কাজ করেছিল প্রচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতি। ইতালীয়দের লাতিন চর্চার সমান্তরালে এদেশের প্রাচীন সংস্কৃত চর্চা এবং গ্রীক চর্চার সমান্তরালে গ্রহণ করা যায় আধুনিক ইংরাজি শিক্ষার চর্চাকে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধার ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির পরিগ্রহণ — বঙ্গীয় রেনেসাঁসের ছিল দুটি এজেন্ডা। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ দুটি দরজাই খুলেছিলেন নিজের হাতে। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিকে সমুচিত মর্যাদায় অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। একটির কথা আগে আলোচনা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাকে তিনি যে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন এ সত্যও সর্বজ্ঞাত।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য ১৮১৩ সালে বরাদ্দ হওয়া এক লক্ষ টাকা কিছুতেই খরচ করা যাচ্ছিল না কেননা দু'দল সাহেব দু'রকম পথ বাৎলাচ্ছিলেন। 'ওরিয়েন্টালিস্ট'-রা চাইছিলেন আরবি, ফারসি, সংস্কৃত শিক্ষাতেই টাকাটা খরচ করা হোক আর 'অ্যাংলিসিস্ট'-রা চাইছিলেন এদেশে প্রবর্তিত হোক ইংরাজি শিক্ষানীতি।[৪১] 'ওরিয়েন্টালিস্ট'-দের মতেই সিদ্ধান্ত হয়েছিল টাকাটা খরচ করা হবে সংস্কৃত কলেজগৃহ নির্মাণে। রামমোহন রায় সে সময় বিশপ হিবারের হাত দিয়ে লর্ড আমহার্স্টের কাছে একটি প্রতিবাদপত্র পাঠান। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর লেখা রামমোহনের সেই ঐতিহাসিক পত্রটিতে শোনা যায় প্রথম নির্ণায়ক ভারতীয় কণ্ঠস্বর।

সেই চিঠি

> 'যখন আমরা আশা করেছিলাম জ্ঞানের প্রভাত সূর্য দেখতে পাবো... পশ্চিমের আলোকিত জাতি হিসাবে আপনারা এশিয়ায় আধুনিক ইউরোপের মানবিকীবিদ্যা ও বিজ্ঞান চর্চার বৃক্ষরোপন করবেন... তখন দেখলাম সরকার বাহাদুর হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা পরিচালনযোগ্য সংস্কৃত স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যে সংস্কৃতের চর্চা ভারতে প্রচলিত রয়েছেই। ইউরোপে বেকনের পূর্বে যে-ধরণের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান চালু ছিল এ হচ্ছে সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান মাত্র। এই শিক্ষা ব্যাকরণের কচকচি ও অবাস্তব দর্শনের খুঁটিনাটি দিয়ে তরুণদের মন বোঝাই করে দেবে, যা শিক্ষার্থী বা সমাজের কোনও উপকারে আসবে না। শিক্ষার্থী শিখবে সেই ধরনের বিদ্যা দু' হাজার বছর ধরে ভারতের সমস্ত প্রান্তে যা চালু রয়েছে, যা অর্থহীন ও অসাড়, যা প্রকৃত মানুষ সৃষ্টিতে ব্যর্থ।... বৃটিশ জাতিকে যদি বেকনীয় জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কে অজ্ঞ রেখে তার পূর্বের যুগের শিক্ষাদীক্ষার মধ্যে ফেলে রাখা হতো, তা হলে যা হতো, ভারতীয়দের ক্ষেত্রেও তাই হবে, যদি পূর্বতন সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে তাদের শৃঙ্খলিত করে রাখা হয়। 'In the same manner the Sanskrit system of education would be best calculated to keep the country in darkness' দেশীয়দের উন্নতিই যদি সরকারের লক্ষ্য হয় তবে, 'it will consequently promote a more liberal and enlightened system of instraction embracing mathematics, natural philosophy, chemestry and anatomy with other useful sciences which may be accomplished with the sum proposed by employing a few gentlemen of talents and learning educated in Europe and providing a college furnished with necessary books, instruments and other apparatus...'[৪২]

এই চিঠির দ্বারা নির্ধারিত হয় শিক্ষাখাতে বরাদ্দীকৃত এক লক্ষ টাকার ভাগ্য এবং সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার গতিপ্রকৃতি। ঠিক হয় বরাদ্দ টাকায় যে বাড়ি তৈরি হবে তার একদিকে চলবে সংস্কৃত কলেজ অন্যদিকে নেটিভ ছাত্রদের ইংরাজি শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজে।

ভাবরাজ্যের আর্কিটেক্ট

প্রাচ্য সংস্কৃত শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ইংরাজি শিক্ষার দুটি ধারা সংহত হয়েছিল এই কলেজ গৃহটির স্থাপত্যে (১৮২৪, ২৫ ফেব্রুয়ারি)। কলেজ গৃহটির পরিকল্পনা সম্পর্কে বিনয় ঘোষ লিখেছেন,

> 'মনে হয় বাস্তব রাজ্যের নয়, ভাবরাজ্যের কোন আর্কিটেক্ট যেন কলেজগৃহটির পরিকল্পনা করেছিলেন।'[৪৩]

পরে দেখা যায় কলেজগৃহটির এক অংশ থেকে (সংস্কৃত কলেজ) বের হয়ে আসছেন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হিউম্যানিস্ট বিদ্যাসাগর, অন্য অংশ থেকে আত্মপ্রকাশ করছেন নবযুগের

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত। দুই বিপরীত বিদ্যাচর্চার সংঘাত ও সংশ্লেষণ দিয়েই বঙ্গীয় রেনেসাঁসের বস্ত্র বয়ন হয়েছিল। একদিকে সংস্কৃত ভাষার বিস্মরণ থেকে উপনিষদাদির অনুবাদ করে প্রাচিন ভারতীয় বিদ্যার পুনরুদ্ধার, অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষাকে সমুচিত গুরুত্বে অভ্যর্থনা জানানো। দুটি কাজই রামমোহন শুরু করে গিয়েছিলেন। প্রাচ্য সংস্কৃতির টানা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভরণ দিয়ে মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের মতো মহান শিল্পীরা যে-শিল্পসুষমা খচিত মহার্ঘ্য বস্ত্র বয়ন করবেন তার জন্য প্রয়োজনীয় তাঁতের খাঁচা বা কাঠামো রামমোহনই রচনা করে যান।

ওরিয়েন্টালিস্টদের থেকে আলাদা

রামমোহনের সংস্কৃত চর্চাকে অনেকে ওরিয়েন্টালিস্টদের ভারতবিদ্যা চর্চার সঙ্গে ও ইংরাজি শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতাকে মেকলের মতো অ্যাংলিসিস্টদের ঔপনিবেশিক মানসিকতার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখেছেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে ওরিয়েন্টালিস্ট বা ভারতবিদ্যার বিদেশি পথিকদের সংস্কৃত চর্চা ছিল এক ধরনের 'Exploitation of intellectual and spiritual wealth'। কথাটা আমার নয়, ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি লিখেছেন, "কেবল এশিয়া আফ্রিকা বা আমেরিকার স্বর্ণ-রৌপ্য, পণ্যদ্রব্য প্রভৃতি পার্থিব সম্পদেই ইউরোপের মনীষা তুষ্ট থাকিতে পারিল না। এই মনীষা বিশেষ করিয়া এশিয়া খণ্ডের সুসভ্য জাতিগণের ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান আহরণ করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।... এই ভাবে ইউরোপ এক অভিনব সভ্যতা জগতের ভিতরে প্রবেশের সুযোগ লাভ করিল। 'Exploitation of material wealth' এর পাশে 'Exploitation of intellectual and spiritual wealth'-এর প্রবৃত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিল।"[৩৪]
যাঁরা 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র (১৭৮৪, ১৬ জানুয়ারি) প্রাচ্যবিদ্যা চর্চাকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাবিন্দু ধরতে চান,[৩৫] তাঁরা এই সত্যটা উপলব্ধি করতে পারেননি এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপিত হয়েছিল ইউরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা নিবারণের জন্য। ঔপনিবেশিক বাণিজ্য প্রক্রিয়ার দুটি ঘাঁটি থাকে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দপ্তর কলকাতা, ব্রিটেনে দু' জায়গাতেই ছিল। সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এশিয়াটিক সোসাইটি ইউরোপীয় চাহিদা পূরণের একটি রপ্তানি কেন্দ্র বিশেষ। উদ্ধারীকৃত এদেশীয় পুঁথি বা গ্রন্থের নির্বিচার ইংরাজি অনুবাদ ও সটীক সংস্করণ মুদ্রিতাকারে ইউরোপে রপ্তানি করাই ছিল এর প্রধান কাজ। সেই সঙ্গে এই তথ্যটাও মনে রাখা দরকার ১৮২৯ সালের আগে সোসাইটিতে কোনও ভারতীয় মেম্বার ছিলেন না।[৩৬] সুতরাং এটা প্রথমত ছিল নিছক সাহেবদের প্রতিষ্ঠান। সুতরাং এশিয়াটিক সোসাইটি বা ওরিয়েন্টালিস্টদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চা আর রামমোহনের দেশি ভাষায় বেদ-উপনিষদের অনুবাদ ও সটীক সংস্করণ প্রকাশ এক জিনিস নয়। দুটির উদ্দেশ্য ও অভিমুখ দু'রকম। ওরিয়েন্টালিস্টরা বিজয়ী জাতির বৌদ্ধিক গরিমাবোধ বজায় রেখে ইউরোপের সাংস্কৃতিক ক্ষুধা চরিতার্থ করার জন্য নির্বিচার প্রাচ্যবিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিলেন। আর রামমোহন দেশীয় মানুষজনদের অজ্ঞানতা দূর করার জন্য প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য থেকে বিচারশীল মন নিয়ে তুলে আনছিলেন আলোকিত জ্ঞান। ওরিয়েন্টালিস্টদের নির্বিচার প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিরুদ্ধে রামমোহনকে একটি সূক্ষ্ম সংগ্রাম চালাতে হয়েছিল। তাঁর রচনাগুলির ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করে। কঠোপনিষদের ইংরাজি অনুবাদের ভূমিকাংশ পড়লে তা বোঝা যায়।[৩৭] বাহুল্য ভয়ে উল্লেখ করছি না।

ওরিয়েন্টালিস্টদের চোখে সতীদাহ

উভয়ের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য বোঝবার একটি স্পষ্ট ক্ষেত্র আছে — সতীদাহ প্রথা। ওরিয়েন্টালিস্টরা স্বামীর সঙ্গে সতীর মৃত্যুকে দেখত অসাধারণ ত্যাগ ও মহত্ত্বের আলোয় — the Hindu widow's burning herself with the corpse of her husband is an act of unparallaled magnimity and devotion"।[৩৮] রামমোহন সতীদাহকে কি চোখে দেখেছেন তা তাঁর সহমরণ বিষয় সংবাদ পুস্তিকাগুলি পড়লেই দেখা যায়।

দেশীয় প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের সংস্কৃত চর্চার সঙ্গে রামমোহনের শাস্ত্র চর্চার আকাশ পাতাল তফাৎ। ডেভিড কফ ওরিয়েন্টালিস্টদের সংস্কৃত চর্চাকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাকর্তা বলেই ক্ষান্ত হননি তিনি প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারকে (১৭৬২–১৮১৯) রামমোহনের চেয়ে মহত্ত্ব দান করতে চেয়েছেন।[৩৯] রামমোহন রচিত 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার' পুস্তিকাটি পাঠ করলেই উভয়ের তফাৎ জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার লিখছেন পৌত্তলিকতা, গুরুবাদ ও পুরোহিতদের সপক্ষে, রামমোহন লিখছেন তার বিরুদ্ধে। প্রাচীন দেশি পণ্ডিতরা স্থবির, সংস্কারাচ্ছন্ন, বিসম্বাদপূর্ণ, জাতিভেদ প্রথায় শতধাবিচ্ছিন্ন, পৌত্তলিক, ব্রাহ্মণ্যচালিত সমাজব্যবস্থার পক্ষে শাস্ত্রকে ব্যবহার করতেন। রামমোহন শাস্ত্রচর্চা করেছিলেন তাকে ছিন্নভিন্ন করে নতুন মানবতাবাদী সামাজিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে। রামমোহনের প্রাচীন শাস্ত্রচর্চা হিউম্যানিজমের লক্ষণাক্রান্ত। গ্যারিনের ভাষায় 'Humanism then was an education for life, the building of a new society and a new world'[৪০]

বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কেউ নন

ওরিয়েন্টালিস্টার এদেশে হিউম্যানিজমের সিংহচর্ম পরিধান করেছিলেন মাত্র, বাংলা নামক ভূখণ্ডে ইতিহাসের এক ক্রান্তিলগ্নে যে নতুন রেনেসাঁস জন্ম নিচ্ছিল রামমোহন ছিলেন তার প্রথম গর্জনশীল কেশরী। উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬–১৭৯৪) যতবড় বিশ্ববন্দিত পণ্ডিতই হোন বঙ্গীয় রেনেসাঁসের 'ফাদার ইমেজ' তাঁর উপর আরোপ করা অর্থহীন। তিনি ছিলেন ইউরোপের ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিস্টদের সুযোগ্য উত্তরসূরি, বঙ্গীয় রেনেসাঁসের কেউ নন। বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাকার রামমোহনই।

অ্যাংলিসিস্টও নন

রামমোহনকে অ্যাংলিসিস্ট বা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির অনুগত রূপকার হিসাবেও চিহ্নিত করার চেষ্টা হয়েছে।[৪১] ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে মেকলে উত্থাপিত মিনিটে পাশ্চাত্য শিক্ষা চালু করার যে-নীতি গ্রহণ করা হয় ১৮২৩-এ রামমোহন লিখিত চিঠির বক্তব্যকে তার সঙ্গে সমীকৃত করে দেখা হয়েছে। অ্যাংলিসিস্টরা প্রাচ্যবিদ্যাকে কি চোখে দেখতেন তা সর্বজনজ্ঞাত। বিজয়ী জাতির গরিমাবোধ থেকে তাঁরা মনে করতেন, ইউরোপীয় লাইব্রেরীর একটি তাকে (shelf) যে-জ্ঞান আছে, সমগ্র প্রাচ্য জ্ঞানভাণ্ডার তার সমতুল্য নয়। রামমোহন কি তা ভাবতেন ? মেকলে ইংরাজি শিক্ষা চালু করতে চেয়েছিলেন প্রশাসনের প্রয়োজনে কিছু দেশীয় কেরানি প্রস্তুত করার জন্য। রামমোহন চেয়েছিলেন ইউরোপের মানবিকী বিদ্যা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত প্রকৃত মানুষ[৪২] হোক এদেশের তরুণরা। বিদেশি একটি ভাষাকে সুশৃঙ্খলভাবে আয়ত্ত করে রোমানরাই প্রথম আধুনিক হিউম্যানিজমের পথ প্রস্তুত করে।[৪৩] ইতালীয় রেনেসাঁসে দেখা যায় তার পরিণততর রূপ। রামমোহন গোঁড়ামিমুক্ত দৃষ্টিতে এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন যে জ্ঞানের রাজ্যে যারা এগিয়ে গেছে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে। ইতালীয় রেনেসাঁসে 'ভার্নাকুলার কারিকুলাম'-যুক্ত বিদ্যালয়ের পাশাপাশি 'লাতিন কারিকুলাম'-যুক্ত বিদ্যালয়গুলি যে ধরনের শিক্ষাদর্শ গ্রহণ করেছিল[৪৪] রামমোহনের কাম্য শিক্ষাদর্শ ছিল তদনুরূপ। প্রচীন ভারতীয় ঐতিহ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ভারসম সম্মিলনের মধ্যেই নিহিত আছে মননশীল ও সৃজনশীল একটি জাতির নবজন্মের সম্ভাবনা। এদেশে রামমোহনই এই সত্যের প্রথম ভাবুক ও রূপকার।

সেকুলার ম্যান ?

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তিকা ও গ্রন্থ ধর্ম-বিষয়ক। তিনি নিজেও ছিলেন বিশ্বাসী মানুষ। এ নিয়ে একদল রেনেসাঁস ভাষাকার প্রশ্ন তোলেন।[৪৫] ইতালীয় রেনেসাঁসের দিকে যদি তাকাই তাহলে দেখা যাবে তার হিউম্যানিস্ট ও আর্টিস্টদের মধ্যে কেই-বা নাস্তিক বা অবিশ্বাসী ছিলেন ? রেনেসাঁস ধর্মকে বাদ দিয়ে এগিয়েছিল এ ধারণা সঠিক নয়।[৪৬] তাঁরা চার্চের সমালোচনা করেছিলেন, কিন্তু তাকে পরিত্যাগ করেননি। হিউম্যানিজমের আন্দোলন সেখানে পরস্পরসাপেক্ষ ও পরস্পর-সংশ্লিষ্ট দু'টি ধারায় এগিয়েছিল। 'ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজম' ও 'ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজম'।[৪৭] ক্ল্যাসিকাল হিউম্যানিজমের সূত্রপাত যদি পেত্রার্কা করে থাকেন তবে 'প্রিন্স অব হিউম্যানিটিজ' হিসাবে আখ্যাত এরাজমুস ছিলেন ক্রিশ্চিয়ান হিউম্যানিজমের পরকাষ্ঠা। এরাজমুস বলতেন,

> All studies, philosophy, rhetoric are followed for this one object that we may know Christ and honour Him'[৪৮]

'ক্রিটিক্যাল হিউম্যানিস্ট' লরেঞ্জো ভাল্লা পোপের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রস্তাব লিখেছিলেন কিন্তু বিসম্বাদের সম্পর্ক শেষ হলে তিনিও পোপের সেক্রেটারির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। সব দেখেশুনে বিশিষ্ট রেনেসাঁস-ভাষ্যকার হুইজিঙ্গা তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন, We must not label the Renaissance as unchristian[৪৯] রেনেসাঁসের শিল্পীদের আঁকা ছবি ও শিল্পকর্ম দেখলে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হয়।[৫০] মাইকেলঅ্যাঞ্জেলোর সিস্টিন চ্যাপেলের ফ্রেস্কোমালা overburdened with the message of God।[৫১] রেনেসাঁসে যেটা শুরু হয়েছিল — আবহমান বিশ্বাস ও ধ্যানধারণাকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার পরিবর্তে যুগোচিত নানা প্রশ্নের জালে ছেঁকে নেওয়ার কাজ; প্রাচীন শাস্ত্রের বিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধারের কাজ; ধর্মব্যবসায়ীদের বিকৃত ও স্বার্থচালিত ব্যাখ্যার হাত থেকে জীবনকে মুক্ত করার কাজ। রেনেসাঁস বলেছিল 'ভিতা কনতেমপ্লেতিভা' ও 'ভিতা অ্যাক্তিভা'র কথা।[৫২] অন্তর্মুখী ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হও এবং যত বেশি সম্ভব মানুষের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠো।

ঈশ্বরবিশ্বাস ও মানবকল্যাণ

রামমোহন গভীরভাবে আধ্যাত্মিক ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। কিন্তু ধর্মকে তিনি ধর্মব্যবসায়ীদের বিকৃত ও স্বার্থচালিত ব্যাখ্যার হাত থেকে মুক্ত করে আধ্যাত্মিকতাকে ব্যক্তিগত ও অন্তর্মুখী অনুভূতির জায়গায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয় সমাজ ও মানুষের কল্যাণেচ্ছা ও সক্রিয়তাও তাঁর জীবনসাধনাকে আশ্রয় করেছিল। তিনি ব্রহ্মসভা স্থাপনকালে রচিত 'ব্রহ্মোপাসনা'য় লিখেছেন, 'মানুষের যাবৎ ধর্ম দুই মূলকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। এক এই যে সকলের নিয়ন্তা পরমেশ্বরেতে নিষ্ঠা রাখা দ্বিতীয় এই যে পরস্পর সৌজন্যেতে ও সাধু ব্যবহারেতে কালহরণ করা।'[৫৩]

সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধার্মিকতা

ইসলাম, বেদান্ত ও খ্রিষ্টধর্মের বিশুদ্ধরূপটি তিনি যে-ভাবে তুলে আনার চেষ্টা করেছেন সেই অতিমানবিক কাজের তুলনা ইতালীয় রেনেসাঁসেও সুদুর্লভ। ধর্মের ব্যাপারে তিনি কি ধরনের গোঁড়ামিমুক্ত সর্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ছিলেন তার পরিচয় আছে 'ব্রহ্মসভা'র ন্যাস পত্রে—

> 'এই সমাজের উপাসনাগৃহ জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। কোনো বিশেষ সাম্প্রদায়িক চিহ্ন, প্রতীক, চিত্র বা প্রতিমূর্তি এখানে থাকবে না। এখানে কোনো সম্প্রদায়ের দেবদেবী, ধর্মশাস্ত্র, ধর্মগুরুর নিন্দা করা যাবে না'[৬৫]...ইত্যাদি

সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ ধার্মিকতার এই শুভ্র সমুন্নত মূর্তি রেনেসাঁসোচিত।[৬৬] বহুধর্মের দেশ ভারতবর্ষের পক্ষে আদর্শ স্বরূপ।

তিনি ধার্মিক তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসকে যেভাবে মানুষের জিজ্ঞাসা ও বিচারশক্তিকে ঘুম পাড়িয়ে রাখার কাজে ব্যবহার করা হয় তিনি সারা জীবন তার বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি লিখেছেন, 'নিজের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞান দিয়ে ভালোমন্দ বিচার করা চাই। জ্ঞান ঈশ্বর দত্ত। এই মহামূল্যবান দান যেন অকোজো করে ফেলা না হয়।'[৬৭]

কসমোপলিটান-ম্যান

সাইমণ্ডস তাঁর 'রেনেসাঁস ইন ইটালি' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রেনেসাঁসের সংস্কৃতি স্বাদেশিক নয়, কসমোপলিটন।' 'Instead of patriotism the Italians were inflamed with the zeal of cosmopolitan'।[৬৮] প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন বিদ্যাচর্চার সৌজন্যে তাঁরা স্বদেশ ও সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে গিয়েছিলেন। ফিকিনো যখন প্লেটোনিক একাডেমিতে প্লেটোর দর্শন চর্চা করেছেন তখন তিনি ভাবেননি প্লেটো তাঁর স্বদেশের মানুষ কি না। রাফায়েল যখন 'স্কুল অব এথেন্স' এঁকেছেন তখন মুছে গিয়েছিল তাঁর স্বদেশ-পরিচয়। এরাজমুস বলতেন, যেখানে ভাল পাঠাগার আছে সেখানেই শিক্ষিত মানুষের স্বদেশ। তাঁর জন্ম ছিল নেদারল্যান্ডে, শিক্ষা ফ্রান্সে, শিক্ষকতা ইংলন্ডে, ভ্রমণতীর্থ ইতালিতে, বসবাস মুখ্যত ব্যাসেলে, প্রাচীন জার্মানিতে কথা বলতে ভালবাসতেন, ওল্ড টেস্টামেন্ট ও নিউটেস্টামেন্টের গ্রীক ও লাতিন সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে বলা হয় সব দেশই তাঁর স্বদেশ। প্রকৃতপক্ষে 'he belonged to none'[৬৯] রেনেসাঁস মানুষকে নিখিল বিশ্বের মানুষ করে দিয়েছিল।

রামমোহন আক্ষরিক অর্থে ছিলেন রেনেসাঁসের বৈশ্বিক মানুষ। কম বেশি এগারটি ভাষা জানা ধার্মিক মানুষটির চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠত, Brother our religion is Universal বলতে বলতে। একথা তাঁর জীবনীকার লিখেছেন।[৭০] তিনিই প্রথম ভারতীয় যিনি সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইউরোপে যান।[৭১] বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে সে সম্পর্কে কৌতূহল ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তিনি যথার্থ বৈশ্বিক মানুষের পরিচয় রেখেছিলেন। সমস্ত মানুষ এক বৃক্ষের শাখা পাশপোর্টের জন্য ফরাসি বিদেশমন্ত্রীকে এক চিঠিতে লিখেছেন, 'all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches.'[৭২]

সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণের দিক থেকে তিনি পালন করেছিলেন ইতালির হিউম্যানিস্টদের তুলনায় প্রসারিততর ভূমিকা। রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত একটি লেখায় এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, 'The European Renaissance integrated or made an effort to integrate the Graceo-Roman culture with the Judaeo-christian, Rammohun took upon himself the more complex task of weaving the entire Graceo-Roman judaeo-Christian culture of the west into the fabric of an ancient Eastern culture. It was a great experiment in building up a new international humanity'[৭৩]

উপনিবেশবাদের দালালি ?

রামমোহনের বৈশ্বিকতাকে যাঁরা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের দালালি হিসাবে দেখেছেন তাঁরা ইউরোপীয় রেনেসাঁসের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানেন না এবং উনিশ শতকের বঙ্গীয় রেনেসাঁসের পূর্ণ প্রেক্ষিতটিও অনুধাবন করতে পারেননি। আধুনিক মানব সভ্যতার ঐতিহাসিক বিকাশ বিন্দুতে দাঁড়িয়ে পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর ইতালি স্পর্শকাতর আত্ম-সংকোচের পরিবর্তে বিস্তারমুখী যে বিশ্ববাদী সাংস্কৃতিক উদারতা আশ্রয় করেছিল ভারতেতিহাসের বিশেষ ক্রান্তিলগ্নে দাঁড়িয়ে রামমোহন সেই একই রকম প্রসারণমুখী আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রবাহক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

'ধানের খেতে বেগুন'

ইতালীয় রেনেসাঁসের মধ্যে যেমন তীক্ষ্ণ স্বাদেশিকতার দেখা মেলে না, বঙ্গীয় জাগরণের প্রথমার্ধেও তেমনই তীক্ষ্ণ স্বাদেশিকতার সন্ধান অনেকটা 'ধানের খেতে বেগুন খুঁজতে' যাওয়ার মতো। রেনেসাঁসের প্রথমদিকেই মেকিয়াভেলির (১৪৭৯–১৫২৭) 'প্রিন্স' লেখা হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে

বঙ্কিমের (১৮৩৮–১৮৯৪) স্বাদেশিকতা আশা করা যায় না। তার জন্য দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়। বঙ্গীয় রেনেসাঁসে প্রবাস এবং প্রত্যাবর্তন অভিধেয় দুটি পর্ব আছে। কাছি-বাঁধা ঘেটো নৌকো যেমন সদাগরী জাহাজের তোড়ে দড়াদড়ি ছিঁড়ে ভেসে যায় সমুদ্রের দিকে, উনিশ শতকের বাংলা তেমনই পাশ্চাত্য সভ্যতার অভিঘাতে ভেসে যেতে চেয়েছিল বিশ্বসভ্যতার অভিমুখে। ঘরকুনো বাঙালি হতে চেয়েছিল বিশ্বসংস্কৃতির অংশীদার। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে দেখা যায় তার উল্টো চলন। বিশাল, বিস্তীর্ণ পৃথিবীতে সে তখন খুঁজতে চায় তার স্বাধীন স্বদেশ। রামমোহন প্রথমার্ধের প্রথম পুরুষ। ইতিহাসের নিদান অনুসারে তাঁর কাজ ছিল বিশ্বতৃষ্ণার সূচনা করা।[৭৪] সে দায়িত্ব তিনি যথাযোগ্য ভাবে পালন করতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১–১৯৪১) মতো বিশ্বজয়ী প্রতিভা বঙ্গ সংস্কৃতিতে সম্ভব হয়েছিল।

ভুলও রেনেসাঁস সম্মত

আন্তর্জাতিকতার আতিশয্যে রামমোহন এদেশে ইউরোপীয়দের স্থায়ীভাবে বসবাসের আহ্বান জানিয়ে উত্তরকালীন ঐতিহাসিকদের কাঠগড়ায় নিজেকে চিরকালের আসামি করে রেখে গেছেন। এর পক্ষে-বিপক্ষে যুক্তির সাদা-কালো জাল বিস্তার করা যায়।[৭৫] যদি ধরে নেওয়া যায় এ তাঁর ভুল তবে রেনেসাঁসের দৃষ্টান্ত মাথায় রেখে বলব এ ভুলও রেনেসাঁস-সম্মত। রেনেসাঁসের মানুষরা সব নির্ভুল, দ্বৈততাহীন, দেবোপম ছিলেন রেনেসাঁসের ইতিহাস সে কথা বলে না।[৭৬] একজন লিখেছেন, the Renaissance like a man of genius had the defects of its quality :[৭৭] অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়। দেখানো যায় রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের জনক পেত্রাকা থেকে 'উইজার্ড অব দ্য রেনেসাঁস' আখ্যাত লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো বিশ্ববরেণ্য মানুষরাও সব গুরুতর ভ্রান্তি ও ত্রুটির শিকার হয়েছিলেন। পেত্রার্কা সম্পর্কে বলা হয়েছে 'তিনি মুখে স্বাধীনতার জয়গান করেছেন, কিন্তু সন্ত্রাসবদীর দাসত্ব করেছেন।'[৭৮]

লিওনার্দোর কথাই ধরা যাক্। তিনি দীর্ঘ আঠারো বছর রেনেসাঁসের শ্রেষ্ঠ রাজন্য হিসাবে খ্যাত, মিলানের ডিউক লোডোভিকোর পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পসাধনা করেছিলেন। ফরাসি বাহিনীর হাতে মিলান পর্যুদস্ত হল এবং লোডোভিকো বন্দি হলেন। তাকে হাতকড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হল রাস্তা দিয়ে। তার শেষের দিনগুলি বড় মর্মস্পর্শী। পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। গ্রে হাউন্ড কুকুর তাঁকে জঙ্গলে তাড়া করে নিয়ে যায়। যে-ফরাসিবাহিনীর হাতে মিলান পর্যুদস্ত হল ও পেট্রন লোডোভিকো বন্দি হলেন সেই ফরাসি সম্রাটের মিলান প্রবেশের বিজয়োৎসবে (২৪ মে, ১৫০৭) লিওনার্দোকে দেখা গিয়েছিল সোৎসাহী অভ্যর্থনাকারীর ভূমিকায়।[৭৯] এই অপরাধের জন্য অবশ্য তাঁর আঁকা 'মোনালিসা' পুড়িয়ে ফেলা হয়নি।

ক্রিটিক্যাল ম্যান, জেন্টলম্যান

রেনেসাঁসে দেখা গিয়েছিল দু'রকম ফ্যাকাল্টিযুক্ত মানুষ। ক্রিটিক্যাল ম্যান ও জেন্টলম্যান। চলমান জড়ত্বের বিরুদ্ধে রেনেসাঁসের হিউম্যানিস্টরা সমালোচনামুখর ছিলেন। কারও কারও রচনায় সেই সমালোচনা তীক্ষ্ণতম রূপ ধারণ করে। পোপের পার্থিব রাজত্বের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলে লরেঞ্জো ভাল্লা খ্যাত হয়েছিলেন ক্রিটিক্যাল ম্যান হিসাবে।[৮০] এরাজমুস পুস্তিকার পর পুস্তিকা রচনা করে জার্মান হারকিউলিস মার্টিন লুথারের (১৪৮৩–১৫৪৬) বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে গিয়েছিলেন।[৮১] ইংলণ্ডের বিখ্যাত হিউম্যানিস্ট টমাস মোরেকে (১৪৭৮–১৫৩৫) রাজতন্ত্র বিরোধী একটি রচনার জন্য রাজা অষ্টম হেনরী মৃত্যুদণ্ড দেন।[৮২] পিকো দেল্লা মিরানদেল্লার বিরুদ্ধে আনা হয়েছিল 'ইনকুইজিশনে'র শাস্তি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তিনি রক্ষা পান।[৮৩] পূর্বতন রেনেসাঁসের এক মহান শিক্ষক পিটার অ্যাবেলারের (১০৭৯–১১৪২) বইপত্র লেখার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়।[৮৪]

রামমোহনের প্রস্তাব-বিচার-বিতর্কমূলক পুস্তিকাগুলির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর রেনেসাঁস হিউম্যানিজমের ক্রিটিক্যাল ফ্যাকাল্টি। এদেশের রক্ষণশীল সমাজপতি, ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েমি চিন্তাধারার বিরুদ্ধে রামমোহন লাগাতার সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। ধর্মধ্বজী ও সমাজপতিরাও তাঁকে ছেড়ে কথা বলেনি।

রেনেসাঁসের মধ্যে শুধু ভাল্লা বা সেল্লিনির (১৫০০–১৫৭১) মতো আক্রমণাত্মক মানুষই নন, কাস্তিলিওনে (১৪৭৮–১৫২৯) বা লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির (১৪৫২–১৫১৯) মতো মার্জিত, সুরুচিসম্পন্ন, সুভদ্র মানুষেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'কোর্টিয়ার' রচয়িতা কাস্তিলিওনেকে ধরা হয়েছে আদর্শ 'রেনেসাঁস-জেন্টলম্যান' হিসাবে।[৮৫] তিনি ছিলেন বহু গুণান্বিত নমনীয়, সজ্জন, এক ঝকঝকে সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। অনেক ব্যক্তিগত সাক্ষ্য থেকে জানা যায় রামমোহনের আকর্ষণীয় ও পরিশীলিত ব্যক্তিত্বের কথা। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮১৭–১৯০৫) ছোটবেলায় দেখা রামমোহন[৮৬] ও বিলেতে আর্ল অব মনস্টার ফ্লিৎকারেন্সের পরিণত বয়সে দেখা রামমোহনের মধ্যে মৌলিক একটা মিল আছে। ফ্লিৎকারেন্স লিখেছেন, 'রামমোহন এক অসাধারণ ব্রাহ্মণ, fine person

and most courtly manners'[১৭] আনট বলেছেন,

> 'লেখালেখির সূত্রে তাঁর প্রতিভার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল গোটা ইউরোপ জুড়ে। কিন্তু তাঁকে যে চাক্ষুষ দেখেনি ও নিজের কানে তাঁর কথাবার্তা শোনেনি সে তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে যথাযথ ধারণা করতে পারবে না।'[১৮]

কথা বলার সময় ইংরাজি, আরবি, সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দি থেকে অনর্গল উদ্ধৃতি দিতেন। বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনা কিন্তু এমন সরল ও আন্তরিক ভাবে কথা বলতেন যে তা সকলের হৃদয় জয় করে নিত। তাঁর সৌজন্য ও শালীনতাবোধ ছিল উচ্চমানের।[১৯] রামমোহন বিতর্কমূলক রচনার মধ্যে কোথাও ভব্যতা থেকে স্খলিত হননি। 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে অশালীন আক্রমণগুলির বিরুদ্ধে জবাব দিতে গিয়ে লিখেছেন,

> 'সাধারণ ভব্যতা এ-সকলের অনুরূপ উত্তর দেওয়া হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিয়াছে; কিন্তু আমাদিগের জানা কর্তব্য যে, আমরা বিশুদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বিচারে উদ্যত হইয়াছি; পরস্পর দুর্বাক্য কহিতে প্রবৃত্ত হই নাই।[২০]

তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে টি. বুট লিখেছেন,

> 'No one in the past history, or in the present time ever came before my judgement clothed in such wisdom, grace and humility.'[২১]

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির মতো শারীরিক ভাবে বলিষ্ঠ, সুদর্শন ও বিদ্যাদীপ্ত, রাফায়েলের (১৪৮৩–১৫২০) মতো পরিপাটি, পোষাক–পরিচ্ছদ পরিহিত, টিশিয়ানের (১৪৭৭–১৫৭৬) মতো অভিজাত, কাস্তিলিয়নের মতো সুভদ্র। সেল্লিনি (১৫০০–১৫৭১) লিওনার্দো সম্পর্কে লিখেছেন, 'তার চেয়ে বেশি জানে এমন কোনও মানুষ আমার জানা নেই'।[২২] একথা রামমোহন সম্পর্কেও সে সময় বলা যেতে পারত।

লিবারেটর কিন্তু ধর্মগুরু নন

রেনেসাঁস সম্পর্কে যাঁরা আদর্শায়িত ধারণা পোষণ করেন, তাঁরা বলেন, 'রেনেসাঁস এসেছিল মানুষকে মুক্ত করতে — শাস্ত্রের হাত থেকে, গুরুর হাত থেকে, সংস্কারের হাত থেকে, মধ্যযুগীয় অন্ধকারের হাত থেকে।[২৩] যদি ধরে নেওয়া হয় তাই তবে রেনেসাঁসম্যানদের পালন করতে হয় লিবারেটরের দায়িত্ব। ইতালীয় রেনেসাঁসে হিউম্যানিস্টরা যে আক্ষরিক অর্থে সেই দায়িত্ব সকলে পালন করেছিলেন তা বলা যায় না। কিন্তু রামমোহন সম্পর্কে একথা বলতে অসুবিধা নেই। প্রাচীন বা মধ্যযুগের ধর্মগুরুদের যে অর্থে লিবারেটর বলা হয় রেনেসাঁসম্যানরা তার থেকে আলাদা। মধ্যযুগের লিবারেটর ও রেনেসাঁসের লিবারেটরের মোদ্দা তফাৎ দুটি। এক, রেনেসাঁসের লিবারেটররা কোনও ঐশ্বরিক ক্ষমতা দাবি করেন না। তার ভাষ্যকাররাও সে দাবি তোলেন না। মানুষ হিসাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। দুই, বিশ্বাস নয় বিচার; আনুগত্য নয় জিজ্ঞাসাই তাঁর হাতিয়ার।[২৪]

চৈতন্য কি রেনেসাঁসম্যান

চৈতন্যের সময় বাংলাতে রেনেসাঁস হয়েছিল বলে যাঁরা মনে করেন তাঁরা এই সত্যটা বিস্মৃত হয়ে যান। তিনি, আরও একটা গুরুতর তফাৎ আছে — মধ্যযুগের লিবারেটর একমেবাদ্বিতীয়ম। তাঁর ভাবনা চিন্তা, তাঁর প্রদর্শিত পথেই জনমানস আবর্তিত হতে থাকে। রেনেসাঁসে উদিত হয় বিভিন্ন ধরনের মননশীল ও সৃজনশীল প্রতিভা। বিভিন্ন দিক থেকে এখানে সমস্যাকে আক্রমণ করা হয়। জীবনকে বিভিন্নভাবে সংরচিত করার উদ্যম চলতে থাকে। চার, দর্শনগত দিক থেকেও একটা গুরুতর তফাত। প্রাচীন শাস্ত্রকে রেনেসাঁস যুক্তিশোধিত করে না। প্রাচীন শাস্ত্র বা বিদ্যাকে সে ব্যবহার করে মানবিক কারণগুলিকে সমর্থন করার জন্য। প্রয়োজনে শাস্ত্রের বিরুদ্ধে সে প্রশ্ন তোলে। প্রাচীন শাস্ত্রকে ছেড়ে নতুন জ্ঞান ও ব্যবস্থার সঙ্গে হাত মেলায়। একেই বলে 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম'। রামমোহন চৈতন্যদেবের থেকে আলাদা ধরনের মানুষ। রামমোহন রেনেসাঁসের লিবারেটর। তাঁকে ঘিরে সব কিছু আবর্তিত হবে এমন পথ বা মতের প্রবর্তন তিনি করেননি। সম্ভাবনার নানা দরজা তিনি খুলে দিয়েছিলেন, বাংলার পরবর্তী রেনেসাঁস-পথিকরা যে যার মতো পথে চলেছিলেন। প্রত্যেকেই ছিলেন অনন্য ও স্বতন্ত্র গৌরবের অধিকারী। সকলের সপ্রতিভ দানে বেজে উঠেছিল বঙ্গীয় রেনেসাঁসের মহাসঙ্গীত।

রামমোহনের জীবনব্যাপী সক্রিয়তায় ফুটে উঠেছে তাঁর রেনেসাঁস-লিবারেটরের পরিচয়টিই। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডাম একবার বলেছিলেন, 'Love of freedom was perhaps the strongest passion in his soul'.[২৫] যিনি সংস্কৃত থেকে বেদান্তের অনুবাদে প্রাণপাত করেছিলেন, তিনিই শিক্ষানীতির প্রশ্নে সংস্কৃত শিক্ষার পরিবর্তে পাশ্চাত্য শিক্ষানীতির পক্ষে ওকালতি করেন। আসলে তাঁর আনুগত্য সংস্কৃত বা পাশ্চাত্য শিক্ষা কোনও কিছুর প্রতিই একান্ত নয়, তাঁর আনুগত্য সেই জ্ঞানের প্রতি যা মানুষকে দেবে মুক্তির আলো। শাস্ত্র বা আইনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের ভিত্তিও ওই রকম। রামমোহনের যে-সব ব্যবহার ও আচরণকে তাঁর দ্বৈততার প্রমাণ হিসাবে দেখানো হয় আসলে এক অখণ্ড মুক্তি-সূত্রে সেগুলি ভিতর থেকে বাঁধা। রামমোহনের দুটি প্রাসঙ্গিক উক্তি উদ্ধৃত করছি যাতে ধরা পড়েছে রেনেসাঁস লিবারেটরের স্বচ্ছ মুক্তি-দর্শন

ও প্রত্যয়। ১৮২১ সালের ১১ এপ্রিল জেমস সিল্ক বাকিংহামকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন,

> 'স্বাধীনতার শত্রু ও স্বৈরতন্ত্রের মিত্ররা শেষপর্যন্ত কোথাও জয়ী হয়নি। কোথাও জয়ী হবেও না।'[২৬]

জীবনের প্রথম দিকে ১৮০৪ সালে তুহ্‌ফত-উল্‌-মুওয়াহিদ্দিন-এ সংগ্রামী জীবনদর্শনের যে-খসড়া প্রকাশিত হয়েছিল তাতে সামাজিক মানুষকে তিনি চারটি থাকে সাজিয়েছিলেন, জীবনের শেষ প্রান্তে ১৮৩২ সালের ২৭ এপ্রিল রিফর্ম-বিল নিয়ে লেখা এক চিঠিতে দেখা যাচ্ছে সেই সংগ্রামীদর্শন আরও তীক্ষ্ম ও আরও সূচিভেদ্য রূপ লাভ করেছে। মানুষ আর তার চোখে চার রকম নয়, দু'-রকম। মানুষের পৃথিবী পরিষ্কার দু'টি খণ্ডে বিভক্ত।

> 'The struggles are not merely between the reformers and antireformers but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice between right and wrong.'[২৭]

ইতালীয় রেনেসাঁসে এমন একজন হিউম্যানিস্ট কি ছিলেন যিনি মুক্তিকামী মানুষের সপক্ষে এ ধরণের শাশ্বত সংগ্রামীদর্শন উচ্চারণ করে গেছেন? রবীন্দ্রনাথ আকাশ থেকে পড়েননি। রামমোহনের মতো বিশ্বদর্শী মানুষ যে-রেনেসাঁসের সূচনাকারী সেই রেনেসাঁসেই সম্ভব রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বজয়ী পুষ্পিত প্রতিভার বিকাশ।

রবীন্দ্রনাথের 'হিরো'

রবীন্দ্রনাথকে একবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তাঁর জীবনের আদর্শপুরুষ কে? এই ধরনের অনেক ব্যক্তিগত প্রশ্ন এড়িয়ে গেলেও এই প্রশ্নটির উত্তর তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের 'হিরো' রামমোহন রায়।[২৮] ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের দিক থেকে নয়, এই উত্তরটিকে গ্রহণ করা যায় ঐতিহাসিক তাৎপর্যে অন্বিত করে। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির পরিগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যার পুনরুদ্ধারের ফলে উনিশ শতকের বাংলায় যে নবজাগরণের সূচনা হয় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তার পুষ্পিত পরিণাম। শিকড় থেকে বৃন্তে রস চলাচলের যে কার্যকারণ সূত্র থাকে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথে ক্রিয়াশীল ছিল সেই সাংস্কৃতিক বিকাশসূত্র। কী ভাবে? সে প্রশ্নের উত্তর দাবি করতে পারে একটি পূর্ণ গ্রন্থের দৈর্ঘ্য। আপাতত রামমোহন ও রেনেসাঁস বিচারের ভিত্তিহীন প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের[২৯] নিরর্থক পথ এড়িয়ে ইতালীয় রেনেসাঁসের আলোকে রামমোহন-বিচার করে সাধ্য মতো দেখা গেল, তাঁকে বঙ্গীয় রেনেসাঁসের সূচনাপুরুষ আখ্যা দিলে — সেই সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবে যুক্তিসঙ্গত বলে গ্রহণ করতে আপত্তির কোনও কারণ থাকে কিনা।

উল্লেখপঞ্জি

১. J. Burckhardt: The Civilization of the Renaissance in Italy (1860) Tran, London edition, 1945
২. R. S. Kinsman (ed) The Darker Vision of the Renaissance Culture, California, 1974
৩. W. K. Ferguson, 'The Reinterpretation of the Renaissance.' "Facets of the Renaissance", California, 1954, p.16. "The Renaissance, it seems to me was essentially an age of transition containing much that was recognizably modern and also, much that of the mixture of mediaval and modern elements, was peculiar to itself and was responsible for its contradiction and contrusts and its amazing vitality."
৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: 'বাংলার রেনেসাঁস বিচারের দুই মেরু', প.বঙ্গ ইতিহাস সংসদের ৯ম বার্ষিক অধিবেশন, উলুবেড়িয়া কলেজ, ৯ নভেম্বর ১৯৯২, আধুনিকভারত বিভাগে পঠিত নিবন্ধ। প. বঙ্গ ইতিহাস সংসদ প্রকাশিত "ইতিহাস অনুসন্ধান — ৮ম" খণ্ডে সম্বলিত, ১৯৯৩
৫. G. Vasari: Artists of the Renaissance (1550) Eng. Tran, 1956.
৬. A. M. Von: Sociology of the Renaissance (1932), Eng Tran, 1944
৭. F. Engels: Dialectics of Nature, pp 1-3 'আজ পর্যন্ত মানুষ যা দেখেছে তার মধ্যে এইটি সবচেয়ে প্রগতিশীল বিপ্লব। এ যুগের প্রয়োজন ছিল অসাধারণ মানুষের এবং তার সৃষ্টিও হয়েছিল, যাঁরা ছিলেন চিন্তাশক্তি, নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা এবং বিদ্যায় অসাধারণ। ...সে সময় প্রায় প্রত্যেক ব্যক্তিই ব্যাপক ভাবে ভ্রমণ করতেন প্রায় সকলেই চার-পাঁচটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন, প্রায় প্রত্যেকেই জীবনের নানা ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।...
৮. E. Garim: Science and Civic Life in the Italian Renainssance (Tran. P. Manz), U.S. A, 1969
৯. J. A. Symonds: Renaissance in Italy, Vol-2, Revival of Learning, 1967; Renaissance in Italy, Vol-3, Fine Arts, 1970
১০. J. Burckhardt: Ibid, p. 86
১১. J. A. Symonds: Ibid, Vol-2, P. 114
১২. W. Ullman, Mediaval Foundation of the Renaissance Humanism, London 1977
১৩. J. A. Symonds: Ibid, P. 11

১৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: কী ধরণের কসমোপলিটান সমাজ আমাদের কাম্য, "চতুরঙ্গ" বর্ষ ৫৪, সংখ্যা-২, শরৎ ১৪০০
১৫. M. Carpenter: The Last Days in England of Raja Rammohun Roy, Edited by S. Majumdar, P. 33
১৬. W. Durant: The Story of Civilization, vol-v, The Renaissance, N. Y. 1953, p. 580
১৭. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা): রামমোহন রচনাবলী, হরফ, ২য় মুদ্রণ; ১৯৮৮, পৃ: ৪৪৮
১৮. M. Bishop: Petrarch and his world, Bloomington, 1965 পেত্রার্কা লিখেছেন, 'আমি যদি লিভির যুগে জন্ম নিতাম কী ভালই না হতো'।
১৯. J. A. Symonds: Ibid, p. 266
২০. A. Roy: Nineteenth Century Studies, 1973, p.1, "Tehfatul Muwahhiddin or A Gift to Deists", (Tran by Moulavi Obaidullh EL Obaide)
২১. W. Durant: Ibid, p. 351
২২. L. W. Spitz, The Renaissance and Reformation Movements, Chicago, 1971, p. 152
২৩. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা): রামমোহনরচনাবলী, তদেব, পৃ: ২৩৪
২৪. নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়: মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, দে'জ ২য় সং, ১৩৮১, পৃ: ১১১
২৫. M. Carpenter, Ibid, p. 35
২৬. অজিতকুমার ঘোষ: রা. র. তদেব, পৃ: ১৭৩
২৭. J. A. Symonds: Ibid, Vol-II, Revival of Learning, 1967
২৮. L. W. Spitz: Ibid, p. 139 পল জোয়াচিমসেন হিউম্যানিজমের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'an intellectual movement, primarily literary and philological which was rooted in the love of and desire for the rebirth of classical antiquity.
২৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: 'রেনেসাঁস হিউম্যানিজম' "সংস্কৃতি" দ্বিভাষিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ পত্রিকা, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ: ৭৫–৯৬
৩০. P.O. Kristeller: Renaissance Thought: The classic, Scholastic and Humanist Stains, New York, 1961; Quoted in P. Bondanella & J. Bondanellla (ed) The Macmillian Dictionary of Italian literature, London, 1979, p. 279
৩১. অমলেন্দু দে: 'নবচেতনার দুই অগ্রপথিক: দারা শিকোহ ও রামমোহন রায়', "রামমোহন স্মরণ," রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রকাশিত, মার্চ, ১৯৮৯;
দিলীপকুমার বিশ্বাস: রামমোহন সমীক্ষা, ১৯৭৩, পৃ: ১০
৩২. M. Carpenter: Ibid, P. 35
৩৩. R. H. Bainton: Erasmus of Christendom N.Y, 1969
৩৪. অজিতকুমার ঘোষ: রা. র, তদেব, পৃ: ১০৭
৩৫. তদেব: পৃ: ৩৪৩
৩৬. J. H. Symonds: Ibid, Vol-2, p. 117
৩৭. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়: রামমোহন রায় ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ও সাহিত্য, ১৯৬৫, পৃ: ২২৪–২২৫ (অনু. প্র. মু)
৩৮. W. Ullman: Ibid, p. 107 ...'not because it was classical or ancient because it was wholely uneffected by christian religious theme'
৩৯. J. A. Symonds: Ibid, p. 82 'The reawakening faith in human reason, the reawakening belief in dignity of man and the desire for beauty, the liberty audicity and passion of the Renaissance received from Greek studies their strongest and most vital impulse'
৪০. J. A. Symonds: Ibid, vol-3, Fine Arts
৪১. A. Tripathi: Vidyasagar: The Traditional Mordeniser; 1974, pp 8-9
৪২. J. K. Majumdar: (ed) Raja Rammohun Roy and Progressive Movement in Indian, Rpt. 1988 Letter No-142, pp 250-252
৪৩. বিনয় ঘোষ: বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ২য় খণ্ড, ১৯৫৮, পৃ: ১৩৬
৪৪. গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত: বিদেশী ভারত বিদ্যাপথিক, ২য় সং ১৯৭৭ (উদ্ধৃত) পৃ: ১৩–১৪
৪৫. D. Kopf. British Orientalism and Bengal Renaissance, Berkerly, 1969
৪৬. দিলীপ বিশ্বাস: রামমোহন সমীক্ষা, ১৯৭৩, পৃ: ২৫৫–২৫৩
৪৭. Rammohun Roy: English Works, Panini office Edition, Alahabad, 1906, P. 45
৪৮. পল্লব সেনগুপ্ত: ঝড়ের পাখি: কবি ডিরোজিও (১৯৭৭), ৩য় সং ১৯৮৫, পৃ: ১১৮
৪৯. D. Kopf: Ibid
৫০. E. Garin: Italian Humanism (Tran by P. Munz), 1955 Rpt. Westport Green wood Press, 1975
৫১. দীপঙ্কর চক্রবর্তী: বাংলার রেনেসাঁস ও রামমোহন, জুন ১৯৯০ ঐ (সম্পাদিত) "অনীক" বাংলার রেনেসাঁস সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৮৩
৫২. J. K. Mazumdar (ed) Ibid, letter No 142, p.p. 250-252
৫৩. H. I. Morrou: A History of Education in Antiquity (Tran. by G. Land), 1956; Quoted by R. K. Dasgupta in 'Rammohun Roy: The New Learning.'

৫৪. P. F. Grendler: Schooling in Italy, literacy and learning: 1300-1600, London, 1989
৫৫. শিবনারায়ণ রায়: স্রোতের বিরুদ্ধে, ১৯৮৪
৫৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ', পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ-এর ৮ম বার্ষিক অধিবেশন (বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ৮.৯.১৯৯১) বহির্ভারত বিভাগে উপস্থাপিত নিবন্ধ।
"ইতিহাস-অনুসন্ধান"—৭ম খণ্ড ১৯৯৩, পৃ: ৬৮৪–৭০০; 'দান্তের মূল্যায়ন' (মতামত) "চতুরঙ্গ", বর্ষ ৫২ সংখ্যা ৯, জানুয়ারী, ১৯৯২, পৃ: ৭৬০–৭৬৫
৫৭. M. P. Gilmore: Humanists and jurists G.B. 1963
৫৮. D. Bush: Renaissance and English Humanism, Canada, 1939, p. 55
৫৯. J. Huizinga: Men and Ideas, The Problem of Renaissance, London, 1960, p. 271
৬০. E. Male: The Early churches in Rome, p. 29. 'What the Renaissance was: It was antiquty enabled by christian faith.'
৬১. G. R. Potter (ed) The New Cambridge Modern History Vol.1, Cambridge, 1957, p. 136. 'Renaissance Art is first and foremost a religious art'
৬২. J. Huizinga: Erasmus, N.Y, 1924
৬৩. P. Bondanella & J. Bondanella: *The Macmillian Dictionary of Italian literature, London,* 1979, p. 280 ভিতা আকতিভা — সক্রিয়তাই মানুষের ধর্ম। নইলে লোহার তরবারির মতো মরচে পড়ে যাবে। ভিতা কনতেম প্লেতিভা — 'If you have yourself, that is enough' (ফেমিলিয়ারিজ ৮.১.১৮)
৬৪. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা): *রা. র*, পৃ: ৩৪২–৩৪৩
৬৫. তদেব: *রা-র*, 'The Trust deed of Brahmo Samaj' পৃ: ৫৩৬–৫৪৩
৬৬. S. D. Collet: *The Life and Letters of Raja Rammohun Roy* (1900) D. K. Biswas & P.C. Ganguly (ed), 1962 edition, p. 201, he really belonged to no sect. His religion was universal theism'
৬৭. A. Roy: same as 20
৬৮. J. A. Symonds: *Ibid*, Vol.2, p. 11
৬৯. L. W. Sptiz: *Ibid*, p.294
৭০. S.D. Collet: *Ibid*
৭১. S.D. Collet: *Ibid*, p. 306 'The West had long gone to the East, with him the East began to come to the west:
৭২. অজিতকুমার ঘোষ: *রা-র*, তদেব, Letter to the Minister of Foreign Affairs of France, Paris, Dt. Dec 28th, 1831
৭৩. R. K. Dasgupta: 'Rammohun Roy and New Learning' B.P. Barua edited *Ibid*, Cal, 1988, p. 29
৭৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: 'নায়কের সন্ধান — ইতিহাসের প্রেক্ষিতে', "চতুরঙ্গ," ভাদ্র ১৪০৩, পৃ: ১৯৪–১৯৯
৭৫. দীপঙ্কর চক্রবর্তী: *তদেব*;
সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর: *ভারতের শিল্প বিপ্লব ও রামমোহন* ১৯৬৩; কুমুদকুমার ভট্টাচার্য: *রামমোহন-ডিরোজিও মূল্যায়ন*, ২য় সং, ১৯৮৫;
অমল ঘোষ: *মূর্তি ভাঙার রাজনীতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর*, ১ অক্টোবর, ১৯৭৯;
সোমেন্দ্রনাথ বসু: *রামমোহন ও বিরোধী আলোচনা*, টেগোর রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ১৯৭৬;
শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: *"চতুরঙ্গ,"* গ্রন্থ-সমালোচনা ফেব্রুয়ারি, ১৯৯১, (পৃ: ৮২১–৮৩৪)।
৭৬. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: 'ইতালীয় রেনেসাঁসের কয়েকটি মিথ', *"ইতিহাস-অনুসন্ধান-৭"*, তদেব।
৭৭. J.A. Symonds, *Ibid*, Vol.3, Fine Arts, P.130
৭৮. W. Rospigliosi: Writers in the Italian Renaissance, London, 1978 p. 206, ...'who sung for freedom became the slave of a tyrant'
৭৯. I.A. Richter (ed): *Selection from the Note Books of Leonardo Da Vinci*, The World classics, Oxford, 1953, p. 360
৮০. L.W. Spitz: *Ibid*,
৮১. R. H. Bainton: *Ibid*
৮২. L.W. Spitz: *Ibid*
৮৩. L.W. Spitz: *Ibid*
৮৪. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায়: দুই রেনেসাঁসের দুই শিক্ষা: পিটার আবেলার ও ডিরোজিও *"যুবমানস"*, ডিসেম্বর ১৯৯২
৮৫. R.W. Hanning & D. Rosand (ed): *Castiglione: The Ideal and the Real Renaissance culture*, Yale University Press, London, 1983
৮৬. দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর: *আত্মজীবনী* (১৮৯৮), সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ৪র্থ সং, ১৯৬২
৮৭. M. Carpenter: *Ibid*, p.45
৮৮. M. Carpenter: *Ibid*, p.75
৮৯. M. Carpenter: *Ibid*, p.75
৯০. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা): *রা. র.* তদেব, পৃ: ২৪৯
৯১. M. Carpenter: *Ibid*, p.122.
৯২. W. Durant: *Ibid*, p. 226

৯৩. অন্নদাশঙ্কর রায় : *বাংলার রেনেসাঁস*, ১৯৭৪

৯৪. শিবনারায়ণ রায় : *রেনেসাঁস*, ঢাকা, শিল্পতরু প্রকাশনী, ১৯৯৩

৯৫. M.C. Kotnala : *Raja Rammohun Roy and Indian Awakening. 1st edition July 1975, New Delhi, p. 100.*

৯৬. অজিতকুমার ঘোষ (সম্পা) *রা. র*, তদেব, পৃ : ৪৪৫, পত্র সংখ্যা-৯ (ইং)

৯৭. M. Carpenter : *Ibid*, p. 79

৯৮. রাজা রামমোহন রায় স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রকাশিত : *রামমোহন স্মরণ*, তদেব, পৃ : ৮—৯. অটোগ্রাফের খাতায় প্রশ্নোত্তরে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য — Question No 24. Name your hero or heroine in life. Ans. Rammohun Roy

৯৯. শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় : 'হীরেন্দ্রনাথের চোখে ভারতীয় রেনেসাঁস ও রামমোহন,' "কোরক সাহিত্য পত্রিকা", হীরেন মুখার্জী সংখ্যা ১৯৯৫, পৃ : ১৫০—১৫৮। বঙ্গীয় রেনেসাঁস বিচারে যেমন দু'রকম বক্তব্য আছে — 'truely a Renaissance' (J. N. Sarkar) এবং 'nothing but a historical hoax' (Binoy Ghose : 'A critique of Bengal Renaissance', "*Frontier*" Sept 25, 1971) তেমনই রামমোহন বিচারেও আছে দুটি পর্যায়।

প্রথম পর্যায়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে প্রণামের মন্ত্রে — 'বর্তমান বঙ্গসমাজের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন রামমোহন রায়। আমরা সমস্ত বঙ্গবাসী তাঁহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী তাঁহার নির্মিত ভবনে বাস করিতেছি। তিনি আমাদের জন্য কত করিয়াছেন, কত করিতে পারিয়াছেন।'...(রবীন্দ্রনাথ) দ্বিতীয় পর্যায়ে বস্তুবাদী বিচারের নামে তাঁর সম্পর্কে যে মূল্যায়ন করা হয়েছিল তা এই রকম — 'বাংলার যে রেনেসাঁসের তিনি পথিকৃৎ, তার মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত সামগ্রিক চিন্তাধারা ও কার্যক্রম জন্ম দিয়েছে খণ্ডিত, খর্বিত ও বিকৃত এক আধুনিকতার প্রহসনের (দীপঙ্কর চক্রবর্তী : *বাংলার রেনেসাঁস* ও রামমোহন, পৃ : ৭৯)

অধ্যাপক হীরেন মুখার্জীর ভাষায় প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন ছিল 'regrettably some fiction', দ্বিতীয় পর্যায়ের মূল্যায়ন 'uncalled for denigration' (দ্র. H. Mukherjee, *Indian Renaissance and Raja Rammohun Roy*, Poona University, 1973) দ্বিবিধ মূল্যায়নের প্রধান দুর্বলতা ছিল প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে ধারণাহীনতা। প্রকৃত রেনেসাঁস সম্পর্কে ভিত্তিগত ধারণার আলোকে রামমোহনের এই মূল্যায়ন রেনেসাঁস ও রামমোহন বিচারে তৃতীয় পর্যায়ের সূচনা করবে এই আশায় সুধীজনদের কাছে নিবেদন করা হল। □

লেখকদের প্রতি নিবেদন :

চতুরঙ্গ পত্রিকায় প্রকাশের জন্য প্রবন্ধ, গল্প বা কবিতা পাঠাতে হলে ফুলস্ক্যাপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্ট হস্তাক্ষরে, দুটি পংক্তির মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে এবং বাঁদিকে এক দেড় ইঞ্চি পরিমাণ মার্জিন ছেড়ে পাণ্ডুলিপি লিখুন। কোনও ইংরেজি, ফরাসি বা অন্য ভাষার শব্দ/বাক্য থাকলে তা স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন — টানা হাতে লিখবেন না। জেরক্স কপি কিংবা কার্বন কপি পাঠাবেন না। বানানের বিষয়ে সাম্প্রতিক স্বীকৃত বানান প্রয়োগ করবেন। যেমন — নতুন, দাবি, তৈরি, সরকারি, রাজি, জরুরি, বাঙালি ইত্যাদি। বাংলায় বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত আরবি, ফারসি, ইংরেজি, ফরাসি ইত্যাদি শব্দের বঙ্গীকরণে ঈ-কার (ী), উ-কার (ু), ণ, ষ ইত্যাদির ব্যবহার বর্জন করুন। ক্রিয়াপদে অযথা ও-কার দেবেন না। কোনও বানানে সন্দেহের ক্ষেত্রে চলন্তিকা বা সংসদ অভিধানের প্রথম বানানটি গ্রহণ করুন। শব্দে ব্যবহৃত 'ন' ও 'ণ' স্পষ্টভাবে লিখুন। ত্ত, ত্ব, ত্ত্ব লেখা সম্বন্ধে সজাগ থাকুন।

লেখা মনোনীত হলে আমরা ডাকযোগে জানাব। লেখা পাঠানোর এক বছরের মধ্যে প্রকাশিত না হলে অমনোনীত হয়েছে জানবেন। উপযুক্ত ডাকটিকিটসহ খাম না থাকলে লেখা ফেরত পাঠানো সম্ভব নয়।

দূর থেকে

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দূর থেকে সব দৃশ্য দেখে যেতে হয়।
কোথাও রক্তের রেখা পথে যেতে গাছের শিকড়ে,
কোথাও আগুনে লীন মানুষের সব গৃহস্থালি,
অনেক আপাতরম্য স্বপ্নগুলি উড়ে যায় ঝড়ে,
সারাক্ষণ ধুলো ওড়ে স্তূপ গড়ে বালি।

প্রলয়ের কথা যত জানা ছিল প্রথম কৈশোরে,
অনিশ্চিত পৃথিবীর সব ছেড়ে নোয়ার নৌকায়
বহুদূরে যেতে যারা অভিলাষী ছিল একদিন
নিরাময় প্রাণের তাগিদে, তাদের কি এদিনেও কেউ
এখনও সন্ধানরত দুঃসময়ে যত রৌদ্রে ঝড়ে
কোথায় মসৃণ বীজ, কোথায় নবীন মায়াতরু
জাগবে আবার কোনও রূপালি ঋতুতে ?

পৃথিবীতে জড়ো হয় মানুষেরা ; সর্প, বন্যপ্রাণী,
ভীতির জগতে বাস, দস্যুর হাতের অস্ত্রে সব
সৌন্দর্যের দৃশ্যগুলি ছিঁড়ে যায় সন্ত্রাসের দিনে।

গান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

সারাদিন মেঘমল্লার শুনছি ভীমসেন যোশীর
এক সময় বৃষ্টি নেমে এলো!

একথা আকাশও জানে, এমন গানের সঙ্গে বৃষ্টি না দিলে বড় অপযশ হয়
কোমল ও শুদ্ধের মধ্যে খেলা করছে দুর্জয় নিখাদ
এখনো নামেনি সন্ধে, কদম্বের ডালে বসে আছে অতি একলা মাছরাঙা
সিল্কের পর্দার মত বাতাস খুশির দাঁতে ছুঁয়ে যাচ্ছে বসুধার বুক
ক্ষুধার্ত নদীটি আজ সহসা এমন ভাগ্যে সাজ পোশাক সব খুলে
নৃত্যে মেতে উঠলো
মাঠে মাঠে কী কল্লোল, বিশুদ্ধ সবুজ বীজতলা টেনে নিচ্ছে রস
ঘামাচিতে ভর্তি পিঠ, চাষী পিতাটির মুখে ঈশ্বরের হাসি
বৎসরের প্রথম বর্ষণ, এনে দিল সেই গান, আমার ঘরের মধ্যে গান
ভীমসেন যোশী কি কিছু জানলেন না বুঝলেন? কত টাকা
পেয়েছিলেন এ রেকর্ডিং-এর জন্য?

কোনো কোনো অনুষ্ঠান সারা রাত, ভীমসেন ঘুমোবার
সময়ও পান না
এখন অন্যের গান, ভীমসেন বসে আছেন, রাত তিনটে,
ফেরার ব্যবস্থা ঠিক নেই
মদ্যপান ছেড়েছেন শোনা যায়, স্থির দৃষ্টি, হাঁটুর উপরে দুটি শূন্য করতল
বাইরে প্রবল বৃষ্টি, প্রতিটি ফোঁটার শব্দ তবলার বোল বিনা
. তিনি ছাড়া আর কে বুঝবেন?
তবু তিনি শুনছেন না, দেখছেন না বিদ্যুৎরেখা, ভেতরে গজাচ্ছে সুর
তাঁর চোখে অশ্রুর কয়েক ফোঁটা, চেটে নিচ্ছে জিভ।

ছুটি নিতে হবে

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কিছু কিছু বন্ধুর কাছ থেকে ছুটি নিতে হবে
কিছু শব্দকে বলতে হবে তোমরা আর ভাষায় এসো না
নারীকেও বলা দরকার তোমরা কিন্তু উপমায় থাকছো না!
এসব ঠিক আপ্ত কথা নয়, নয় দুঃখ বা উৎসবে
সকলকে চেঁচিয়ে বলা দ্যাখো
শব্দগুলি আজ কেমন ছটফট করছে...

ছুটি চাই এই কথা লেখা যত সহজ প্রক্রিয়া
ততটা সহজ নয় তাকে মন দিয়ে পড়া
বন্ধুত্ব একটি শব্দ যার অর্থ অনেকটাই মনগড়া।

সাতান্নেও মনে হয়

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

সাতান্নেও মনে হয় বাঁচাটা সহজ নয়, এ এক
কঠিন কার্যক্রম!
এখন স্বপ্ন ও সাফল্যের চাবি হারিয়ে নিঃস্বের মতো
অসংখ্য বিভ্রম,
আংশিক সত্যের দায় কাঁধে নিয়ে বসে আছি,
যেরকম বিপন্ন মানুষ বসে থাকে;
আসন্ন শীতের রাত, যথেষ্ট শীতবস্ত্র নেই—
কারা যায়? কে নেবে আমাকে?
কোথায়ই বা যায় ওরা? হৃদস্পন্দনের শব্দ
উত্তাল হাওয়ায় আসে ভেসে;
দু'একটি তারা পড়ে খ'সে—তাতে আকাশের কি বা আসে যায়!
এত উদাসীন ওই আকাশ নক্ষত্র চাঁদ—
তাহাদের অকরুণ শান্তির আবেশে
পৃথিবী ঘুমোয়, এক কবি শুধু জেগে থাকে
আদিগন্ত হিম শূন্যতায়!

সতেরো এখন মৃত, সাতাশ স্বপ্নের ঘোরে পাশ ফেরে;
কোনও দিন ছিল
স্বপ্ন ও সাফল্য নিয়ে দারুণ শান্তির কোলে মাথা রেখে
ঘুমোতো সাতাশ?
—মনে নেই। তাকে রেখে কবরের হিমগর্তে বহুদূর এসেছি;
কে নিল
ফিরিয়ে আমার স্বপ্ন, সফলতা, সুখের মায়াবী ফল?
কেন দীর্ঘশ্বাস
পিছু তাড়া ক'রে এল এতখানি পথ?—সেই সারমেয়,
ছদ্মবেশী যম?

সাতান্নেই মনে হয়—বাঁচা তো সহজ নয়—
এ এক বিফল কার্যক্রম!

ধ্বনিমণ্ডল

আনন্দ ঘোষ হাজরা

ধ্বনিমণ্ডলের মধ্যে আছি ব'লে সংকেত সমুদ্র থেকে যে মুদ্রা পাঠালে
আমি তার ভাষা বুঝি নাই;
অথচ হাওয়ায় ছিল মৃদু বিষণ্ণতা
তরঙ্গচূড়ায় ছিল শব্দহীন ঢেউ
বিরহগোধূলি ছিল ধ্বনিহীন সোনার সূর্যের রঙে ঢাকা।

সমুদ্রমুদ্রার ভাষা বহুদূর থেকে এসে মাঝে মাঝে স্পর্শ ক'রে যায়
আমি তার ভাষা বুঝি নাই;
তোমার আহ্বান ছিল ইঙ্গিতে সংকেতে
তোমার আহ্বান ছিল শরীরভঙ্গিতে
চলে যেতে যেতে শেষে ডাক দিলে হঠাৎ অজানা কোনও মুদ্রার রেখায়
আমি তো শিখিনি ভাষা স্তব্ধতার, ধ্বনিমণ্ডলের মাঝে আছি চিরদিন।

উপাদান

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পুরাণে, কুরাণে, দেশজ গাথায়, রূপকথা, উপকথা
তোমাকে শেখায় শব্দশৈলী, শব্দের মুখরতা,
লালন তোমার হাতে হাত রাখে, উদাস বাউলও এসে
একতারা তার দাওয়ায় রেখেছে তোমাকেই ভালবেসে
নদী যেতে যেতে বলেছে হাওয়ায় আকাশকে দাও ছুঁয়ে
কী নক্সা আঁকে রোদে ও ছায়ায় বাঁশপাতাগুলি নুয়ে
সাঁওতালদের বাঁধনা পরবে যৌথ সে পিকনিকে
কৃষ্ণচূড়ারা রঙের লিরিক কখন গিয়েছে লিখে
তোমারই জন্যে — সাদা পৃষ্ঠায় নাও তুলে এক্ষুনি
আত্মহননপ্রবণ শব্দ নচেৎ বানাবে খুনি —

তুমি কবি তাই পাশে পাবে নদী ভাটিয়ালি গম্ভীরা
লোকজ গানের সুরে ভরে যাক যত শিরা উপশিরা ...

এক ভারতীয় কবির ডায়েরি থেকে — ৭

উত্তম দাশ

এই কক্ষের বিশালত্ব শুধু আপনার জন্য নির্দিষ্ট।

রিজক্স মিউজিয়ামের পাশের ঘরে ভ্যান গখ
তাঁর তুলির বর্ণপাতের রহস্য উন্মোচন করছেন।
সূর্যমুখী ফুলের এই তোড়ায় ছিটকে পড়ছে হলুদের বৈভব
সানদাক্‌ফুতে কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ায় ঢেলে দেওয়া
সূর্যের প্রবাহ, মাঝে গোপন প্রেমের মতো ছয়টি
রঙের রক্তক্ষরণের খেলা।
আপনি কি তুলি থেকে রঙ ছিটিয়ে দিতেন, ছবিতে—
নাকি শিরার গোপন কেটে ছড়িয়ে দিতেন যন্ত্রণা?
এত বর্ণময় ফুলের তোড়া থেকে এমন মনখারাপ কীভাবে
ছড়িয়ে যায়, সেই রহস্য আমাকে নিজের মতো বুঝে নিতে দিন।

ভ্যান গখের ছবিতে রক্তবিন্দুর একটা ঘোর লেগে থাকে
যে কোনও রঙেই ফুটে ওঠে রক্তের দাগ, সেই সম্মোহন নিয়েই
রামব্রান্ট আপনার কাছে এসেছি, আত্মপ্রতিকৃতির ভাষা
খুবই জটিল, আমার গাইড বিবেচকের মতো সবই ব্যাখ্যা
করছিলেন — সে সব পেরিয়ে আপনার কাছে এলাম,
যথার্থ আপনার কাছে, এ কক্ষের বিশালত্ব শুধু আপনার জন্য
নির্দিষ্ট, রাতের প্রহরীরা তুমুল কোনও আলোচনার মধ্যে,
নগরের গণ্যমান্যরা কোনও সিদ্ধান্তের দিকেই চলেছেন,
গম্বুজ থেকে যে আলোর রেখাটি বয়ে এনেছেন
চিনিয়ে দিচ্ছে রাতের প্রহরীদের নিজস্বতা,
আমি দাঁড়িয়ে আছি এ ছবির সামনে
কোনও পুনর্জন্ম আর নয়, এ জন্মের সব অর্জন
আপনার ছবির ভয়-চকিত সেই বালকটি, হাত থেকে
মুরগি খসে পড়ছে তার হাতে তুলে দিতে চাই।

বেশ তো স্বপ্ন রচনা করছো

মেঘ মুখোপাধ্যায়

বেশ তো খাঁচা রচনা করছো আমার চারপাশে
প্রথম প্রথম বোঝাই যায় না বরং বেশ ভালই লাগে
আবেশ ধরে আসে দুচোখে যেন বহু অনিদ্রার পরে
ঘুম নেমে আসছে ঊষর দেশে প্রখর গ্রীষ্মের শেষে
বৃষ্টি নামার মতো কিংবা যেন বাঁকুড়ার টাঁড়ে
ডিহিতে ডাঙায় ঢেউ খেলছে অফুরান ধানের সবুজ
বিয়ের প্রথম দিনগুলি পাহাড়তলির গ্রামে
শীতের ভোরের মতো নামে।

বেশ তো নৃত্য রচনা করছো আমার চারপাশে
গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে মেঘের মতো ঘনিয়ে
কোমল শ্যাম ছায়া নামিয়ে আনছো চরাচরে
গরিবের মাটির বাড়ির দাওয়ায়, ভেঙে পড়া বেড়ায়
উস্কোখুস্কো চালার মাথায় যেন কত কালের প্রশ্রয়
বিছিয়ে দিয়ে বলছো এবার আরাম করে জিরোতে
পেটের জ্বালায় হাটেমাঠে সময়ে অসময়ে দৌড়তে হবে না আর
চাট্টি ভাত ফুটিয়ে দেবে তোমার নিজের হাতে গড়া উনুনে।

বেশ তো স্বপ্ন রচনা করছো জাল বুনছো আমার চারপাশে
মণিপুরি খোলের তালে বোল তুলছো পায়ে
গ্রীবা বেঁকিয়ে ভ্রূভঙ্গিতে কোমরের ছন্দে আমাকে ঘিরে ঘিরে
গড়ে তুলছো কোন্ অবিশ্বাস্য অপার্থিব জগৎ
এই হেংলা আস্ত কাঙাল ছেলের কাছে তুমিই জানো!

প্রথম প্রথম বোঝাই যায় না বরং বেশ ভালই লাগে
মনে হয় মৃত্যুকে দেখে এবার ফেটে পড়তে পারি উপহাসে
দোহাই তোমায়,
খেয়ালবশে এ জলছবি ভেঙে দিও না হঠাৎ করে।

ঔপনিবেশিক পূর্বভারতে হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক

বিনয় চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১০.২)

দীর্ঘকালস্থায়ী (১৮৫৫–১৮৮২) সাঁওতাল আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনায় আমরা দেখেছি, সাঁওতাল জগতে হিন্দুপ্রভাব বিস্তারের অর্থ এ নয় যে, তারা হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে, বা নিজেদের সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে তাদের বোধ হারিয়ে যাচ্ছে। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস বা সামাজিক আচার তারা নির্বিচারে গ্রহণ করেনি। এর কিছু অংশমাত্র তারা নিয়েছে, অত্যন্ত সচেতনভাবে। আমরা দেখেছি, এ গ্রহণের পটভূমিকা, তাদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ-আন্দোলনের অনিবার্য প্রয়োজন; অভ্যস্ত প্রাত্যহিক জীবনের মামুলি অভিজ্ঞতা নয়। দুটি আলাদা গোষ্ঠী দীর্ঘদিন পাশাপাশি থাকলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় স্বাভাবিক। আন্দোলনের সময়ে হিন্দুপ্রভাব এভাবে আসেনি। আসলে এ আন্দোলন, বা হিন্দু-ধারণা ও আচার গ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের সমাজ ও জীবন-চর্যাকে 'সংস্কৃত' করার প্রয়াস একই চেতনার অংশ। অন্যদিকে, এ প্রক্রিয়ার ফলে তাদের আদি সংস্কৃতি এবং হিন্দু সংস্কৃতির মধ্যে পুরনো ব্যবধান অনেকটা কমে এসেছে।

অন্যান্য আদিবাসী অঞ্চলেও হিন্দু-প্রভাবের এ চরিত্রে মৌলিক কোনও পার্থক্য ঘটেনি। আমরা তিনটি গোষ্ঠীকে বেছে নিয়েছি — মুণ্ডা, ওঁরাও এবং হো।

(১০.৩)

'বীরসা-আন্দোলনে'র (১৮৯৪–১৯০১) আগে মুণ্ডা-জগতে হিন্দু-প্রভাব মোটেই ব্যাপক ছিল না। ব্যতিক্রম নাগবংশী মুণ্ডা রাজপরিবার, আর কয়েকটা বিক্ষিপ্ত এলাকা। রাজপরিবার নিজেদের হিন্দু-ই বলত। ধর্মীয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের আচার-আচরণও ছিল হিন্দু-বিধান-সম্মত। কিন্তু মুণ্ডাগ্রামে এ ধর্মের প্রসার বা জনপ্রিয়তার জন্য তাদের কোনও চেষ্টা ছিল না। এখানে যা কিছু হিন্দুপ্রভাব দেখি, তা এসেছে দুইভাবে — ভ্রাম্যমান বৈষ্ণবগুরুর প্রচার। আর মুণ্ডাগ্রামের বাসিন্দা নানা হিন্দুগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রাত্যহিক সংযোগ। মুণ্ডাগ্রামে বৈষ্ণবগুরুর বাস ছিল খুবই স্বল্পকালের জন্য। তা সত্ত্বেও তাদের প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী — বিশেষত ধর্মীয় ধারণা ও বিশ্বাস, 'শুদ্ধাচার', 'উন্নত' নৈতিক জীবন-যাপনের ক্ষেত্রে। মুণ্ডাগ্রামে নানা হিন্দুগোষ্ঠীর — যেমন কামার, কুমোর, তাঁতি ইত্যাদি — বাস প্রধানত গ্রামীণ অর্থনীতির প্রয়োজনেই। প্রচারক হিসাবে বৈষ্ণবগুরুদের যে যোগ্যতা, উদ্যোগ এবং নিষ্ঠা দেখি, এদের ক্ষেত্রে তা ছিলই না বলতে গেলে। বহুকালের পাড়াপড়শি বলে তাদের জীবন-যাত্রার কোনও কোনও দিক মুণ্ডারা গ্রহণ করেছে মাত্র। এখানেও দেখা যায়, এ প্রভাবের চরিত্র সব মুণ্ডাদের ক্ষেত্রে সমান নয়। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন, বিত্তশালী মুণ্ডারা হিন্দুসমাজব্যবস্থার কোনও কোনও দিক অনেক ব্যাপকভাবে মেনে নিয়েছে — যেমন বর্ণপ্রথা, বহুবিবাহ। একটা ব্যতিক্রম অবশ্য দেখি, ডাইনি প্রথার ক্ষেত্রে। মুণ্ডাদের (এবং অন্যান্য অনেক আদিবাসী সমাজেরও) বিশ্বাস ছিল গোটা গ্রাম সমাজের পক্ষে চরম অনর্থসৃষ্টিকারী ডাইনিদের প্রভাব বিনাশ করা সম্ভব অতিপ্রাকৃত মন্ত্রশক্তির ব্যবহারে। এ ব্যবহার জানা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের। ডাইনি কারা, তারাই তা খুঁজে বার করত। দেখা গেছে, এ মন্ত্রের ভাষা মুণ্ডারি নয়, হিন্দি। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, এটা পার্শ্ববর্তী হিন্দুসমাজের প্রভাবের ফল। এমনও হতে পারে, মুণ্ডারা কোনও সময় তাদের ভাষায় এ মন্ত্র বলত। কিন্তু যে ভাষায় আমরা এ মন্ত্র লিখিত রূপে পাই, তা হল হিন্দি। ডাইনি প্রথার কুফল নিরোধের এ ব্যবস্থা গোটা গ্রামসমাজের যৌথ উদ্যোগের ফল।

হিন্দু প্রভাবের ব্যাপক এবং সুস্পষ্ট রূপ প্রথম দেখি প্রধানত বীরসা আন্দোলনের সময়ে। এ প্রভাবের উৎপত্তি এবং প্রসার সম্পর্কে এ আন্দোলনের সুপ্রসিদ্ধ ইতিহাসকার কুমার সুরেশ সিং-এর সিদ্ধান্ত বিচারসাপেক্ষ।[১৩৫] আন্দোলনের দুই পর্যায়ে — ১৮৯৪–৯৫ এবং ১৮৯৯–১৯০১ — এ প্রভাবের চরিত্রবদল ও তাৎপর্য সম্পর্কেও তার ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত বলে মনে হয় না।

হিন্দু-প্রভাবের উৎপত্তি ব্যাখ্যায় সুরেশ সিং বীরসার একান্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর জোর দিয়েছেন।[১৩৬] আনন্দ পাঁড়ে এক 'নিষ্ঠাবান হিন্দু' এবং 'অন্য এক বৈষ্ণব সাধুর' সঙ্গে বীরসার যোগাযোগের কথা তিনি বিশেষভাবে বলেছেন। পাঁড়ের সঙ্গে বীরসার প্রথম সাক্ষাৎ 'সম্ভবত' ১৮৯০ সালে। ওই অঞ্চলে প্রচলিত বৈষ্ণবধর্মতত্ত্ব পাঁড়ের অল্পস্বল্প জানা ছিল। হিন্দু-'পুরাণে'র সঙ্গেও তার পরিচিতি ছিল। বীরসার সঙ্গে তার যোগ 'বছর তিনেকের'। 'অন্য বৈষ্ণব সাধুর' সঙ্গে বীরসার পরিচয় মাত্র আড়াই মাসের। কিন্তু তার চরিত্রে এবং বিশ্বাসে সাধুর প্রভাব থেকে যায়। এর ফলে মাংস খাওয়া বীরসা 'সম্পূর্ণ' ছাড়েননি বটে। কিন্তু 'তিনি উপবীত ধারণ করতে শুরু করেন; তুলসিগাছ পূজো করতেন; কপালে চন্দনের ফোঁটা দিতেন; হিন্দুদের 'যুগ', 'যুগান্ত' সম্পর্কে ধারণার সঙ্গে পরিচিত হন; গোহত্যাও তিনি নিষিদ্ধ বলেন'। বীরসার 'শিষ্যরা' বলত, 'মহাপ্রভু বিষ্ণু ভগবানের দর্শনও তিনি পেয়েছেন; তাদের গুরুর উপর বৈষ্ণব-প্রভাবের এটাই পরম নিদর্শন'।

বীরসার নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে হিন্দু ধ্যানধারণার সঙ্গে তার এ পরিচিতির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ সন্দেহ নেই; কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে মুণ্ডা অঞ্চলে এ আন্দোলনের বিপুল প্রসারে এ ভূমিকা যথেষ্ট ছিল না। নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি সৃষ্টির বনিয়াদ হিসাবে কোনও কোনও হিন্দু বিশ্বাস ও আচারের তাৎপর্য আদিবাসী জগতে মোটেই অজানা ছিল না; মুণ্ডা জগতে তো নয়ই। এটা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, সাংস্কৃতিক দিক থেকে আদিবাসী জগতের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ক্রমেই কমে আসছিল। এ ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী সাঁওতাল আন্দোলনের বিশিষ্ট এক ভূমিকা ছিল। সুরেশ সিং সাঁওতাল খেরওয়ার আন্দোলনের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু সাঁওতাল এবং মুণ্ডাদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক যোগের কথা বলেননি। এত ব্যাপক খেরওয়ার আন্দোলনের ঢেউ মুণ্ডা জগতে পৌঁছাতই — বিশেষ করে এ দুটো ক্ষেত্রে রাজনৈতিক অভীপ্সা ও চেতনার সাদৃশ্য ছিল বলে। এছাড়াও, একটা প্রধান যোগসূত্র ছিল, সাঁওতালদের গুরু দুবিয়া গোঁসাই, যিনি ছিলেন নতুন ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের এক প্রধান প্রবক্তা। কয়েকটা ঘটনা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গোঁসাইজির প্রচারকেন্দ্র ছিল আসলে ছোটনাগপুরে তার বাসস্থান। খেরওয়ার আন্দোলনের নানা কথা মুণ্ডারা সহজেই জেনেছিল। কারণ দুটো জায়গার ভৌগোলিক সান্নিধ্য; তাছাড়া ছোটনাগপুরে সাঁওতালদের বেশ কয়েকটা বসতিও গড়ে উঠেছিল। সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, বহিরাগতদের নানা উৎপাত এবং শোষণে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডাদের সঙ্গে দুবিয়ার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল — শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় 'সর্দার' নয়, অন্যান্য মুণ্ডাদের সঙ্গেও। এ বিক্ষোভের কারণ, সরকারের কাছে দীর্ঘদিন আবেদন নিবেদন করেও তাদের নানা অভিযোগের কোনও সমাধান মেলেনি। সরকারের সদিচ্ছায় তারা ক্রমেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। বিশেষ করে, বহু প্রত্যাশার পর, তারা দেখে ১৮৭৯ সালের জমি-সংক্রান্ত নতুন আইন[১৩৭] আসলে একটা ভাঁওতা মাত্র। গত কয়েক দশকে হারানো তাদের কোনও জমিই তারা ফেরৎ পেল না। বিভ্রান্ত এবং বিপর্যস্ত মুণ্ডারা দুবিয়ার কাছে যেত পরামর্শের জন্য। ছোটনাগপুর কমিশনারের চিঠিতে জানা যায়, দুবিয়া শুধুমাত্র এ সব আশু অভিযোগের প্রতিকারের কথা ভাবেনি; সাঁওতাল পরগণার মতো এখানেও ব্যাপক ধর্ম-সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কথা তার মাথায় ছিল। এ বিষয়ে ছোটনাগপুর কমিশনারের প্রতিবেদনের উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিক হবে।[১৩৮] আদমশুমারিকে ঘিরে এখানেও যে ব্যাপক উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল, তাঁর মতে এর প্রধান কারণ 'কুখ্যাত ফকির দুবিয়া'র 'নানা' ভবিষ্যদ্বাণী অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ।' এ অঞ্চলে তাকে আগে কেউ বড় একটা চিনত না, জানত না; 'সাধারণ ফকির' বলেই ছিল তার প্রধান পরিচয়; সে পরে বলে বেড়ায়, তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা। হারানো জমি ফিরিয়ে দেবার আশ্বাসও দুবিয়া মুণ্ডাদের দিয়েছিল। 'এর ফলে একটা এলাকায় কোলরা খাজনা বন্ধ করে দেয়; তারা বলে এটা 'কোল রাজার' স্বাধীন মুণ্ডারাষ্ট্রের প্রাপ্য। তার স্বাক্ষরিত নানা চিঠি বহু জায়গায় প্রচার করা হয়। (দুবিয়া এ কথা অবশ্য স্বীকার করেনি)। সাঁওতাল পরগণার মত এখানেও দুবিয়ার নির্দেশ ছিল, ঘরে শুয়োর, মোরগ-মুরগি পোষা চলবে না; তাদের মেরে ফেলতে হবে; রবিবার চাষের কাজ এবং চাষের জন্য গোরু-বলদের ব্যবহার নিষিদ্ধ, সবাই যাতে শুদ্ধাচারী হয়, নিয়মিত স্নান করে, আর চুল-দাড়ি কাটে, জন্ম-মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষে হিন্দুদের মতো নির্দিষ্ট সব বিধি বিধান মানে। কমিশনার অবশ্য বলেন, সাঁওতাল পরগণার মত এখানে এ সব নির্দেশ অত ব্যাপকভাবে মানা হয়নি।

সমাজ-ধর্ম-সংস্কার সম্পর্কিত মূল কয়েকটা ধারণার সঙ্গে মুণ্ডাদের আগে থেকেই পরিচিতি ছিল — এ কথা বলার উদ্দেশ্য বীরসার ভূমিকাকে খর্ব করা মোটেই নয়। আমরা শুধু বলতে, চেয়েছি। বীরসা আন্দোলনের দ্রুত বিস্তারের এ পরিচিতি বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। নিষ্ঠাবান হিন্দু পাঁড়ে এবং অন্য এক বৈষ্ণবগুরুর

মাধ্যমে না হলেও এ সব ধারণার সঙ্গে বীরসার পরিচয় ঘটা মোটেই অসম্ভব ছিল না। আর একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। খেরওয়ার আন্দোলনের সংগঠিত রূপ ১৮৮২ সালের পর বড় একটা দেখা যায় না। আর বীরসার আন্দোলনের শুরু ১৮৯৪ সালে। বীরসার উদ্যোগে না হলে খেরওয়ার আন্দোলনের আদর্শ ও লক্ষ্যর সঙ্গে মুণ্ডাদের পূর্বপরিচিতি বিক্ষিপ্ত, অগভীর ধারণা হিসাবে থাকত; একটা সুসংহত দর্শনে বিকশিত হত না, এবং তার প্রচারের জন্য নিপুণ এবং বিপুল এক সংগঠন গড়ে উঠত না।

হিন্দু প্রভাবের উৎস যাই হোক, বীরসা-আন্দোলনে এর অস্তিত্ব অনস্বীকার্য। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে, এ আন্দোলনের সামগ্রিক দর্শন এবং কর্মপন্থা এ প্রভাবকে অতিক্রম করে অনেক দূর এগিয়ে গেছে। শুধুমাত্র 'শুদ্ধি' আন্দোলনেই বীরসার কর্মপ্রয়াস সীমাবদ্ধ থাকলে এটা সম্ভব হত না। এ সম্পর্কে প্রচলিত একটা ধারণা ভিত্তিহীন বলে মনে হয়। বলা হয়েছে: শুদ্ধির উপরই ছিল বীরসার জোর। 'রাজনৈতিক পন্থা'য় তার নাকি বিশ্বাস ছিল না। কারণ, সংঘবদ্ধ আন্দোলনে হিংসার প্রয়োগ অনিবার্য; এ হিংসা-র দমনে প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশরাজ চূড়ান্ত নিপীড়নের নীতি নেবে; ফলে মুণ্ডাজগতে ঘটবে বিশৃঙ্খলা এবং বিপর্যয়। 'রাজনৈতিক পন্থা' তাই আত্মঘাতী হতে পারে। বীরসার ব্যক্তিগত বিশ্বাস যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত তাকে এ পথেই যেতে হল; এর কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, মুণ্ডা আন্দোলনের সংগঠনে পূর্ববর্তী 'সর্দার আন্দোলনের' [১৩৯] প্রভাব। দীর্ঘদিনের সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের নিশ্চিত এক বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল যে, আগেকার মতো 'নিয়মতান্ত্রিক' আইন-আদালত-নির্ভর পন্থায় মুণ্ডাসমস্যার প্রতিকার সম্ভব নয়; তাদের ধারণা, এ আইনি-ব্যবস্থায় তাদের শত্রুদের ক্ষমতার ভিত্তি আরও শক্ত হবে; একটি মাত্র বিকল্প তাদের সামনে — যৌথ সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ, যা অনিবার্যভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধের রূপ নেবে।

প্রচলিত এ ধারণার বিচার প্রয়োজন[১৪০]। তখনকার মুণ্ডা সংগঠনে সর্দারদের উদ্যোগ অবশ্যই ছিল। আগেকার আন্দোলনে তাদের অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে কাজে লেগেছে — যদিও তাদের কৌশল প্রধানত আইনি-ব্যবস্থা-নির্ভর। হফ্‌মানের প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, গ্রামে গ্রামে বিক্ষুব্ধ মুণ্ডাদের বীরসার আন্দোলনে টেনে আনাতে তার একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কিন্তু বীরসা-আন্দোলনে সামগ্রিক দর্শন যেভাবে গড়ে উঠেছে, তার সঙ্গে পূর্ববর্তী 'সর্দার আন্দোলনের' অমিলই ছিল বেশি। গ্রাম প্রতিষ্ঠাতা ভুঁইহার পরিরবারের হারানো নানা অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল সর্দার আন্দোলনের মূল লক্ষ্য। কোনও কোনও ক্ষেত্রে দেখা যায়, আন্দোলনে যোগ দেবার প্রধান প্রেরণা এ ধরনের ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধি। সর্দাররা তাই চেয়েছিল যে সব বহিরাগতদের জন্য তাদের এ বিপর্যয় তাদের আধিপত্য খর্ব করা হোক্। বলাই বাহুল্য, ব্রিটিশ রাজের হস্তক্ষেপ না হলে এটা সম্ভব নয়। হয়ত এ কারণে সর্দারদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে এ রাজের অবসান সম্পর্কে কোনও ধারণার স্থান ছিল না। বীরসা আন্দোলনের রাজনৈতিক দর্শন সম্পূর্ণ আলাদা। তার মূল লক্ষ্য গোটা মুণ্ডাজাতির পুনরুজ্জীবন; শুধুমাত্র কয়েকটা ভুঁইহার পরিবারের হারানো জমি এবং মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া নয়। আর এ উজ্জীবন স্বাধীন মুণ্ডারাজের সৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়। তাই ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্যের সম্পূর্ণ বিলোপ বীরসার বিপ্লব-দর্শনের মূল প্রেরণা। সর্দারদের উদ্যোগ বীরসা আন্দোলনের বিশিষ্ট রূপ সৃষ্টি করেনি। বরং বলা যায়, স্বতন্ত্রভাবে গড়ে ওঠা বীরসা-আন্দোলনে সর্দাররা নিজের তাগিদে যোগ দেয়। গ্রামাঞ্চলে তাদের আগের প্রভাব প্রায় লোপ পেতে বসেছিল। তাদের ধারণা ছিল, বীরসা আন্দোলনে যোগ দিলে আবার তারা তা ফিরে পেতে পারে।

বীরসা-আন্দোলনের বিপুল প্রসারের জন্য প্রয়োজনীয় কিছু কিছু উপকরণ আগে থেকেই ছিল। কিন্তু বীরসার 'সম্মোহনী প্রতিভা' ছাড়া এ আন্দোলন তার বিশিষ্ট রূপে প্রকাশ পেতে পারত না। কিন্তু এ বিশিষ্টতার সব লক্ষণ প্রথম থেকেই সমানভাবে স্পষ্ট ছিল না। আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে এ সব লক্ষণের স্বকীয়তা পরিষ্কার হয়ে উঠেছে। যেমন, বীরসার রাজনৈতিক আন্দোলনের কর্মসূচি। বলা হয়েছে, গোড়ায় বীরসা 'ধর্মীয় পথ'-কে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন; পরে পরে প্রতিরোধ আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে তিনি হিংসার প্রয়োগকে স্বীকার করে নিয়েছেন।[(১৪১)] আসলে বীরসার চিন্তায় তথাকথিত 'ধর্মীয় পথ' ও 'রাজনৈতিক পথে'র মধ্যে কোনও দুস্তর ব্যবধান ছিল না। প্রথম আন্দোলনেও তার ধর্মীয় চেতনা আসলে রাজনৈতক চেতনার অংশ। আমরা একটু পরেই দেখব, দ্বিতীয় আন্দোলনে রাজনৈতিক কৌশলের রূপ পাল্টালেও ধর্মীয় পন্থার গুরুত্ব একটুও কমেনি।

গোড়ায় রাজনৈতিক চেতনাকে ঘিরে ধর্মীয় চেতনা গড়ে উঠলেও সঠিক রাজনৈতিক পথ ও কৌশল সম্পর্কে তার ধারণায় পরিবর্তন আছে। কিন্তু এমন নয় যে, এ রাজনৈতিক পথ সম্পর্কে তখন তার কোনও ধারণাই ছিল না। আসলে প্রথম বীরসা আন্দোলনের শুরু, বীরসার যে 'ঘোষণা'র মধ্য দিয়ে, তা মূলত রাজনৈতিক ঘোষণা[(১৪২)]। মুণ্ডাদের বীরসা বলে, এক মহাপ্রলয়ের পরে কলুষময় পৃথিবীর আসন্ন বিলুপ্তি ঘোষণার জন্য ভগবানের দূত হিসাবে তার আবির্ভাব। কলুষিত পৃথিবীর আসন্ন বিনাশের ঘোষণা স্পষ্টত রাজনৈতিক ঘোষণা। বীরসার ঘোষণায় ছিল, এ প্রলয়ের ফলে 'সরকার'ও নিশ্চিহ্ন হবে।

(‘ভেসে যাবে’)। ‘সরকার’ ছাড়া আরও দুটো ‘কলুষে’র কথা তার মাথায় ছিল: কৃষিকাজ এবং মুদ্রাসর্বস্ব অর্থনীতি। কেন কৃষিকাজ কলুষিত, বীরসা তা বুঝিয়ে বলেনি। পরবর্তীকালের ওঁরাও ও হো আন্দোলনে এ ধারণা আরও স্পষ্টভাবে দেখতে পাই। ওই আন্দোলনের নেতারা বলেছে—দীর্ঘকাল কৃষিকাজের জন্য তাদের নিরলস শ্রম সম্পূর্ণ বিফল হয়েছে; তাদের উৎপন্ন ফসলের বহুলাংশ তাদের শোষকদের ভোগে গেছে। এমনকী, তাদের জমিও এ শোষকের ভোগে গেছে। তাদের জীবিকা হিসাবে কৃষি কাজের এই যদি পরিণাম হয়, তাহলে এ কাজের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অর্থহীন। আর মুদ্রা ও বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে বহিরাগতরা কীভাবে শোষণের জাল ছড়িয়েছে সেটা তো, বীরসার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। তাই বীরসার ঘোষণা: ‘এ দুনিয়ার সব টাকা পয়সা জল হয়ে যাবে; তাদের হাতে যা কিছু অর্থ আছে, তা যেন অতি শীঘ্র তারা খরচ করে ফেলে এবং তা দিয়ে বস্ত্রাদি কেনে’।

এ সর্বব্যাপী বিনাশের মুহূর্তে একমাত্র তার অনুগামীদের জন্যই তার অভয়বাণী: সামগ্রিক এ বিপর্যয় তাদের স্পর্শ করবে না। তারা সবাই জড়ো হবে বর্তমান জনপদ থেকে দূরে ‘এক উঁচু ডাঙ্গায়’। সে জায়গা নিরাপদ। অনুগামীদের নিয়ে বীরসা সেখানে নিষ্কলুষ এক পৃথিবী গড়ে তুলবে।

এ ঘোষণায় যে চেতনা প্রতিফলিত, তা শুধুমাত্র তথাকথিত ধর্মীয় চেতনা নয়। হিন্দু প্রভাব অনুপ্রাণিত ধর্ম-আন্দোলনের নির্দিষ্ট সীমারেখা এখানে চোখেই পড়ে না। কলুষিত রাষ্ট্রব্যবস্থা (‘সরকার’) এবং মুদ্রানির্ভর অর্থনীতির বিলোপ কীভাবে ঘটবে এ সম্পর্কে বীরসার চিন্তায় দুটো ধারা দেখা যায়। একটার কথা আগেই বলেছি—বিধ্বংসী এক প্লাবন। এটা তো পৃথিবীর মানুষের কোনও উদ্যোগের ফলে ঘটবে না। এ ক্ষেত্রে তাহলে তাদের ভূমিকা কি? বীরসা কোথাও তা স্পষ্ট করে বলেনি। পৃথিবীর অন্যত্র এ ধরণের ‘millennial’ আন্দোলনে সচরাচর যা ঘটেছে, সম্ভবত তার মনে তাই ছিল। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষের একমাত্র করণীয়, পরমশুদ্ধচিত্তে গভীর আর্তির সঙ্গে অতিপ্রাকৃত ঘটনাটির জন্য তাদের নিবিড় উন্মুখ প্রতীক্ষা। আগেই বলেছি, প্রধানত ক্ষুদ্র এক অনুগামী গোষ্ঠীর কথাই বীরসার মাথায় ছিল। স্বভাবতই এ অনুগামীরা বীরসার ‘শুদ্ধ’ বিশ্বাস ও আচারের আদর্শে দীক্ষিত এবং অনুপ্রাণিত। বীরসা-নিয়ন্ত্রিত এ কলুষমুক্ত নতুন জনপদের তারাই প্রথম বাসিন্দা।

অনুগামীদের কাছে বীরসার নানা নির্দেশ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, সশস্ত্র প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের কথাও তার চিন্তায় ছিল। প্রলয়ের কালে ‘সরকার ভেসে যাবে’ —এ ঘোষণা আসলে ব্রিটিশরাজ উচ্ছেদের সম্ভাবনা সম্পর্কে তার প্রত্যয়দীপ্ত ভবিষ্যবাণী। তার নতুন ‘দেওয়ান’ এবং অন্যান্য প্রতিনিধিদের গ্রামে গ্রামে এ ঘোষণা করার ভার দেওয়া হয়েছিল যে, মুণ্ডারা যেন তাদের কুড়ুল এবং ফরসা নিয়ে ২৭শে আগষ্ট (১৮৯৫ সাল) তাদের নতুন জায়গায় আসে। বীরসা তাদের যে আশ্বাস দিয়েছিল তাতেও তার সহিংস রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিকল্পনা বোঝা যায়। বীরসা তাদের বলে—ব্রিটিশ বুলেটকে ভয়ের কোনও কারণ নেই, কারণ অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভাবে এ বুলেট নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে, জলে পরিণত হবে। বীরসার সক্রিয় উদ্যোগ না থাকলে তার এ আশ্বাসবাণী এত দ্রুত ছড়াতে পারত না। সরকারি মহলে টনক নড়ে। লোহারডাগার পুলিশাধ্যক্ষ সিদ্ধান্ত নেয়, দাঙ্গাহাঙ্গামা দমানোর জন্য সরকারি নির্দেশ মতো খালি কার্তুজ ব্যবহার করা নির্বুদ্ধিতা হবে, কারণ বিদ্রোহীরা একে বীরসার কথার যথার্থতার প্রমাণ ধরে নিয়ে আরও ‘দুঃসাহসী’ হবে।

আন্দোলন শুরু হবার কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বীরসা গ্রেপ্তার না হলে সশস্ত্র প্রতিরোধের ক্ষেত্রে তার উদ্যোগ সম্ভবত প্রশস্ততর হত এবং এ সম্পর্কে তার ধারণা আরও স্পষ্ট হত। এমনও হতে পারে, যথাযথ প্রস্তুতির অভাবের জন্যও ‘রাজনৈতিক পথ’ সম্পর্কে গোড়ায় বীরসার দ্বিধা ছিল। দ্বিতীয় আন্দোলন শুরু (ডিসেম্বর ১৮৯৯) করার আগে বীরসা যে চার বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষা করে, তার একটা প্রধান কারণ; সর্বাত্মক প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য যথাযথ এবং নিপুণ সংগঠন গড়ে তোলা অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার ছিল। এর একটা কারণ, এ প্রস্তুতি রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক, দু’ ক্ষেত্রেই।

১৮৯৪-৯৫ এর আন্দোলনের সঙ্গে বীরসার পরবর্তী আন্দোলনের (১৮৯৯-১৯০১) পার্থক্য তথাকথিত ‘ধর্মীয় পথ’ ও ‘রাজনৈতিক পথে’র আপেক্ষিক গুরুত্ব নিয়ে নয়। দুটো আন্দোলনের মধ্যে ধারাবাহিকতা স্পষ্ট। পার্থক্য প্রধানত দুটো দিকে। একটার উল্লেখ আগেই করেছি। দ্বিতীয় আন্দোলনের সংগঠন অনেক বেশি মজবুত। এটা পরে আলোচনা করব। আরও একটা পার্থক্য—গোড়ায় বীরসার রাজনৈতিক দর্শনে যে অনির্দিষ্টতা, অস্পষ্টতা ছিল, পরবর্তী আন্দোলনে তা প্রায় সম্পূর্ণ দূর হয়ে গেছে।

প্রথম আন্দোলনে সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা বীরসার মাথায় থাকলেও তার প্রধান নির্ভর ছিল অতিপ্রাকৃত এক ঘটনার উপর—বিধ্বংসী এক মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সব কলুষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে; একমাত্র ব্যতিক্রম শুধু জনপদ থেকে দূরে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত তার আদর্শে অনুপ্রাণিত এক ক্ষুদ্র অনুগামী গোষ্ঠী। পরবর্তী আন্দোলনে বীরসার রাজনৈতিক ধ্যান ধারণায় এ কুয়াশা কেটে গেছে। নতুন মুণ্ডাসমাজ গড়ে উঠবে বর্তমান ‘কলুষময়’ পৃথিবী থেকে দূরে কোথাও নয়; তা গড়ে উঠবে একান্ত প্রত্যক্ষ, সন্নিকট, জীবনের সহস্র অভিজ্ঞতার

সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। কোনও মহাপ্লাবনের ফলে এ রূপান্তর ঘটবে না; সহিংস সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনেই পরাক্রান্ত শত্রুকুল পর্যুদস্ত, নিশ্চিহ্ন হবে। কাদের বিরুদ্ধে এ সংগ্রাম? বীরসার নির্দেশে তাও স্পষ্ট করে বলা হল। মুণ্ডারাজ প্রতিষ্ঠার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ব্রিটিশরাজ। মুন্ডা চেতনায় এ রাজ শুধুমাত্র স্থানীয় প্রশাসন নয়—গোটা যুরোপীয় গোষ্ঠী—‘সাহেব লোক’ এমনকী মিশনারিরাও। মুন্ডাদের কোনও ক্ষতি বিদ্রোহীরা করবেনা। তাদের লড়াই ‘হিন্দু এবং সরকারের’ বিরুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাদের সব আক্রোশ বিস্তৃত অর্থে ‘সাহেব লোক’দের বিরুদ্ধে।

এ আন্দোলনের একটা প্রধান ভিত্তি, বীরসার ‘চিন্তা’য় উদ্দীপিত অনুগামীদের নিপুণ সংগঠন। এর মূল কথা, ব্যাপক গণ-সংযোগ গড়ে তোলার জন্য সুসংবদ্ধ প্রয়াস। আগে মুণ্ডারা যেত চালকাদে বীরসার ‘আশ্রমে’। এখন বীরসার মন্ত্রশিষ্যগোষ্ঠীই যাবে মুণ্ডাদের কাছে। এমনকী দূর প্রত্যন্ত অঞ্চলেও। তাদের বিশ্বাস, এ ভাবে বীরসা-চিন্তার ‘বীজ’ বহু দূর ছড়িয়ে যাবে। জার্মান মিশনারি হফমানের লেখা থেকে জানতে পারি, এ সংগঠনের তিনটে স্তর—প্রচারক, পুরানক আর নানক। প্রথম দল বীরসার একেবারে কাছের লোক; রাতে মুন্ডাদের যে গোপন সমাবেশ হত, সে সম্পর্কেই ছিল তাদের প্রধান দায়িত্ব। এদের তুলনায় পুরানকদের সংখ্যা অনেক বেশি; গোটা মুন্ডা মুলুক থেকে নানা দিক বিচার করে তাদের বাছাই করত বীরসা নিজেই। তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে হফ্‌মান লিখছেন, ‘প্রকাশ্য সংঘর্ষের সংকল্প থেকে তারা কখনও বিচ্যুত হয়নি’। নানকরা নতুন শিষ্য। বিদ্রোহ শুরুর কয়েকমাস মাত্র আগে তারা যোগ দেয়। তারা সশস্ত্রবাহিনীর অংশ; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চায়েতের সলাপরামর্শে তাদের যোগদানের অধিকার ছিল না।

বীরসা-পরিচালিত ধর্ম-সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে একটা প্রশ্নের আলোচনা প্রয়োজন। এ দুই আন্দোলনের মধ্যবর্তী সময়ে মুন্ডাদের আদি সংস্কৃতি সম্পর্কে বীরসার দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল কি? সুরেশ সিং মনে করেন একটা পরিবর্তন লক্ষণীয়।[১৪২ক] আন্দোলনের ‘উদ্দেশ্য’ এবং ‘উপায়’ সম্পর্কে যে পরিবর্তনের কথা বীরসা বলেছেন তার আলোচনা আমরা করেছি। ‘সামাজিক-সাংস্কৃতিক দিক্’ (‘socio-cultural aspects) থেকেও সুরেশ সিং একটা পরিবর্তন লক্ষ করেছেন। তাঁর মতে প্রথম আন্দোলনে মূল জোর পড়েছে সমাজের সংস্কার ও শোধনের উপর (‘রিফরম্যাটিভ্’); পরের ‘পর্যায়ের’ আন্দোলনের ঝোক্ ‘পুনরুজ্জীবনের’ দিকে (‘রিভাইভ্যালিষ্টিক্’)। গোড়ায় এ ঝোঁক ছিল প্রচ্ছন্ন (‘latent’); পরের আন্দোলনে তা ‘প্রকাশ্য’ (‘it came to the surface’)। মুন্ডাসংস্কৃতির নানা আদি উপকরণ (‘ancient ingredients’) বীরসা আবার মুন্ডাদের কাছে ‘ফিরিয়ে আনেন’; বলেন, এতে বাইরের যা সংযোজন (‘alien elements’) তাকে ‘নির্মূল’ করতে হবে; ‘বৈষয়িক’ এবং ‘ধর্মীয়’ ক্ষেত্রে ভিন্ জাতির শত্রুদের (‘racial enemies’) ‘তাড়াতে’ হবে (‘expelled’)। দুটো দিক থেকে সুরেশ সিং-এর এ সিদ্ধান্ত বিচার করা যায়। সিং যাকে ‘রিভাইভ্যালিজম’ বলছেন, তা কি সত্যিই তাই? আরও গুরুত্বপূর্ণ দিক্ হল—‘সংস্কার’ এবং ‘শোধনের’ মূল আদর্শ থেকে সরে আসার কোনও প্রবণতা কি লক্ষ্য করা গেছে?

‘ভিন্‌জাতির দুষমন’দের তাড়াতে হবে অন্তত বৈষয়িক ক্ষেত্রে,—এ ঘোষণার মধ্যে ‘রিভাইভ্যালিজমে’র কোনও লক্ষণ নেই। দীর্ঘকালের মুণ্ডা আন্দোলনের এটাই মূল প্রেরণা। মুণ্ডাসংস্কৃতির যে ‘আদি উপাদান’গুলি বীরসা ফিরিয়ে আনবে বলে বলেছে সেগুলি কি কি এবং তাদের আসল তাৎপর্য বা কি? বীরসার পরিকল্পনা ছিল, মুণ্ডারা প্রচীন মুণ্ডাকীর্তির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত হোক। তিনটে জায়গা এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল—দুটি মন্দির, আর একটা দুর্গ। মুণ্ডাদের বিশ্বাস, সবগুলি তাদের তৈরি। ছুটিয়া মন্দির থেকে আনা হল পবিত্র তুলসিপাতা; জগন্নাথপুর মন্দির থেকে চন্দন বাটা; আরও ‘নও রত্তন’ (Naw Rattan) দুর্গের কাছাকাছি জায়গা থেকে ‘পবিত্র মাটি ও জল’। বিদ্রোহী ‘কোল’দের শৌর্যময় প্রতিরোধ (১৮৩১–৩২) নিয়ে রচিত হল গান: গ্রামে গ্রামে মুণ্ডাদের রাতের জমায়েতে সেগুলি সমবেতভাবে গাওয়া হল। ১৮৩১–৩২ সালের ‘কোল’ বিদ্রোহিদের ‘বীরত্বে’র স্মরণে লেখা গানগুলি ছাড়া অন্য কোনওটাই মুন্ডাদের আদি সংস্কৃতির উপাদান নয়। মুন্ডাদের প্রাচীন কীর্তির অঙ্গ বলে যে মন্দির আর দুর্গের উল্লেখ করা হয়েছে তা আদৌ মুন্ডাদের তৈরি নয়—অন্তত দুটি মন্দির, যে বিশেষ অর্থে আমরা মন্দিরকে বুঝি—নির্দিষ্ট স্থাপত্যের সূচক এক উপাসনা ভবন—মুন্ডাদের ধর্মীয় আচারে তার কোনও স্থান নেই। মুন্ডাদের উপাসনার জায়গা প্রতিটি গ্রামের মধ্যেই—বিশেষ ধরনের গাছে ঘেরা অনাবৃত এক জায়গা, হয়ত বা বড় একটা পাথর গাছতলায় রাখা আছে। লোকালয়ের অনেক দূরে এ সব মন্দির আর দুর্গ মুণ্ডারা গিয়ে দেখুক—বীরসার এ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য মুন্ডাদের মধ্যে ইতিহাসচেতনা সৃষ্টি করা, যদিও সে ইতিহাস বানানো ইতিহাস। বীরসা বলেছে মন্দির ও দুর্গ থেকে আনা জিনিসগুলি—তুলসিপাতা, চন্দন আর মাটি ও জল—সশস্ত্র সংগ্রামে মুণ্ডাদের অপ্রতিরোধ্য করবে।

মুন্ডা-সংস্কৃতির আদি উপাদানগুলি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা বীরসা করুক বা না করুক, তার দ্বিতীয় আন্দোলনে সমাজ-ধর্ম

সংস্কার ও শোধনের আদর্শ থেকে সরে আসার কোনও প্রবণতাই দেখি না। আসলে এ সংস্কার ও শোধন বীরসার সামাজিক রাজনৈতিক দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ। বীরসার নিজের ধর্মবিশ্বাসে একটা পরিবর্তন ঘটে। খ্রিষ্টধর্মের প্রতি খ্রিষ্টান বীরসার আনুগত্য ক্রমেই শিথিল হতে থাকে। আনুষ্ঠানিকভাবে চার্চের সঙ্গে তার সম্পর্কচ্ছেদ না ঘটলেও বীরসা নিজের পরিচয় দিত 'মুণ্ডারী কোল' বলে। কিন্তু তার অর্থ মোটেই এ নয় যে, মুন্ডাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার এবং সংস্কৃতির সব দিক সে সর্বতোভাবে স্বীকার করে নিয়েছে। বরং মুন্ডাদের আদি সংস্কৃতির সঙ্গে বীরসার দূরত্ব প্রায় দুস্তর হয়ে উঠেছিল। মুন্ডাদের পরমারাধ্য দেবতা সিংবোঙ্গা, নানা আঞ্চলিক দেবতা (বোঙ্গা), বোঙ্গার অর্চনার সঙ্গে নানাভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব বীরসা কোনওদিন মেনে নেয়নি। মুন্ডাগ্রামপুরোহিত পাহানদের সম্পর্কে তার উল্লেখ ছিল চরম অবজ্ঞা এবং শ্লেষে ভরা। অমঙ্গলময় শক্তির নিয়ন্ত্রণে যাদের ভূমিকা মুণ্ডারা স্বীকার করে নিয়েছিল — যেমন মাটি, সোকা, দেঁওরা — বীরসার কাছে তারা ছিল উপহাসের বস্তু। আসলে এক নতুন 'শুদ্ধ', 'সংস্কৃত' অনুগামী গোষ্ঠীর অবিচল নিষ্ঠা ও আনুগত্য বীরসার রাজনৈতিক আন্দোলনের অপরিহার্য বনিয়াদ — বীরসার এ বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত অটুট ছিল।

'বীরসা-সম্প্রদায়ে'র এ নৈতিক বৈশিষ্ট্যের কথাই জার্মান মিশনারি হফ্‌মান বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন। তিনি লক্ষ করেছেন — বীরসার এ আদর্শ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত মুণ্ডাদের সঙ্গে বীরসা-শিষ্যরা দূরত্ব রেখে চলত। এ অনমনীয় মনোভাবের জন্য হফ্‌মান এ নতুন 'সম্প্রদায়'কে 'হিন্দুজাতিপ্রথা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। বস্তুত, তাঁর মতে এ সম্প্রদায়ের অনুশাসন কঠোরতর, অন্য মুন্ডাদের সঙ্গে তারা এক সঙ্গে খেত না; তাদের এমনকী তাদের ছেলেপিলেদেরও তারা ঘরের 'চৌকাঠ মাড়াতে দিত না'। ছোটনাগপুর কমিশনার লিখেছেন, তারা এক নতুন ধরনের পইতে পরত। যার নাম 'বীরসা পইতে'।[১৪৩] মুন্ডাধর্ম ও সমাজের 'শোধনের' আদর্শ থেকে সরে আসার একটা প্রবণতা বীরসার চিন্তায় দেখা যাচ্ছিল — এ সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়।

(১০.৪)

মুন্ডাদের তুলনায় ওঁরাও জগতে হিন্দু প্রভাবের প্রসার অনেক ব্যাপকভাবে ঘটেছিল। প্রধানত অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে।[১৪৪] এ ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা ভ্রাম্যমান বৈষ্ণবগুরুদের। হিন্দু প্রভাবের চরিত্রে বিপুল পরিবর্তন এসেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দু'তিন দশকে — বিশেষ করে ওরাঁওদের 'টানা ভগা।' আন্দোলনের শুরু (১৯১৪) থেকে।

ওরাঁও-ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের আলোচনায় সামগ্রিক হিন্দু প্রভাবের যথাযথ চরিত্র বিশ্লেষণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দু'জন বিশেষজ্ঞের সিদ্ধান্ত আমরা বিচার করব — রিজলী এবং শরৎচন্দ্র রায়।[১৪৫] হিন্দু প্রভাবের দুটি পর্যায় — টানা ভগা আন্দোলনের আগে ও পরে। রিজলী সাধারণভবে ভগৎদের কথা বলেছেন। টানা আন্দোলন তাঁর লেখার সময়ের (১৮৯১) অনেক পরে ঘটেছে। রায়ের যে সিদ্ধান্ত আমাদের বিচার্য, তা টানা আন্দোলনের সময়কার হিন্দু প্রভাবের চরিত্র সম্পর্কে।

রিজলী মনে করেন, ভগৎদের চিন্তা ও ভাবাদর্শ ওরাঁওদের আদি সংস্কৃতি থেকে আলাদা কিছু নয়, অর্থাৎ ভগৎদের মাধ্যমে 'হিন্দু প্রভাব' প্রসারের ধারণা তিনি মানেন না। তাঁর মতে ভগৎরা ওঁরাও সমাজের জাদুবিদ্যাকুশলী 'মাটি' সম্প্রদায় থেকে আলাদা কেউ নয়। ওঁরাও জাদুবিদদের দুটি সম্প্রদায়: মাটি ও ওঝা। যারা অশুভশক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত জাদুকলার চর্চা করত, ভগা বা সোকা। যারা ছিল মঙ্গলময় শক্তির প্রয়োগে আগ্রহী। রিজলীর ধারণা ভ্রান্ত। শরৎচন্দ্র রায়ের গবেষণা থেকে আমরা জানতে পারি, ভগৎদের সাধনপদ্ধতি মাটিদের পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাটিরা প্রধানত মন্ত্র ও জাদুর মাধ্যমে আধি ভৌতিক শক্তির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করত। আর ভগৎদের সাধন পদ্ধতি এবং লক্ষ্য ছিল বিধিবদ্ধ ধ্যান ও আচারের ম্য দদয়ে চিত্তশুদ্ধি লাভ করে ভগবানের সান্নিধ্যলাভ। আধিভৌতিক কোনও শক্তির মধ্যস্থতা তারা স্বীকার করত না। প্রাক্‌-ভগৎ ওরাঁও সমাজের ধর্মীয় আচার মূলত গোটা গ্রামের যৌথ অনুষ্ঠান। ভগৎদের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং আচার একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক।

রায়ের সিদ্ধান্ত আমাদের বর্তমান আলোচনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। তাঁর মতে, টানা ভগতদের ধ্যানধারণা আগেকার ভগৎ-ঐতিহ্যের অনুগামী; এতে নতুন কোনও লক্ষণের সংযোজন নেই। তাছাড়া, তিনি মনে করেন, টানা আন্দোলন প্রধানত ধর্মসংস্কার-সম্পর্কিত; রাজনীতির সঙ্গে এর কোনও সংস্রব নেই।

আগেকার ভগৎ সম্প্রদায় এবং 'টানা ভগৎ' সম্প্রদায় অভিন্ন তো নয়ই; তাদের মধ্যে পার্থক্য মৌলিক। প্রাক্‌-টানাযুগের ভগৎ-সম্প্রদায় কয়েকটি মাত্র ওঁরাও পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ; এর ভিত্তি নতুন কিছু ধর্মীয় বিশ্বাস, আচার এবং নৈতিক ধারণা, আর বিশেষ কোনও বৈষ্ণব গুরুর প্রতি আনুগত্য। এটা আসলে কোনও বড় 'আন্দোলনে' পরিণত হয়নি। বৃহত্তর ওরাঁও সমাজের সঙ্গে এ সম্প্রদায়ের যোগ ছিল ক্ষীণ; তাদের মধ্যে এ নতুন বিশ্বাস জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টাও দেখা যায়নি। আগেই বলেছি, ওঁরাওদের ধর্মানুষ্ঠান গ্রাম-কেন্দ্রিক; ভগৎদের সাধনা একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিগত জীবনে

যে কঠোর অনুশাসনের কথা ভগৎ-গুরুরা বলত, ওঁরাও জনসাধারণের পক্ষে তা বিধিবদ্ধভাবে মেনে চলা সহজ ছিল না। অন্তত একটা ভগৎ সম্প্রদায়, 'বাচ্চীদান ভগৎ' সম্পর্কে বলা যায়, যেখানে প্রধানত অপেক্ষাকৃত বিত্তবান ওঁরাওদের প্রাধান্য ছিল। আসলে, তাদের মধ্যেই হিন্দু প্রভাব সব চাইতে বেশি। তারা মূলত আদি ভগৎ-পরিবারের বংশধর। তাদের 'গুরু'রা প্রধানত 'জাতিচ্যুত' ব্রাহ্মণ বা 'নিম্নবর্ণে'র হিন্দু 'বৈষ্ণব-বৈরাগী'। বলা যেতে পারে এ 'বাচ্চীদান' ভগৎ গোষ্ঠী হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। 'বাচ্চীদান' (বাছুর দেওয়া) প্রথা থেকে এটা বোঝা যায়। বিশেষ বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গুরুদের বাছুর দানের বিধান ওঁরাও সমাজে মোটেই প্রচলিত ছিল না। এটাও সহজে বোঝা যায় সচ্ছল ওঁরাও পরিবার শুধু এ প্রথা মানতে পারত।

টানা ভগৎ আন্দোলন সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। সংগঠনের দিক্‌ থেকে আগেকার ভগৎরা ক্ষুদ্র একটা ধর্মীয় গোষ্ঠী (cult) মাত্র; বড় আন্দোলন নয়। ভগৎদের ধ্যানধারণা, ধর্মীয় আচার ব্যক্তিকেন্দ্রিক। অন্যদিকে, টানা আন্দোলনের গুরুদের সুস্পষ্ট ঘোষণা ছিল, এ আন্দোলনের প্রধানতম লক্ষ্য, গোটা ওঁরাও জাতির সাংস্কৃতিক এবং নৈতিক জীবনের পুনর্নির্মাণ। কোনও বিচ্ছিন্ন ওঁরাও পরিবারের অধ্যাত্ম উন্নতির প্রয়াস নয়। টানা আন্দোলন তাই বহু সংখ্যক ওঁরাওদের সম্মিলিত আন্দোলন। এই ব্যাপকতা অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রায় অচিন্তনীয় ছিল। তাছাড়া, কেন হঠাৎ টানা আন্দোলনের নেতারা নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির কথা বলেছে, শরৎচন্দ্র রায়ের লেখায় তার কোনও ব্যাখ্যা মেলে না। আন্দোলনের নেতারা এর উদ্দেশ্য হিসাবে গোটা ওরাঁও জাতির 'মুক্তি', বহিরাগত সব গোষ্ঠীর শোষণের সম্পূর্ণ বিলোপের কথা বলেছে এবং বলেছে, এ নতুন সংস্কৃতি এ মুক্তি-প্রয়াসের অপরিহার্য অঙ্গ। রায় এ যোগের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। এ প্রশ্নের আলোচনা আমরা পরেও করব। রায় অবশ্য বলেছেন। 'এ আন্দোলনের মূল কারণ অর্থনৈতিক'[১৪৬]। নানা কারণে, বিশেষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নিত্যপ্রয়োজনীয় নানা জিনিসের হঠাৎ মূল্যবৃদ্ধির ফলে ওরাঁওদের দুর্দশা চরমে উঠেছিল। কিন্তু অর্থনৈতিক দিক থেকে নানাভাবে বিপর্যস্ত ওরাঁওদের অস্থির মানসিকতা থেকে রাজনৈতিক চেতনায় উত্তরণ যে খুব একটা অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, রায় তা স্বীকার করেননি। সংস্কার এবং শোধন আন্দোলনে অর্থনীতি এবং রাজনীতির অনুপ্রবেশ রায়ের মতো এক 'দুর্ভাগ্যজনক সংমিশ্রণ'।[১৪৭]

রায়ের মতে, এ সংমিশ্রণের ফলে দুটো আন্দোলনেরই ক্ষতি হয়েছে। আমাদের ধারণা, লাভ বা ক্ষতির প্রশ্ন এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিকের কাজ, এ দুটি আন্দোলনের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার চরিত্র বুঝতে চেষ্টা করা। এ চরিত্র মুন্ডা এবং ওরাঁওদের ক্ষেত্রে অভিন্ন। মুন্ডাদের ক্ষেত্রে যা দেখেছি, এখানেও তাই ঘটেছে। রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ এবং সংগঠিত প্রতিরোধ আন্দোলনের ফলে আগেকার সংস্কার-প্রয়াসের তাৎপর্য সম্পর্কে পুরনো ধারণা আমূল পাল্টে গেছে। আগেকার ভগৎ আন্দোলন বৃহত্তর ওরাঁও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর নতুন ধর্মবিশ্বাস এবং জীবনচর্যার কাহিনী। টানা ভগৎ আন্দোলন গোটা ওরাঁও জাতির আত্ম-নিরীক্ষার সংকল্প এবং প্রয়াস, যার মূল গতিবেগ এসেছে বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রেরণা থেকে। রায় যাকে অবাঞ্ছিত মিশ্রণ বলেছেন, টানা আন্দোলনের সেটাই আসল রূপ।

এ আন্দোলনের ধারাবাহিক বিবরণ[১৪৮] বর্তমান আলোচনার এক্তিয়ারে আসে না। আমরা প্রধানত দেখব, হিন্দু-ধারণা-প্রভাবিত আগেকার 'সংস্কার' প্রয়াসের চরিত্র কীভাবে নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রেরণায় পাল্টে যাচ্ছে।

টানা আন্দোলনের উপর প্রধান প্রভাব পূর্বতন ভগৎ-ঐতিহ্য নয়; বিগত কয়েক দশকে সাঁওতাল ও মুন্ডা জগতে বিশিষ্ট ধরনের 'শুদ্ধি আন্দোলন'। এর দুটো বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলেছি: (ক) আদিবাসী সংস্কৃতির অনেক দিক নির্মমভাবে বর্জন করতে হবে, (খ) কিন্তু এ বর্জনের অর্থ আদিবাসী হিসাবে মৌলিক স্বাতন্ত্র্যবোধের অস্বীকার নয়। বারবার বলা হয়েছে, এ বর্জনের ফলে নতুন সৃষ্ট সংস্কৃতি এবং তার ভিত্তিতে গড়ে তোলা এক আলাদা জীবন-চর্যা এ স্বাতন্ত্র্য-চেতনা প্রখর করবে; কারণ এ নতুন সংস্কৃতি আসলে বহিরাগতদের প্রভুত্ব এবং শোষণ থেকে সর্বাত্মক মুক্তি আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার; আদিবাসী 'রাজে'র প্রতিষ্ঠা ও স্বাতন্ত্র্য-চেতনা বিকাশের নিশ্চিত ভিত্তি।

শুদ্ধি আন্দোলনের মূল প্রেরণা যেখান থেকেই আসুক — যেমন বৈষ্ণবগুরুদের প্রচার বা বিগত কয়েকদশকের সাঁওতাল ও মুন্ডা আন্দোলন — ওঁরাও নেতারা একে তাদের আদি ইতিহাস ও সংস্কৃতির মূল শিকড়ে ফিরে যাবার পথ হিসাবে মনে করেছে। তারা বলেছে, এর ফলে প্রতিষ্ঠা হবে তাদেরই 'কুরখ ধরম্‌'— 'সত্য ধর্ম'; নতুন ধর্মচেতনার প্রাণ কেন্দ্রে যে বিশ্বাস, — ভগবানের একত্ব — তা তো এককালে তাদের 'সত্য ধর্মে'রই মূল বাণী। এ বিশ্বাস কি করে হারিয়ে গেল এবং তার বদলে এল বহু দেবদেবী, ভূত প্রেতে বিশ্বাস — সেটাও ওরাঁওরা নিজের মতো করে ব্যাখ্যা করে। তারা বলল, মুন্ডাদের সংস্পর্শেই তাদের ধর্মীয় জীবনের আদি রূপ নষ্ট হয়েছে। এ ব্যাখ্যার ঐতিহাসিক ভিত্তি কী, সেটা আসল প্রশ্ন নয়। এ বিশ্বাস তাদের শুদ্ধির প্রয়াসকে অনুপ্রাণিত করেছে। ঐতিহাসিক তাই এ বিশ্বাসের জগতকে বুঝতে চেষ্টা করবে।

ভগবানের একত্বে বিশ্বাস যদি 'শুদ্ধ' জীবন-চর্যার মূল প্রেরণা হয় তাহলে ভূত, প্রেত, ডাইনিবিদ্যায় তাদের দীর্ঘকালের বিশ্বাস বাদ না দিলে 'কুরুখ ধরমে'র উপলব্ধি সম্ভব নয়। সর্বব্যাপী 'ভূতে' ওরাঁওদের বর্তমান বিশ্বাস এক-ভগবানের বোধকে খণ্ডিত করে। ভূত প্রেতের পুজো বাদ দিয়ে ওরাঁওরা তাই 'জ্ঞান ও বাক্দাতা' পরমেশ্বরকে ধ্যান করবে, দিনে-রাতে-সকাল-সন্ধ্যায়।

শুধুমাত্র 'সত্য ধর্মে'র সঙ্গে অসঙ্গতির জন্য ওই ভূত-প্রেতের পুজো, এর সঙ্গে যুক্ত নানা আচার অনুষ্ঠান এবং যৌথ গ্রাম জীবনের বহু প্রথা বর্জনের কথা বলা হয়নি। সাঁওতাল মুন্ডা অঞ্চলের মতো এখানেও টানা নেতাদের বিশ্বাস ছিল, ওরাঁওদের বর্তমান দুর্দশার প্রধান কারণ এ সব আচারঅনুষ্ঠান ও প্রথা। তাই নেতারা অনবরত বলেছে, এ সব নির্মূল না হলে এ দুর্গতির অবসান হবে না। 'টানা' সংগঠন থেকে বোঝা যায়, কী গভীর বিশ্বাসে নেতারা শুদ্ধি আন্দোলনের অপরিহার্যতার কথা বলেছে। বীরসা আন্দোলনের সংগঠনের সঙ্গে এর পার্থক্য লক্ষণীয়। বীরসার ত্রিস্তর সংগঠনের কথা আমরা আগে বলেছি। এর মূল কথা, প্রচারক, পুরানক এবং নানকেরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে বীরসার বাণী প্রচার করবে। কিন্তু গ্রামের বহু সংখ্যক মানুষকে কীভাবে সরাসরি আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করা যায় এ সম্পর্কে বীরসার কোনও নির্দেশের কথা আমরা জানি না। রাতের গোপন জমায়েতে বহু মানুষ আসত; কিন্তু এখানে আসন্ন রাজনৈতিক সংগ্রামের সঠিক কৌশল সম্পর্কেই সম্ভবত বেশি আলোচনা হত। শুদ্ধি আন্দোলনের বাণী প্রচারের জন্য এত গোপনীয়তার দরকার ছিল না। ওরাঁও সংগঠনের স্বতন্ত্র প্রকৃতির জন্যই গ্রামের বহু মানুষ টানা আন্দোলনে নিজস্ব উদ্যোগে যুক্ত হতে পেরেছিল। প্রথমে নেতাদের নির্দেশ মতো গ্রামের বাইরে কোনও খোলা জায়গায় পাশাপাশি গ্রামের কয়েকজন যুবক জড়ো হত। তাদের উপর দায়িত্ব ছিল অন্য গ্রামের যুবকদের তারা আন্দোলনে যুক্ত করবে। এ ভাবে অল্প সময়ের মধ্যে এ সংগঠন একটা বড় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। টানা প্রচারের একটা বৈশিষ্ট্যের জন্য বহু মানুষের সঙ্গে এ সংযোগ প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়েছিল। তা হল, এ প্রচারে গানের ভূমিকা। ওরাঁওদের বিশ্বাস ছিল অশুভ নানা শক্তির অপসরণে ছন্দোবদ্ধ, মন্ত্রপূত, সমবেত সঙ্গীতের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। এ সমাবেশে শুদ্ধি আন্দোলনের প্রচারক আর ওরাঁও জনসাধারণের মধ্যে কোনও ব্যবধান থাকত না। টানা আন্দোলনের বিস্তার যেখানেই ঘটেছে[১৪৮] যেমন হাজারিবাগ, মধ্যপ্রদেশ এবং উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ির চা বাগিচা—সর্বত্রই এ সমবেত গান ছিল ওরাঁওদের প্রতিরোধ এবং প্রতিবাদের একটা প্রধান ভাষা।

নেতাদের নির্দেশ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, শুদ্ধি আন্দোলন মূলত বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের অঙ্গ। টানা আন্দোলনের কর্মসূচিতে কোথাও তাই এ দুটো জিনিসকে আলাদা করে দেখা হয়নি। বীরসা-আন্দোলনের মতো এখানেও দেখি, প্রতিরোধ আন্দোলনের কৌশল সম্পর্কে নেতাদের ধারণা ক্রমেই স্বচ্ছ হয়ে আসছে। বীরসার মতো টানা আন্দোলনের প্রথম নেতা যাত্রা ভগৎ গোড়ায় (এপ্রিল ১৯১৪) বিশ্বাস করত, নতুন ওরাঁও সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠবে বর্তমান কলুষিত সমাজের বাইরে কোথাও। যাত্রা এও বলত, জীবিকা হিসাবে কৃষিকাজ অর্থহীন—কারণ এত চাষবাস হয়েছে, অথচ ওরাঁওদের দুর্দশা ঘোচেনি। যাত্রার নানা নির্দেশে অবশ্য তার রাজনৈতিক চিন্তার অন্য দিকের পরিচয়ও মেলে। যাত্রা ঘোষণা করে—ওরাঁওরা ধাঙড় বা কুলির কোনও কাজ আর করবে না; বাংলা ও অসমের চা বাগানে কুলি হিসাবে যাবে না; জমিদার, এমনকী সরকারের অধীনেও তারা দিনমজুরি করবে না। যাত্রার দ্বিতীয় আন্দোলনে (অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯১৫) কিন্তু পরিষ্কার বলা হয়েছে, জমিদারের খাজনা বন্ধ করতে হবে। তাছাড়া, ব্রিটিশরাজের আসন্নপ্রায় অবসান সম্পর্কে প্রকাশ্য ভবিষ্যদ্বাণী করা হল; এ সময় ওরাঁওদের সমবেত গানে 'জার্মান বাবা'র আহ্বান একটা বিশিষ্ট সংযোজন। ব্রিটিশরাজবিরোধিতা তাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের একটা প্রধান প্রেরণা হয়ে উঠে।

শুদ্ধি এবং ওরাঁও শত্রুদের প্রতিরোধ—এ দুয়ের নিগূঢ় সংযোগের জন্যই এ সময়কার ওরাঁও আন্দোলনে আদিবাসী হিসাবে তাদের স্বাতন্ত্র চেতনা এত প্রখরভাবে দেখা যায়। আগেই উল্লেখ করেছি, এক ভগবানে বিশ্বাসের উৎস হিসাবে তারা নিজেদের আদি 'কুরুখ ধরমে'র কথা বলেছে। কোনও কোনও হিন্দু বিশ্বাস ও আচার গ্রহণ করলেও হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে তারা কখনও নিজেদের ভাবেনি। তাদের কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে হিন্দু-ব্রাহ্মণদের ভূমিকা ছিল না। টানারা পৈতে পরত; কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, এর ফলে ব্রাহ্মণের মতো একটা আলাদা 'উচ্চবর্ণ' সৃষ্টির চিন্তা তাদের মাথায় ছিল। পৈতে পরার অধিকার সব টানাদের; বিশেষ কোনও গোষ্ঠীর নয়। শরৎচন্দ্র রায়কে তারা বলেছে,[১৪৯] পৈতে টানাদের একটা বিশিষ্ট চিহ্ন মাত্র; যেমন সব টানারা নিজেদের বাড়ির নিদর্শন হিসাবে সামনে সাদা পতাকা ঝুলিয়ে রাখে। স্বাতন্ত্র্য-চেতনার আরও একটা প্রকাশ আমরা দেখি। বহু খ্রিষ্টান ওরাঁও এ সময় চার্চের সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে নিজেদের সমাজে ফিরে আসছে। এমনকী, সংগঠিত ওরাঁও আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়লেও এক আদিবাসী গোষ্ঠী হিসাবে ওরাঁদের স্বাতন্ত্র্য-চেতনা দুর্বল হয়নি। প্রাতিষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম এবং বিশিষ্ট হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের নতুন করে কোনও আগ্রহ দেখা যায়নি। এটা

উল্লেখযোগ্য, কারণ কোনও কোনও হিন্দুসংগঠন—যেমন আর্য সমাজ আদিবাসীদের মধ্যে হিন্দুধর্ম বিস্তারে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিল। তাদের চেষ্টা সফল হয়নি। এ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায়ের ব্যাখ্যা তাৎপর্যপূর্ণ। রায় প্রধানত ওরাঁও নেতাদের মনোভাবের কথা বলেছেন।[১৫০] ব্রাহ্মণ-প্রভাবিত হিন্দুসমাজ-ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের গভীর অবিশ্বাস ছিল। তাদের ধারণা, আনুষ্ঠানিক হিন্দুধর্ম গ্রহণ করলেও তারা উচ্চবর্ণের সামাজিক মর্যাদা পাবে না; তাদের স্থান হবে হিন্দুবর্ণব্যবস্থার একেবারে নীচের দিকে। এ সন্দেহ অবিশ্বাসের একটা কারণ, আর্যসমাজের প্রচারকদের আচরণ। মুখে তারা বলত, তারা জাতপাত মানে না, ওরাঁওদের হাত থেকে জল খেতে তাদের কোনও সংকোচ নেই, নির্দ্বিধায় খাবে তাদের রান্না খাবার। কিন্তু বাস্তবে তা ঘটেনি। বর্ণহিন্দুর আজন্ম সংস্কার তারা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কথায় ও কাজে এ অমিল হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাদের বিদ্বিষ্ট করে তোলে।

(১০.৫)

হো-দের মধ্যে শুদ্ধি আন্দোলনের দুটি পর্যায়—১৯০৭ এবং ১৯৩১-৩২-য়ে। দ্বিতীয় আন্দোলনের ব্যাপকতা অনেক বেশি। সিংভূমে শুরু হলেও আন্দোলন অন্যান্য জায়গায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল।[১৫১]

অন্যান্য জায়গার তুলনায়, শুদ্ধি আন্দোলনের মূল প্রকৃতিতে এখানে বিশেষ পার্থক্য ঘটেনি। কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচনায় এর কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য।

(ক) জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব এখানে অনেক বেশি হলেও এ আন্দোলনের নির্দিষ্ট কর্মসূচির মাধ্যমে হো-রা নিজেদের মুক্তি খোঁজেনি। এর পথ একান্তভাবে তাদেরই; আঞ্চলিক সংস্কৃতির সঙ্গে যার নিবিড় যোগ। একটা বিশিষ্ট পথ 'শুদ্ধি'। গান্ধীজির কোনও কোনও কর্মসূচির—যেমন মদ্য পাননিবারণ—সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। কিন্তু 'শুদ্ধি' আন্দোলনের মূল দর্শন সম্পূর্ণ ভিন্ন।

(খ) শুদ্ধি আন্দোলনের ফল হিসাবে সাঁওতাল, মুন্ডা, ওরাঁও জগতে যে এক ধরনের সামাজিক বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমরা আগে উল্লেখ করেছি। যারা 'শুদ্ধি'র আদর্শে অনুপ্রাণিত, আর যারা নানা কারণে এ আদর্শ জীবন-চর্যার অংশ হিসাবে মেনে নিতে পারেনি,—তাদের মধ্যে দূরত্ব এ বিভেদের কারণ। হো অঞ্চলে এ বিভেদ সম্ভবত এত ব্যাপক এবং প্রকট হয়নি বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্দোলনের সময়। অন্তত কোনও কোনও জায়গায়। এর একটা কারণ, হোদের প্রাচীন গ্রামসমাজের সংগঠন তখন অনেক দুর্বল হয়ে গেছে; ফলে আদি সাংস্কৃতিক নানা প্রথা, আচার এবং প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পুরনো সম্ভ্রমবোধ অনেকটা হারিয়ে গেছে। অনেক পুরনো আচার বর্জন সম্পর্কে 'শুদ্ধি' আন্দোলনের প্রবক্তাদের প্রচার মেনে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয়েছিল।

(গ) 'হো' আন্দোলনের নেতাদের কোনও কোনও নির্দেশ থেকে মনে হতে পারে, তারা যেন হিন্দুবর্ণপ্রথার কিছু দিক অনুমোদন করেছে। কিন্তু এ নির্দেশের বিকল্প ব্যাখ্যা সম্ভব।

হো-শুদ্ধিআন্দোলনের মূল ধারণাগুলিতে বিশেষ নতুন কিছু দেখি না। (কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রমের কথা পরে বলছি)। মৌলিক কিছু বিশ্বাস এবং ধারণা নানা আদিবাসী অঞ্চলকে একই ভাবে প্রভাবিত করছে, এটা তাৎপর্যপূর্ণ। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে সাংস্কৃতিক রূপান্তরের দিক থেকে আদিবাসী জগতের পুরনো বিচ্ছিন্নতা প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গেল। এক অঞ্চলের নতুন সাংস্কৃতিক পরিবর্তন অতি দ্রুত অন্যান্য অঞ্চলকেও প্রভাবিত করে। এ প্রভাবে অনুকরণের ভূমিকা আছে। কিন্তু অনুকরণের উপাদানগুলি ধর্মীয় আচারঅনুষ্ঠানের বহিরঙ্গ নয়। সেগুলি মূলত এমন বিশ্বাস বা ধারণা যাকে ঘিরে নতুন এক জীবন-চর্যা গড়ে উঠবে। আন্দোলনে উদ্যোগ বা দায়িত্ব প্রধানত তাদের। যারা সচেতনভাবে এ নতুন জীবনের সংকল্প নেবে।

বিভিন্ন অঞ্চলের শুদ্ধি আন্দোলনে এ মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও কয়েকটা ব্যতিক্রম লক্ষণীয় বিশেষ করে বীরসা আন্দোলনের সঙ্গে তুলনায়। আমরা আগেই বলেছি বীরসা মুন্ডাদের পরমারাধ্য-সিংবোঙ্গার অস্তিত্ব স্বীকার করেনি। মুন্ডাদের গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক নানা দেব-দেবীকেও বীরসা মানেনি বলে এদের পুজোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা প্রথাও বর্জন করার কথা অনুগামীদের সে বলেছে। যেমন পবিত্র বৃক্ষকুঞ্জে (সর্না) গ্রামের লোকের সমবেত আরাধনা। হো'দের 'শুদ্ধি'র ধারণায় সিংবোঙ্গা তার আদি মহিমা ফিরে পেল। ফিরে এল নির্দিষ্ট বৃক্ষকুঞ্জের পবিত্রতায় বিশ্বাস।

শুধু তাই নয়। 'সরনা'র একটা প্রতীকী অর্থও গড়ে উঠল। সরনা বলতে আগে বোঝাত গ্রামের নির্দিষ্ট একটা জায়গা, যেখানে সে গ্রামের লোক পুজোর জন্য মিলিত হত। প্রত্যেকটা গ্রামের সরনা আলাদা। কিন্তু সরনা এখন রূপান্তরিত হল গোটা হো-জগতের সংহতির সূত্র এবং চিহ্নে। সরনার প্রতীকী ব্যঞ্জনার আরও একটা রূপ 'সরনা ধর্মের' ধারণা। যা ছিল আগে পূজার্থীর জমায়েতের জায়গা, তা হল এখন একটা 'ধর্ম'। সরনার ধারণাকে ঘিরে আরও এক পরিবর্তন ঘটল আদিবাসী জগতে। সরনা শুধুমাত্র হো-দের মিলন ও সংহতির সূত্র রইল না। অন্যান্য আদিবাসীদেরও এ ঐক্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা চলে।

প্রথম শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাব চাইবাসার বাইরে ছড়িয়েছিল বলে মনে হয় না। এখানেও তা সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্র এক গোষ্ঠীর মধ্যে।[১৫২] তবুও একটা দিক্ থেকে এ

আন্দোলন তাৎপর্যপূর্ণ। এর থেকে মনে হয়, শুদ্ধি আন্দোলনের ঢেউ গোটা আদিবাসী জগতে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক দশক আগেও হো মানসিকতায় এ ধরনের পরিবর্তনের কোনও আভাস দেখা যায়নি।

অন্যান্য অঞ্চলের মতো এখানেও হিন্দুপ্রভাব সুস্পষ্ট। কিন্তু নতুন চেতনার আলোকে হো'রা নিজেদের ইতিহাস, বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতি নতুন করে দেখতে শিখল। আন্দোলনের শুরু এবং প্রসার সিংঘ্রাই এবং তার মৃত্যুর পর 'চার গুরুর' উদ্যোগে। তাদের প্রবর্তিত 'নতুন ধর্মে'র নাম, 'সত্য ধর্ম', 'পুণ্য ধর্ম'। নতুন ধর্মে 'দীক্ষা' নিতে আগ্রহী হো'দের জীবন-যাপনের 'খুটি-নাটি' পর্যন্ত কঠোর অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল। সম্ভবত 'সত্য ধর্মে'র সীমিত প্রভাবের এটা একটা প্রধান কারণ। ধর্মীয় বিশ্বাসের দিক থেকে প্রধান হল — ভগবানের উপলব্ধি। আচারবিচারেও মৌলিকত্ব দেখি না। শিষ্যরা নিরামিষাশী। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ছিল হো'দের অতিপ্রিয় ধেনো মদ, নানা পালাপার্বণে সমবেত নৃত্য। অন্যান্য জায়গার মতো, এখানেও তারা পৈতে পরত। একটা নতুন বিধান এখানে দেখি — 'অন্য ধর্মের লোকেদের তৈরি কোনও খাবার' খেতেও ছিল মানা।

দ্বিতীয় আন্দোলন — 'হরিবাবা আন্দোলন' — (১৯৩১–৩২) অনেক বেশি ব্যাপক। এর প্রধান কারণ, এর ভিন্ন রাজনৈতিক বাতাবরণ। দেশজোড়া আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তখন গোটা আদিবাসী জগতে পৌঁছে গেছে। গান্ধীজির সম্মোহনী ব্যক্তিত্বের কথা হো'রা আগেই জানত, বিশেষ করে ১৯২৫ সালে তাঁর চাইবাসা সফরের সময় থেকে। এখন গান্ধীজি তাদের কাছে নতুন এক প্রতীক: আসন্ন 'গান্ধী-রাজে' তাদের দীর্ঘদিনের আশা আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। আন্দোলনের নেতা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে — ব্রিটিশরাজের অবসান ঘটেছে; সর্বত্র যেন উৎসবের মেজাজ; উৎসবের অঙ্গ ছিল আনন্দে উদ্বেল হো'দের 'সমবেত নৃত্য আর ভোজ'। সরকারি সতর্কতা এবং নিপীড়নে ব্রিটিশ-রাজ বিরোধী কাজের সুযোগ বেশি থাকল না। ১৯৩১ এর জুন-জুলাই মাসে হো-আন্দোলনের প্রধান 'গুরু' হরিবাবা এবং তার এক বিশেষ শিষ্যকে গ্রেপ্তার করা হয়। অন্তত সরকারি দলিলে এর পর হো'দের রাজনৈতিক কার্যকলাপের বিবরণ বড় একটা মেলে না। সরকারের রোষ এড়ানোর জন্য সম্ভবত তারা প্রকাশ্য রাজনীতি থেকে সরে এল।

শুদ্ধি আন্দোলনের প্রধান নেতা দুকা নিজেকে 'হরিবাবা' বলে পরিচয় দিত বলে এর নামই হয়ে গেল 'হরিবাবা আন্দোলন'। এর মূল ধারণাগুলি অন্যান্য আদিবাসী এলাকার মতোই এবং এখানেও অনুগামীদের নতুন আচরণবিধি মানার জন্য শপথ নিতে হত; তাই আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নতুন আদর্শে দীক্ষিত শিষ্যদের। তবে এতে আঞ্চলিকতার কিছু চিহ্ন লক্ষণীয়। এটা স্বাভাবিক। অন্যান্য আদিবাসী আন্দোলনেও ভূতপ্রেতের পুজো নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু ভূতের ধারণা, তাদের অবস্থান সম্পর্কে বিশ্বাস, ভূতপ্রেতের পুজোর সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা আচার ও প্রথায় অঞ্চলে অঞ্চলে তফাৎ ছিল। হরিবাবা আন্দোলনে আঞ্চলিকতার রূপ এ জন্যই।

ওরাঁও 'টানা' আন্দোলনের মতো এখানেও শুদ্ধির প্রথম পর্যায়ের প্রধান কর্মসূচি ভূত-তাড়ানো। ওরাঁওদের মতো হো'রাও বিশ্বাস করত, ভূত লুকিয়ে থাকে ঘরের আনাচে কানাচে। ভূত-তাড়ানোতে হো'দের একটা কৌশল ছিল, প্রচণ্ড শব্দ সৃষ্টি করে ভূতদের অতিষ্ঠ করে তোলা। কাড়া-নাকাড়া ঢাক ঢোল জোরে পিটিয়ে এটা করা হত। এখানে ভূতের অনুষঙ্গ হিসাবে নতুন একটা জিনিস দেখি। যা কিছু কালো তাই ভূতের পছন্দ। তাতেই যত অশুভ শক্তির বাস। তাই ভূতের পুজো এবং অশুভ উদ্দেশ্যে মন্ত্রশক্তি প্রয়োগের সংগে যুক্ত সব পশুপাখি, জিনিসপত্র বর্জন অপরিহার্য। কালো রঙের ছাগল, মুরগি, সরীসৃপ, এমনকী প্রজাপতি — সবাইকে মেরে ফেলতে হবে। ভূত-পুজোর সব উপকরণ — যেমন বিশেষ ধরনের মাটির কলসি ঘর থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। হো'রা নির্দ্বিধায় এ সব নির্দেশ পালন করেছে।[১৫৩]

ভূত-তাড়ানো পর্বের পর অবশ্যপালনীয় নানা শুদ্ধাচার। যেমন, নদীতে স্নান সেরে গ্রামের 'পবিত্র কুঞ্জে' পুজো দিতে যাওয়া। সঙ্গে নিতে হবে আতপ চাল আর সিন্দুর। গুরু দীক্ষার্থী শিষ্যদের এ চাল খেতে দেবে। আর, গায়ে ছিটিয়ে দেবে 'মন্ত্রপূত জল' (গোট্ দা)। হো'দের বিশ্বাস ছিল, এ জলের ছোঁয়ায় অনেকের বাহ্য চেতনা লোপ পেত; অন্যরা হয়ে পড়ত 'অপ্রকৃতিস্থ'। তাদের আচার আচরণে অসংলগ্নতার ভাব কাটত না।

অন্যান্য শুদ্ধাচারের মধ্যে ছিল নিরামিষ আহার। হো'দের নানা ধর্মানুষ্ঠানে পশুবলি একটা অপরিহার্য প্রথা, এবং বলির পশুর মাংস সবাই মিলেমিশে খেত। এ নিয়ম এখন বাতিল হল।

শুদ্ধি আন্দোলনের প্রভাবের স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। এ আন্দোলন হো জগতে যে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। ১৯৩০-এর দশকের অন্যান্য সমধর্মী আন্দেলনে — যেমন ১৯৩৭ এর 'কৃপাসিন্ধু ধরম' আন্দোলন — যে ব্যাপক সাড়া মিলেছিল তাতে মনে হয়, হো'দের মানসিকতায় একটা দীর্ঘস্থায়ী পরিবর্তন ঘটেছে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দিক্ থেকে এ পরিবর্তন আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, শুদ্ধির আদর্শ হো জগতের দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য এবং প্রথা-সম্মত নয়, অন্তত কোনও কোনও ক্ষেত্রে। বিংশ

শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে লেখা এক সরকারি দলিলে বলা হয়েছে, যৌথ, গ্রামীণ সমাজ সংগঠনের সঙ্গে এ ঐতিহ্যের কী অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক।[১৫৪] দুটি আচারের সামাজিক তাৎপর্য এখানে আলোচনা করা হয়েছে — নানা পালাপার্বনে মোরগ বলি আর ধেনো মদ পান।[১৫৫]

তবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের (১৯১৩–১৮) সরকারি নথিপত্র থেকে প্রচীন ঐতিহ্যের প্রতি হো'দের মনোভাবে পরিবর্তনের কিছু আভাস মেলে, অন্তত সরকারের খাস জমিদারি কোলহান্ অঞ্চলে। মনে হয়, দীর্ঘদিনের পুরনো কোনও কোনও প্রথা ও আচারের প্রতি হো'দের আনুগত্য অনেকটা যেন শিথিল হয়ে এসেছে। শুদ্ধি আন্দোলনের ইতিহাসে এ পরিবর্তনের তাৎপর্য আছে। হো'দের কাছে এ আন্দোলনের যে আকর্ষণ তার একটা কারণ এ পরিবর্তন হতে পারে। কোলহান্ জমিদারিতে জরিপের সময় (১৯১৩–১৮) এ সব কোনও কোনও পরিবর্তন সরকারি কর্মচারিদের নজরে আসে। দুটো প্রাচীন প্রথা সম্পর্কে এ পরিবর্তনের কথা তারা লিখেছে — মৃতের সৎকার, আর 'পবিত্রকুঞ্জের' অন্তর্গত কোনও গাছ কাটা সম্পর্কে বহুকালের বাধা নিষেধ।[১৫৬]

প্রথম প্রথা পূর্বপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সঙ্গে হো'দের নিবিড় আত্মিক যোগের প্রমাণ। এ প্রথা অনুযায়ী, কোনও হো'র মৃত্যু যেখানেই ঘটুক না কেন, তার অস্থি এনে গ্রামের নিজস্ব শ্মশানে পোঁতা হত। এটা শুধুমাত্র মৃত হো'র পরিবারবর্গের অনুষ্ঠান নয়, গোটা গ্রামের একটা পবিত্র আচার বলে মনে করা হত। কিন্তু জরিপের সময় দেখা গেল, পুরনো গ্রামসমাজসংগঠন অনেকটা দুর্বল হয়ে গেছে; প্রত্যেক গ্রামের আলাদা একটি মাত্র শ্মশান থাকবে, এ নিয়ম মানাই হচ্ছে না। অনেক পরিবার নিজেদের আলাদা সৎকারের জায়গা বানিয়ে নিয়েছে; অস্থি পোঁতার জায়গাকে চিহ্নিত করার জন্য যে বিরাট পাথরের চাঁই ('সসান দিরি') খাড়াভাবে রাখা হত, তার জন্য গ্রামের মানুষের সম্ভ্রমবোধ প্রায় দূর হয়ে গেছে; সেটা যেন 'বসা, খেলা, আর ঘুমানোর জায়গা'।[১৫৭] আগে গ্রামের 'পবিত্রকুঞ্জে'র মধ্যেকার কোনও গাছ কাটা ছিল সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অপরাধীর জন্য ছিল গোটা গ্রামসমাজের কঠোর শাস্তির বিধান। এখন দেখা গেল এ কুঞ্জের অনেক গাছ নির্বিচারে কাটা হয়ে গেছে। কোনও কোনও জায়গায় দেখা গেল, গাছের বাকল ছাড়িয়ে নেওয়া হয়েছে; দুর্বৃত্তদের মতলব ছিল, এর ফলে গাছগুলি শুকিয়ে মরে যাবে, আর মরা গাছ কাটা নিয়ে গ্রাম সমাজের কোনও বাধা থাকবে না।

হো শুদ্ধি আন্দোলনের উপর এক মূল্যবান নিবন্ধের[১৫৮] একটা সিদ্ধান্ত বিচার-সাপেক্ষ। এ বিচার আমাদের বর্তমান আলোচনায় বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। বলা হয়েছে, এ আন্দোলনে, অন্তত 'গোড়ার দিকে', হিন্দু বর্ণ-ব্যবস্থার প্রত্যেক প্রভাব সুস্পষ্ট। এ প্রকারের একটা মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে: অনুগামীদের হরিবাবা বলেছে, 'নিকৃষ্ট জাতের' লোক তাঁতিদের সঙ্গে তারা যেন কোনও সংস্রব না রাখে।[১৫৯] হরিবাবার স্ত্রী নানিকুই-এর এক ধরনের কাজের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানত এক সরকারি দলিলের ভিত্তিতে। এ সরকারি প্রতিবেদন মতে, 'হরিমা' নানিকুই শিষ্যদের গায়ে পবিত্র জল ('হরিপানি') ছিটিয়ে দিত। তার 'প্রধান কাজ', এ ভাবে শিষ্যদের 'জাতে তোলা'; এর জন্য হরিমাকে মাথাপিছু দিতে হত আড়াই পয়সা আর একটা নারকেল।[১৬০]

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত সম্পর্কে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে আসা সহজ নয়। 'জাতে তোলা' বলতে হরি মা কী বোঝাতে চেয়েছে, তা এ প্রতিবেদন থেকে বোঝা যায় না। সরকারি দলিলেও বলা হয়েছে, যারা জাতে উঠল, 'হিন্দু সমাজে তাদের স্থান কোথায়, তা এখনও অনুমানের বিষয়'।[১৬১] তাঁতিদের সম্পর্কে অসহিষ্ণুতার একটা বিকল্প ব্যাখ্যা সম্ভব। তাঁতিদের সঙ্গে সামাজিক ব্যবধান রেখে চলার যে নির্দেশ তার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক; হিন্দুবর্ণ ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কোনও ধারণা বা 'সংস্কারের' প্রভাব নয়। সরকারি দলিল থেকেই বোঝা যায়, হো গ্রামের অর্থনীতিতে তাঁতিদের ভূমিকা কী দ্রুত পাল্টে যাচ্ছিল। বাইরের বাজার-ব্যবস্থা থেকে হো-গ্রাম যখন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল, কাপড়-চোপড় ইত্যাদির জন্য গ্রাম সমাজের প্রধান নির্ভর ছিল এ তাঁতি-সম্প্রদায়। এ জন্যই গ্রামসমাজসংগঠনে তাদের একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল। হো-রা তাদের গ্রাম-সমাজের অঙ্গ বলেই ভাবত। অনেক বহিরাগতদের সম্পর্কে হো'দের ছিল চরম অবিশ্বাস ও প্রকাশ্য বৈরতা; হো-গোষ্ঠীভুক্ত না হলেও তাঁতিদের বিশেষ সমাদরের চোখে দেখা হত। বাজারব্যবস্থার প্রসার এবং আরও নানা কারণে তাঁতিদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক আর থাকল না। ১৮৯৭ সালে লেখা এক সরকারি দলিলে এ সম্পর্কে মূল্যবান আলোচনা আছে, প্রধানত সরকারি জমিদারি কোলহান্ অঞ্চলের তাঁতি সম্প্রদায় নিয়ে।

'তাঁতি সম্প্রদায়ের লোক ... কোল্হানের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। এখানকার মানুষের ব্যবহৃত মোটা কাপড়ের অধিকাংশ তাদের তৈরি; এটাই তাদের প্রধান জীবিকা। তবে বেশ কয়েকজন তাঁতি চাষবাসও শুরু করেছে। তারা অত্যন্ত ধূর্ত এবং ঘোরাল প্রকৃতির লোক; কোল গ্রামে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেক বেড়েছে; গ্রামের হিসাবরক্ষক, তহশিলদার চৌকিদার প্রায় সব ক্ষেত্রে এরাই। গ্রামবাসীদের আইনি শলা-পরামর্শও তারা দেয়; তাদের মতামত ছাড়া কোনও মামলাই সচরাচর শুরু হয় না। কোনও গ্রামে তাদের ভূমিকাই সব চাইতে ক্ষতিকারক; বহিরাগতদের মধ্যে আচরণ সব চাইতে

জঘন্য। আমার মত হল, কোলহান্ জমিদারিতে তাদের কখনও যেন তহশিলদার বা চৌকিদারপদে নিযুক্ত না করা হয়'।[১৬২]

তাই আমাদের সিদ্ধান্ত: হো জগতের শুদ্ধি আন্দোলনের চরিত্র অন্যান্য আদিবাসী এলাকা থেকে মোটেই ভিন্ন নয়। কোনও কোনও হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচারের প্রভাব এখানেও সুস্পষ্ট, কিন্তু তা হিন্দু বর্ণ জাতি ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়। আর হো'দের হিন্দুসমাজ ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে যাবার প্রশ্নই উঠেওনা।

(১১)

হিন্দু-আদিবাসী সাংস্কৃতিক সম্পর্ক নিয়ে আমাদের উপরের আলোচনার জন্য আমরা প্রধানত সরকারি নথি পত্রের উপর নির্ভর করেছি। দু'একটা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম মুন্ডা ওরাঁও আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায় এবং কুমার সুরেশ সিং-এর মূল্যবান গবেষণা।

এবার আমরা পেশাদার নৃতত্ত্ববিদদের কয়েকটা সিদ্ধান্ত বিচার করব। তাঁদের আলোচনায় দু'টি প্রধান ধারা লক্ষ করি। কেউ কেউ—যেমন শরৎচন্দ্র রায়[১৬৩] ও মার্টিন ওরান্স—ধর্ম-সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের আলোচনায় আদিবাসীদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিকতার প্রশ্ন তুলেছেন। কেউ কেউ যেমন নির্মলকুমার বসু, ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং সুরজিৎ সিং-এ সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেননি। (মজুমদারকে বর্তমান আলোচনায় আনিনি।)

সাঁওতাল জগতে নতুন সাংস্কৃতিক আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা ওরান্সের বক্তব্য ও সিদ্ধান্তের বিচার করেছি।[১৬৪] খুব সংক্ষেপে আবার তা উল্লেখ করছি। তাঁর মতে—সাঁওতাল সংস্কার আন্দোলন তাদের ব্যর্থ রাজনৈতিক সংগ্রামের (১৮৫৫ সালের হুলের) একটা সুচিন্তিত, সুনির্দিষ্ট বিকল্প; রাজনৈতিক পথ বর্জন করে তারা ধর্ম-সমাজ শুদ্ধির পথ নিল। এ শুদ্ধির মতাদর্শগত ভিত্তি হিন্দু-সমাজের নানা বিশ্বাস ও আচার; এ গ্রহণের মধ্য দিয়ে সাঁওতালরা হিন্দুদের 'সমমর্যাদাসম্পন্ন' গোষ্ঠীতে পরিণত হতে চেয়েছিল। নিজেদের অতীত সাংস্কৃতিক ইতিহাস তারা মোটেই সম্পূর্ণ বর্জন করেনি; তারা চেয়েছিল আদি সংস্কৃতির পুনর্নির্মাণ, যার আদল হবে হিন্দুদের থেকে নেওয়া 'Great Tradition'।

আমাদের সিদ্ধান্ত: সাংস্কৃতিক আন্দোলন সাঁওতালদের বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলনের বিকল্প তো নয়ই; তার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ, সামাজিক সংস্কার আন্দোলন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির হাতিয়ার মাত্র। এ সংস্কারের ফলে সাঁওতাল ঐতিহ্যের কোনও কোনও অংশ বর্জিত হয়েছে; হিন্দু সমাজের সঙ্গে ব্যবধান অনেক কমে গেছে, কিন্তু নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য নিজেদের ইতিহাসের ভিন্ন ধারা সম্পর্কে তাদের সচেতনতা অনেক প্রখর হয়েছে। 'Great Tradition'-এর 'আদলে' সাঁওতালরা তাদের সংস্কৃতির পুনর্বিন্যাস করতে চেয়েছিল। এ ধারণা বিভ্রান্তিমূলক। এ 'ঐতিহ্যে'র কোনও কোনও উপাদান নেওয়া হয়েছে বটে, কিন্তু গোটা আদলটা এ ঐতিহ্য নয়।

ওরাঁও আন্দোলন সম্পর্কে শরৎচন্দ্র রায়ের নানা মন্তব্য আমরা একটু আগে আলোচনা করেছি। মুন্ডাদের ক্ষেত্রেও রায়ের সিদ্ধান্ত প্রায় একই ধরণের।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের মুন্ডা প্রতিরোধ আন্দোলনকে তিনি পরিবর্তমান মুন্ডা মানসিকতার দিক থেকে বুঝতে চাননি। ফলে, মুন্ডাদের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপও তাঁর কাছে সঠিক ধরা পড়েনি, কারণ এ আন্দোলনের প্রধান প্রেরণা মূলত নতুন রাজনৈতিক চেতনা। বীরসার নেতৃত্বে গড়ে ওঠা প্রতিরোধ আন্দোলনের মূল দর্শন হল—মুন্ডা সমাজ ও অর্থনীতিতে বহিরাগত নানা গোষ্ঠীর আধিপত্য সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে স্বাধীন মুন্ডা-রাজের প্রতিষ্ঠা। এ সম্পর্কে রায়ের ধারণা সরকারি ভাষ্যের অনুরূপ। মুন্ডাদের জন্য নতুন আইন তৈরি করার সময় সরকার সুস্পষ্ট ভাবে বলেছে, বহিরাগতদের ক্ষমতা সরকার নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মাত্র; এর সম্পূর্ণ বিলোপের ধারণা অলীক, অবাস্তব। রায়েরও বিশ্বাস, 'মুন্ডা প্রশ্নে'র আর কোনও সমাধান সম্ভব নয়। মুন্ডারা যে এ একান্ত বাস্তবকে স্বীকার করছে না, তাঁর মতে এর কারণ তাদের 'barbarous ignorance'।[১৬৫] 'সভ্যতার কোনও আলোক' পায়নি বলেই তাদের-এ অজ্ঞতা। তাই তারা 'আইন নিজের হাতে নিয়েছে অত্যন্ত নির্বোধের মতো; অবিবেচকের মতো সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তাদের সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে'।

মুন্ডাদের বিদ্রোহী চেতনার রূপ রায়ের কাছে অস্পষ্ট ছিল বলেই বীরসার 'সংস্কার' আন্দোলন বিশ্লেষণেও তাঁর বিভ্রান্তি। রায় মনে করেন, এ আন্দোলনের জন্ম বীরসার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে; আত্ম-প্রতিষ্ঠার জন্যই যেন তার এত কর্মকাণ্ড; বীরসা 'নতুন ধর্ম' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে, কারণ এর প্রাণপুরুষ হিসাবে সবাই তাকে মানবে। শিষ্যরা তাকে 'ভগবান' বলে মেনে নিয়েছে; বীরসা এতে কোনও বাধা দেয়নি। কারণ 'ভগবান বলে পূজিত'[১৬৬] হবার অভিলাষ তার ছিল। ছোটনাগপুর রাজ্যের এক প্রসিদ্ধ জায়গা ছুটিয়ার প্রাচীন মন্দিরে শিষ্যদের নিয়ে যাবার পরিকল্পনাও রায়ের মতে এ উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য; আসলে তা ছোটনাগপুর রাজের জন্য বীরসার দাবি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস মাত্র। 'নতুন ধর্ম' প্রতিষ্ঠার ঘটনাকেও রায় মনে করেন বীরসার এক কৌশলমাত্র। এর আগে বীরসার খ্যাতির মূলে ছিল, দুরারোগ্য রোগ সারানোয়

বীরসার অতিপ্রাকৃত ক্ষমতায় মুন্ডাদের বিশ্বাস। এ বিশ্বাসে দলে দলে লোক তার কাছে আসতে থাকে। কিন্তু বহুজন নিরাশ হয়ে ফিরে যায় আর বীরসার জনপ্রিয়তা হঠাৎ কমতে থাকে। হারানো গৌরব ফিরে পাবার জন্যই বীরসা নতুন ধর্ম প্রবর্তনে উৎসাহী হয়।

মুন্ডাদের ব্যাপক শুদ্ধি আন্দোলন আসলে বীরসার ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার কৌশলমাত্র রায়ের এ ধারণা যে ভ্রান্ত, আমরা মুন্ডা-আন্দোলনের আলোচনায় দেখাতে চেষ্টা করেছি। এ ভ্রান্তির জন্যই তিনি হিন্দুপ্রভাবকে শুধুমাত্র ব্যক্তি হিসাবে মুন্ডাদের নৈতিক উৎকর্ষের দিক্ থেকে বুঝতে চেষ্টা করেছেন। রায় অবশ্য স্বীকার করেছেন[১৬৭], 'পাঁচ-পরগণাতে'ও—যেখানে হিন্দু-প্রভাব সব চাইতে বেশি—'হিন্দু-মুন্ডা' সম্প্রদায় তাদের আদি গ্রাম-সমাজ-সংগঠনের সঙ্গে যোগ দিত না ঠিকই। কিন্তু তারা 'গ্রামীণ দেবতা'র—হাতু বোংগাকো, গাঁও দেবতা—অস্তিত্ব মেনে নিয়েছে। তাছাড়া গ্রাম-পুরোহিত পাহানকেও তারা বর্জন করেনি।

নির্মলকুমার বসুর মূল সিদ্ধান্ত হল—একটা 'বিশেষ কায়দায়' হিন্দু সমাজ আদিবাসী গোষ্ঠীদের 'আত্মভূত' করে নিচ্ছে। ('The Hindu Method of Tribal Absorption')।[১৬৮] উড়িষ্যার জুয়াঙ এবং ছোটনাগপুরের মুন্ডাদের ক্ষেত্রে তিনি এ প্রক্রিয়ার আলোচনা করেছেন। (বর্তমান আলোচনায় আমরা জুয়াঙ প্রসঙ্গ আনছি না)।

বসুর বিশ্লেষণ পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, বিশাল মুন্ডা জগৎ আসলে এ প্রক্রিয়ার বাইরে। কয়েকটা বৃত্তিজীবী সম্প্রদায় যেমন তাঁতি, তেলি, কামার, কুমোর—সম্পর্কে মুন্ডা সমাজের মনোভাবকে তিনি এ প্রক্রিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করেছেন।[১৬৯] এ সব বৃত্তি বা বৃত্তিজীবী সাম্প্রদায়দের মুন্ডাসমাজ যে 'সমপর্যায়' ভুক্ত মনে করেনি, বসু তাকে হিন্দু বর্ণজাতি প্রথার প্রভাবের ফল মনে করেছেন।

মুন্ডা অর্থনীতিতে এ সব বৃত্তির আবির্ভাব বসু দু'ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন—প্রথমে মুন্ডা গ্রামবাসীদের কেউ কেউ এ সব বৃত্তিতে আকৃষ্ট হয়; পরে বাইরে থেকে এ সম্প্রদায়দের লোকেরা মুন্ডাগ্রামে বাস করতে থাকে, বস্তুত স্থায়ীভাবে। বসুর মতে, এর ফলে মুন্ডা সমাজ 'হিন্দু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার' অঙ্গ হয়ে পড়ে এবং উচ্চনীচ ভেদাভেদ বোধ বাড়ার ফলে তারা ক্রমান্বয়ে 'হিন্দু সমাজের অন্তর্গত একটি জাতিতে পরিণত হইল'।[১৭০] 'ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থার নিকট আত্মসমর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা জাতিভেদ প্রথা বা বর্ণধর্ম একদিক দিয়া স্বীকার করিয়াই লইল'।[১৭১]

এ সব বৃত্তিজীবীদের আবির্ভাবের ফলে মুন্ডারা 'উন্নততর' 'হিন্দু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা'র অঙ্গে পরিণত হচ্ছে—বসুর এ বক্তব্য গ্রহণীয় নয়। মুন্ডা অর্থনীতিতে এদের ভূমিকা ছিল অপরিহার্য কারণ মুন্ডাদের নিজস্ব উৎপাদন ব্যবস্থায় এ সব বৃত্তির অস্তিত্ব ছিল না। আমরা আগেই বলেছি, এ অনিবার্য নির্ভরশীলতার জন্যই মুন্ডাসমাজ বহির্ভূত হলেও মুন্ডারা কখনও এ বৃত্তিজীবীদের 'দিখু' (বহিরাগত) বলে সন্দেহের চোখে দেখেনি। তাছাড়া, এ নির্ভরশীলতা থেকে প্রমাণ হয় না যে মুন্ডারা 'হিন্দু সমাজের উৎপাদন ব্যবস্থা'র অঙ্গ হয়ে পড়েছে। এ উৎপাদন-ব্যবস্থায় তথাকথিত হিন্দু-বৈশিষ্ট্য কোথায়? মুন্ডারা যে তাদের 'সমপর্যায়ভুক্ত' মনে করত না তারও অর্থ এ নয় যে তারা হিন্দু জাতিপ্রথা, বর্ণপ্রথাকে 'স্বীকার' করে নিয়েছে। আসলে পিতৃকূলের দিক থেকে গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের সঙ্গে যারাই যুক্ত নয়, তাদের সবাইকে—মুন্ডা বা আদিবাসী হলেও—মুন্ডাগ্রাম স্বতন্ত্র বলে ভাবত। এ ভাবে যুক্ত নয় চাষীদেরও তারা মনে করত 'অন্য গ্রামের লোক' (এতা হাতুরাংকো); সামাজিক এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের স্থান ছিল অনেক নীচুতে।

সুরজিৎ সিংহের আলোচনা বরাভূম (মানভূম) অঞ্চলের ভূমিজদের সম্পর্কে। তাঁর মতে[১৭২], এখানে হিন্দুপ্রভাবের বিস্তারের ইতিহাস 'কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শাসনব্যবস্থা'র আবির্ভাবের সঙ্গে যুক্ত। ভূমিজদের আগেকার গ্রামীণ এবং 'আঞ্চলিক' নানা সংগঠন ক্রমে এ নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অঙ্গীভূত হয়ে যায়। এ ব্যবস্থায় সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী রাজাই ঘোষণা করে, তার পরিবার 'রাজপুত-ক্ষত্রিয়' কুলের সঙ্গে রক্তের সম্পর্কে সম্পর্কিত। এ বানানো ইতিহাসকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজার প্রধান নির্ভর ছিল একদল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত। তারা এ জন্য তৈরি করল নকল কুলপঞ্জি। নিষ্করজমিভোগী এ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাই হিন্দু প্রভাব বিস্তারের একটা প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়াল।

সুরজিৎ সিংহের বক্তব্য বিচার আমাদের পক্ষে অনেক সহজ হয়েছে। কারণ তিনি নিজেই ভূমিজসমাজে তথাকথিত হিন্দু-প্রভাবের প্রান্তিকতার কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন। 'নীচু স্তরের' ভূমিজ জনসাধারণের উপর হিন্দু প্রভাব খুবই সামান্য। এর একটা কারণ, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মহলের আনুকূল্য পাবার মতো আর্থিক সঙ্গতি তাদের ছিল না। তা ছাড়া, ব্রাহ্মণদের বানানো কুলপঞ্জির দৌলতে 'রাজপুত-ক্ষত্রিয়-কুলের' মর্যাদা যারা পেয়েছে, তারা চায়নি আরও বহু লোক এ মর্যাদার অধিকারী হোক্। জাতে যারা উঠেছে, তারা নানা বিধিনিষেধ তৈরি করে চেষ্টা করেছে যাতে ভূমিজ জনসাধারণ জাতে না উঠতে পারে।[১৭৩]

(১২)

আমাদের দু'টি মূল সিদ্ধান্ত আমরা সংক্ষেপে আবার বলছি। প্রথমত, হিন্দু প্রভাব বাড়ার অর্থ এ নয় যে আদিবাসী সমাজ

জাতি-বর্ণ-প্রথার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা হিন্দু সমাজে অঙ্গীভূত হয়ে যাচ্ছে। দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও হিন্দু বিশ্বাস ও আচার গ্রহণ আদিবাসীদের বিশিষ্ট এক সচেতন প্রক্রিয়া। এক বিশেষ ঐতিহাসিক পরিবেশে সৃষ্ট আদিবাসী মানসিকতা থেকে একে বিচ্ছিন্ন করা ভ্রান্তিজনক। এ মানসিকতা তৈরি হয়েছে বহিরাগত শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের নিয়ত প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

পাদটীকা

১৩৫. Suresh Sing, **The Dust Storm and The Hanging Mist : A study of Birsa Munda and his movement in Chotanagpur** (Calcutta, 1966) দ্বিতীয় সংস্করণ : **Birsa Munda and His Movement in Chotanagpur** (Oxford University Press, 1983)

১৩৬. পূর্বোক্ত ১৯৮৩ সালের সংস্করণ, পৃ: ৪১

১৩৭. The Chotanagpur Landlord and Tenants Procedure Act, 1879.

১৩৮. Bengal General Miscellaneous Proceedings, Aug 1881, Nos 5-6; Chotanagpur Commisioner's Annual Report, 1880-81, 12 July 1881; Paras 192; 36–37

১৩৯. 'সর্দার আন্দোলনে'র অন্য নাম মুলকী লড়াই। এর সময়কাল ১৮৫৮ থেকে বীরসা'র আবির্ভাবের (১৮৯৪) আগে পর্যন্ত। সর্দাররা বলত, তারা মুন্ডা-গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতা পরিবারের বংশধর। তাদের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য পিতৃপুরুষের গ্রামে তাদের প্রায়-বিনষ্ট অধিকারের পুনরুদ্ধার।

১৪০. এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আমি আগে অন্যত্র করেছি। 'ধর্ম ও পূর্ব ভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০', 'চতুরঙ্গ', মার্চ, ১৯৮৯

১৪১. কুমার সুরেশ সিং-এর মন্তব্য: 'The early emphasis on 'religious means' gave way to the open espousal of violence as the main means of the struggle', **The Dust Storm and the Hanging Mist,** পৃ: ৯৩

১৪২. এ আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণের জন্য: আমার 'ধর্ম ও পূর্ব ভারতে কৃষক-আন্দোলন, ১৮২৪-১৯২০; এপ্রিল ১৯৮৯ সুরেশ সিং, **The Dust Storm ...., ch 4**

১৪২ক. পূর্বোক্ত, পৃ: ৯৩

১৪৩. Letter to the Govt. of Bengal, 12 Jan, 1900; Para 3; India Home Govt. Procedings, Aug 1900, No. 335

১৪৪. শরৎচন্দ্র রায়ের গবেষণা থেকে জানতে পারি, এর আগে হিন্দু প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না। **Oraon Religion and Customs** (1st edn 1928); Reprint. Calcutta, 1972. ch. 6

১৪৫. H. Risley, **The Tribes and Castes of Bengal,** (Cal. 1891) Vol-I, 91-92

১৪৫ ক) 'Although no one who has watched, as I have done, the Tana Bhagats at their hymn-singing sometimes protracted for hours, can doubt the genuineness and intensity of their religious fervour, the movement was in origin largely economic'. **Oraon Religion and Customs,** পৃ: 292.

১৪৬. পূর্বোক্ত, পৃ: 247.

১৪৭. এ বিবরণের জন্য আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'The Story of a Tribal Revolt in the Bengal Presidency; The Religion and Polices of the Oraons, 1900–1926', A. Chakravorti (ed) **Aspects of Socio-Economic changes and Political Awakening in Bengal,** Calcutta 1989

১৪৮. পূর্বোক্ত

১৪৯. 'The Tanas say that **janeu** or Sacred thread is the distinctive mark of the (Tana) Bhagat as the white Hag which most Tanas set up in front of their houses is the distinctive mark of a [Tana] Bhagat's House'. **Oraon Religion and Cusoms,** পৃ: 290

১৫০. পূর্বোক্ত, পৃ: 293-94

১৫১. সরকারি দলিল ছাড়া এ আন্দোলনের মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ করেছেন, Mathew Areeparampil তার একটা প্রবন্ধে 'Socio-Cultural and Religious Movements among the Ho tribals of Snigbhum district of Bihar' Mrinal Miri (ed) **Continuity and Change in Tribal Society** (Indian Institute of Advanced Study, Shimla 1993)

১৫২. 'Notes on the Hos' by Mr. Dahn Mashi Panna, Assistant Settlement officer, Kolham Govt. Estate,' included as Appendix E in A.D Tuckey, **Final Report on the Resettlement of the Kolhan Government Estate in the district of Singbhum, 1913-1918'.** (Patna 1920)

১৫৩. এ সব নির্দেশ ব্যাপকভাবে মানা হয়। হো'রা বিশ্বাস করে — ভূত প্রেত বা আঞ্চলিক দেব-দেবীর পুজো নিষিদ্ধ বলে, এ সব পুজোর একটা অঙ্গ পশুবলির প্রথাও রদ হয়ে গেল। একটা সরকারি দলিল থেকে জানতে পারি, ওই অঞ্চলের কোনও

কোনও 'স্বার্থান্বেষী' লোকও হো'দের বলতে থাকে, এ সব পশুপাখি আর রাখার দরকার নেই। 'It was explained that the fowls and blackgoats were primarily for offerings to the spirits of the village, and as such offerings were no longer necessary it was no use keeping them. The idea caught the imagination of the people to such an extent that the local hats were for some weeks simply flooded with fowls and black goats, which were sold at ridiculously low prices'সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, এ ঘটনা কিছু মুনাফাবাজ লোকের প্রচারের ফল। তখনকার হো মানসিকতা বিচার করলে মনে হয়। এ ভাষ্য সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়।

১৫৪. Dahn Mashi Panna'র প্রতিবেদন। পাদ টীকা নং ১৫২ দ্রষ্টব্য।

১৫৫. মোরগের মাংস হো'রা মাঝে মাঝে খেত, বিশেষ করে উৎসবের সময়, তবে অনেকটা যেন 'বিলাস দ্রব্যের মত' ('as luxuries')। বোঙ্গার পুজোতে বলি দেওয়া মোরগের মাংস খাওয়াটাই অনেক সাধারণ রেওয়াজ। 'They [fowls]... are consumed mostly in offering Sacrifices to the Bongas or Ho gods.... He cannot Sow seeds without offering a fowl to his Bonga, nor can he eat the fruits of his fields without first making a thank-offering of a fowl'' পালাপার্বণে, নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ধেনোমদ পান এ রকমই একটা প্রথা। 'The **diang** or rice beer is the national drink of the Ho.... A Ho girl who is an expert in preparing good **diang** fetches a high bride-price'.

১৫৬. হো'দের ওপর Dahn Mashi Panna' র প্রতিবেদন পাদটীকা নং ১৫২ দ্রষ্টব্য

১৫৭. 'The former reverance to the **Sasandiris** is also passing away...they are now being used as seats, where a man can sleep or play, or as grinding stones, without any apparent thought of the things buried underneath'. পূর্বোক্ত।

১৫৮. পাদটীকা নং ১৫১ দ্রষ্টব্য।

১৫৯. 'In the earlier stages he preached traditional purity and racial isolation. He wanted his followers to have nothing to do with Tantis, the weaver caste and others, whom they considered as inferior people' পূর্বোক্ত; ৩৯৯

১৬০. পূর্বোক্ত, পৃ: ৪০১

১৬১. .....'Where they stand with the Hindus is still a matter of conjecture'. পূর্বোক্ত।

১৬২. T. A. Craven, **Final Report on the Settlement of the Kolhan Government Estate in District Singbhum in the year 1897;** Para 73

১৬৩. আক্ষরিক অর্থে রায় 'পেশাদার নৃতত্ত্ববিদ' নন। পেশায় আইনজীবী। কিন্তু ভারতীয় নৃতত্ত্ববিদ্যায় তাঁর মৌলিক অবদানের জন্য তাঁকে এর একজন প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে গণ্য করা হয়। তাঁর গবেষণা বিহারের আদিবাসী জগৎ নিয়ে।

১৬৪. 'চতুরঙ্গ', পৌষ, ১৪০৩

১৬৫. **The Mundas and Their Country** (প্রথম সংস্করণ ১৯১২। দ্বিতীয় সংস্করণ Asia Publishing House, New York, 1970। বর্তমান প্রবন্ধে দ্বিতীয় সংস্করণকে ব্যবহার করেছি। পৃ: ২০১

১৬৬. 'Love of apotheosis'। পূর্বোক্ত পৃ: ১৮৯

১৬৭. **The Mundas and Their Country,** পৃ: ২৬৯

১৬৮. এ সুপ্রসিদ্ধ প্রবন্ধ (১৯৪১ সালে **Science and Culture, Vol. VIII** — তে প্রথম প্রকাশিত) তাঁর Culture and Society in India (Asia, 1967) — তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, ch. XII

১৬৯. **হিন্দু সমাজের গড়ন,** (বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। কলিকাতা, ১৩৫৬ সাল) পুস্তকে এ আলোচনা পাওয়া যাবে। বিশেষ করে, পৃ: ২১-২২, ৩২-৩৪

১৭০. পূর্বোক্ত; পৃ: ২২

১৭১. পূর্বোক্ত; পৃ: ৩২

১৭২. তাঁর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য: 'State Formation and Rajput Myth in Tribal Central India', **Man in India,** Jan-March 1962

১৭৩. সিংহের এ গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ উদ্ধৃতিযোগ্য: "It should be made clear... that the tribals at the lower rungs of the social hierarchy were only feebly touched by the aspiration for identification as Rajput-Kshatriyas. Their poor economic position, more than any other factor, virtually ruled out the possiblity of ever realizing the states of Rajput for which it is essential to 'purchase' the ritual services of Brahmins of the right kind. There is also the fact that the Rajputized chieftains used to maintain a fairly close control over the inter ethnic rank hierarchy in their respective territories. The various castes and tribes in their turn, were ever watchful over possible supercession of rank claims by the groups which were traditionaly considered relatively low'. (পৃ: ৭৬-৭৭; পূর্বোক্ত প্রবন্ধ)

সমাপ্ত

পীরখানে আজ প্রদীপ জ্বালতে দেবে না

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

অভিমন্যুদের বারান্দা থেকে মাঠটা পরিষ্কার দেখা যায়। বিশাল মাঠ। মাঠের পুবদিকে রাস্তা, রাস্তার ওপারে পীরখান; পশ্চিমে এক সার কোয়ার্টার্স, উত্তর দিকে থানা, দক্ষিণে ডাকবাংলো। মাঠের মাঝখানে পাঠানকালীর মন্দির। কোন কালে নাকি কোন এক পাঠান সর্দার এখানে কালীপূজায় অংশ নিয়েছিল। এই মাঠে প্রতি পৌষমাসের অমাবস্যায় কালীপূজা হয়। সে দিন মেলা বসে। মেলায় দূর-দূরান্ত থেকে লোক আসে, সাধুসন্ত আসে।

কালীপূজা হয়ে গেছে কাল রাতে। আজ মেলা। এবার মেলা হবে কি না সে সংশয় ছিল।

অভিমন্যুর বাবা শ্যামাপদ চক্রবর্তী বদলি হয়ে এ থানায় এসেছেন ন'মাস হল। শহর থেকে এই বনমালীপুর গ্রামে এসে গোড়ায় খুব মন খারাপ হয়েছিল অভিমন্যুর। এখানকার স্কুল, পথঘাট, বন্ধু — সবই যেন খারাপ। তারপর কবে থেকে যে এখানকার রকম সকম তার ভাল লেগে গেল তা জানে না অভিমন্যু। এখানে স্বাধীনতা অবাধ, রাস্তাতেও খেলা যায়, ধানখেতে লুকোচুরি, মাঠে হাডুডু। অভিমন্যু এখানেই সাঁতার শিখেছে, শিখেছে গাছে চড়া। এখানে এখন সে ছোটদের দলের সর্দার হয়ে উঠেছে।

দু'পাতা হাতের লেখা আর খানকয়েক অঙ্ক কষে অভিমন্যু উঠে পড়ল। আজ ছুটি। ছুটি মানেই মজা। সারাদিন খেলা আর খেলা। অভিমন্যু যায় হিরুদের বাড়ি। হিরুর মা, রীতা কাকিমা, তাকে দেখেই বলে উঠলেন, আজ একেবারেই বাইরে যাবে না কেউ। খেলতে হয় বাড়িতে বসে খেল।

— কেন কাকিমা, আজ তো ছুটি।

— অত কেন-র জবাব দিতে পারি না বাবু, আজ আমি খুব ব্যস্ত।

এমন সুন্দর রোদঝলমল দিনে কী ঘরে মন বসে? মাঠে এখন মিঠে কড়া রোদ, দু'চারটে শালিক চড়াই-ময়না-কাক। গরুর গাড়ি থেকে বাঁশ খড়-খুঁটি-ত্রিপল আরও কত কী নামানো হচ্ছে। সাধুবেশী কয়েকজন ঘুরছে মাঠে। মাঠের দিকে তাকালেই কৌতূহল লাফিয়ে বাড়ে।

অভিমন্যু চুপিচুপি জিগ্যেস করল হিরুকে, কাকিমা বাইরে যেতে মানা করল কেন রে?

— কী জানি, সকাল থেকেই তো দেখছি মায়ের মুখ গোমড়া, ব্যস্তও খুব।

— আজ তোকে মেলায় তাহলে যেতে দেবে না?

— ইস! মেলায় যেতে না দিলে আমি ছাড়ব না। কাঁদব, জিনিসপত্র ভাঙব, বইপত্র ফেলে দেব। মেলায় যাবই। আয় এখন লুডো খেলি।

আজ ঘরে বসে লুডো খেলার দিন নয়। তাছাড়া, যদি তাকেও মেলায় যেতে না দেয়। — এই চিন্তাটা বা আশঙ্কা অভিমন্যুর মনে বাসা বাঁধলে সে লুডো না খেলে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এল।

বাসায় ফিরে অভিমন্যু দেখল বাবা নেই, মা ঢুকেছে পুজোর ঘরে। ঠাকুমা নিজের ঘরে পানের বাটা নিয়ে বসেছিল। অভিমন্যুর ডাকাডাকিতে বারান্দায় এল।

— কী দাদু, এত ব্যস্ত কেন?

— বোস এখানে। ঠাকুমা বসল একটা চেয়ারে অভিমন্যুর পাশে।

— দেখ ঠাকুমা এই মাঠে আজ মেলা বসছে। যাবে তুমি মেলা দেখতে?

আমার কী আর সে বয়স আছে দাদু। চোখ গেছে, দাঁত গেছে, বুড়ো হয়েছি। মেলা আমি অনেক দেখেছি আর

সাধও নেই। তবে বারান্দায় বসে যতটুকু দেখা যায় নিশ্চয় দেখব।

— আর আমি? আমিও কী বারান্দায় বসে মেলা দেখব না কি! ওসব হবে না, আমি যাব মেলায়, বলে রাখছি।

— যা না, কে মানা করছে। মেলা তো ছোটদের জন্যই। তবে বড় কেউ যেন সঙ্গে থাকে।

— ঠিক তো? তখন যদি অন্য কথা বলেছ —। দুটো হাত ঠাকুমার গলায় রেখে অভিমন্যু বলল, খতম কর দে গা।

কিন্তু বড় কে সঙ্গে যাবে, ভাবল অভিমন্যু। ঠিক তখন অভিমন্যুর চোখে পড়ল হরিহরকাকা। অভিমন্যু হাঁক দেয়, হরিহরকাকা!

হরিহর ডাকবাংলার চৌকিদার। বুড়ো মানুষ, কানে শোনে কম, একটু খুঁড়িয়ে হাঁটে। সোজা সরল মানুষ। ছেলের দল তার পেছনে খুব লাগে। বাংলার ভেতরে যখন তখন ঢুকে পড়ে। হরিহর তাদের অত্যাচার সহ্য করে। শিশুরা তার প্রশ্রয়েই যেন আরও দুরন্ত হয়ে ওঠে।

হরিহর বারান্দায় উঠে আসে। অভিমন্যুর ঠাকুরমাকে প্রণাম করে বারান্দায় বসে। — কী বলছ বড় সাহেব, ডাকাডাকি কেন?

বড়বাবুর ছেলে তাই বড় সাহেব। তবে হরিহরের ডাকে স্নেহ লুকিয়ে থাকে।

মেলা কখন শুরু হবে হরিহরকাকা?

— শুরু তো হয়েই গেছে বলতে পার। দুপুর থেকে গমগম আওয়াজ পাবে। বিকেলে দেখবে কেমন ভিড় হয়। মাঠ ছাড়িয়ে, ধানখেত ছাড়িয়ে ভিড় ওই আকাশের গা ছুঁয়ে ফেলবে।

— হরিহরকাকা, তুমি আমাকে মেলায় নিয়ে যাবে?

— সে নিলে হয়, তবে কী — হরিহর মাথায় হাত বুলোয়। একে দুরন্ত ছেলে তায় এবার কেমন একটা গোলমেলে পরিস্থিতিতে মেলা হচ্ছে। কিন্তু বড়বাবুর ছেলেকে কি না বলা যায়? হরিহর সমস্যায় পড়ে।

— তবে কি-টি শুনব না, নিয়ে যেতেই হবে তোমাকে। বল নেবে। নইলে ছাড়ব না। হরিহরের হাত চেপে ধরল অভিমন্যু। তার ঠাকুমা তখন বলল, নিয়ে যাও না বাপু, ছোট ছেলে বায়না করছে। ওদের জন্যই তো মেলা। তুমি সঙ্গে থাকলে আমরা নিশ্চিন্তে ছাড়তে পারি। বেলা থাকতে যেয়ো, তাড়াতাড়ি ফিরো।

বড়বাবুর মা বলছেন নিয়ে যেতে তার ওপর আর কথা কী। — আচ্ছা, নিয়ে যাব।

(২)

শ্যামাপদ থানায় ঢুকে চেয়ার টেনে বসতে না বসতেই এল বিভূতিঠাকুর। বিভূতি রোজ সকালে সাজি হাতে দোকানে দোকানে ঘোরে। এক দেড় লাইনের মন্ত্র অস্ফুটে উচ্চারণ করে দোকানির মাথায় দু'ফোঁটা জল ছিটোয়, কপালে চন্দনের টিপ দেয়, হাতে দেয় আশীর্বাদী ফুল। থানাতে আসে তারপর। সে হল স্থানীয় নিউজ এজেন্সি। আমপল্লব দিয়ে চারদিকে শান্তিজল ছিটিয়ে বিভূতি শ্যামাপদকে বলল, কোনও চিন্তা নাই স্যার। কোথাও কোনও গোলমাল হবে না — একেবারে পাকা খবর স্যার। তাছাড়া ভটচায্ মশাই গণনা করেও বললেন, আজ কোনও গোলমালের সম্ভাবনা নেই। তবু তিনি একটা স্পেশ্যাল পূজার ব্যবস্থা করেছেন।

শ্যামাপদ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বিভূতির সাজিতে দু'টাকার একটা নোট দিলেন। পাশে দাঁড়িয়েছিল নন্দন। সে বলল, তাহলে আর এত লাঠিসোটা লোকলস্কর নিয়ে আমাদের দৌড়ঝাঁপের দরকারটা কী? বরং চিত্রবাণীতে মাধুরী দীক্ষিতের একটা সিনেমা আছে দেখে আসি। বিভূতি ঠাকুর পাহারায় থাক।

নন্দনের বয়স কম, ফচকে। চালচলনে একটু 'আমাকে দ্যাখ' ভঙ্গি। 'সমিতি' করে মন দিয়ে। এ থানায় এসেছে শ্যামাপদর অল্পদিন আগে। বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে গত সপ্তাহে একটা কেলেঙ্কারি করেছে যা সামলাতে হচ্ছে শ্যামাপদকে। শ্যামাপদ নন্দনকে পছন্দ করেন না। তিনি নন্দনের রসিকতায় হাসলেনও না, কথাও বললেন না কিছু। বিভূতিকে ইশারায় বললেন, বিদায় হও। বিভূতি যাবার কিছু পরে এল রামগতি। শ্যামাপদ তাকে দেখেই খুব ব্যস্তভঙ্গিতে বললেন, দেখা হয়েছে তো, বলেছো সব কথা বুঝিয়ে? কী বললেন বরকত সাহেব?

বরকত সাহেব এই বনমালীপুরের এক প্রান্তে বাস করেন। পেশায় দর্জি। বয়স সত্তরের কম নয়, চেহারা দেখে অবশ্য তা বোঝার উপায় নেই। এখনও চুলদাড়ি সবটা পাকেনি। ছিপছিপে লম্বা চেহারা। লোকে তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে। তিনি পীরখানের খাদিম।

রামগতি বলল, দেখা হল, কথাও হল। সব শুনে খুব দুঃখ পেলেন। বললেন, আমার নিজের গ্রামের মেলায় আমি যেতে পারব না এমনটা কখনও ভাবতেও পারিনি। গত বছরও তিনি তাঁর নাতিদের নিয়ে মেলায় এসেছিলেন। এবার মেলায় আসার ইচ্ছেটা নাকি আরও প্রবল হয়েছিল আপনার ছেলে আর তার সঙ্গীদের জন্য।

অভিদের সঙ্গে যে বরকত সাহেবের খুব ভাব তা শ্যামাপদ জানেন। বরকত সাহেবের সঙ্গে একদিন দেখা না হলেই অভির মন খারাপ হয়। অভি আর তার সঙ্গীরা প্রতিদিন সন্ধ্যার মুখে পীরখানে হাজির থাকে। বরকত সাহেব তাদের বাতাসা-নকুলদানা দেন। টুকরো কাপড়ের পুতুলও বা আসন বা রুমাল বানিয়ে আনেন ওদের জন্য কোনও কোনও দিন। তাদের ঝগড়ার মীমাংসাও করেন তিনি। আবার পীরখানের

পাশের নিম গাছের তলায় বসে দেশবিদেশের রূপকথা-উপকথাও শোনান। ছোটরা সবাই বরকতচাচার ভক্ত।

শ্যামাপদ বললেন, ঠিক আছে সে দুঃখ ভোলানোর কিছু ব্যবস্থা হবে পরে। আজ না এলেই হল।

—না আসবেন না। মেলায় আসবেন না, পীরথানে আসবেন না, বাড়ি থেকেই বেরোবেন না। ও পাড়ার কেউই আসবে না।

—বাঃ। কিন্তু ভরসা রাখা যায় তো?

—অবশ্যই। বরকত সাহেব অত্যন্ত সজ্জন মানুষ। ও পাড়ার অন্যরা কে কেমন বলতে পারব না কিন্তু বরকতসাহেবের ওপর আমার পুরো আস্থা আছে। তবে স্যার, সন্ধ্যেবেলা পীরথানে প্রদীপও জ্বলবে না এটা আমারও কেমন লাগছে। এখানে তো আমার কম দিন হল না। হিন্দু-মুসলমান সবার কাছেই পীরের দরগা খুব পবিত্র স্থান। ভক্তরা তাদের মনস্কামনা পূর্ণ করার জন্য নিম গাছের ডালে ঢিল বেঁধে দেয়, মাটির ঘোড়া মানত করে। এখন তো দিনকাল অনেক বদলেছে। আগে অসুখে বিসুখে পীরথানে ছুটে আসত মানুষ। বিয়ে করে নতুন বৌ আসলে বাড়ি ঢোকার আগে লোকে যেত পীরথানে প্রণাম করতে। সে সব প্রথা উঠে যাচ্ছে, তবু—

—ভালই তো রামগতিদা, নন্দন বলল, মানুষ র‍্যাশন্যাল হচ্ছে।

রামগতি তাকে ধমক দিয়ে বলল, চুপ কর। মানুষ যদি র‍্যাশন্যাল হচ্ছে তাহলে রেষারেষি বাড়ছে কেন?

—রেষারেষি বাড়ছে কেন বুঝতে হলে তোমাকে—। নন্দন বাক্য সম্পূর্ণ করার সুযোগ পেল না। রামগতি তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, চাকরি আমার কম দিন হল না। অনেক কথা শুনেছি, দেখেছিও অনেক। আমাকে তুমি কী বোঝাবে?

শ্যামাপদ ফাইল থেকে মুখ তুলে বললেন, বোঝাবোঝি এখন থাক। মুখার্জি সাহেব এসে পড়ার আগে তোমরা তৈরি হয়ে নাও। কর্তাদের যা হুকুম তাই তো করতে হবে আমাদের।

রামগতি চলে গেলেও দাঁড়িয়ে রইল নন্দন।

—কিছু বলবে?

—স্যার, বরকত সাহেব ছাড়াও ও পাড়ায় ছ'সাত ঘর মুসলমান আছে। পাশের গ্রামেও বেশ কিছু। এরা সবাই বরকত সাহেবের কথা নাও শুনতে পারে। তারা যদি কোনও ঝামেলা পাকায়?

—পাকাক। ঝামেলার মধ্যেই তো আছি, আর কত ঝামেলা পাকাবে, আর ঝামেলা আমরা নিজেরাই কম পাকাইনি নন্দন। তুমি যাও, আমার টেনশন আর বাড়িয়ো না।

নন্দন দ্রুত প্রস্থান করল। শ্যামাপদর কথার গূঢ়ার্থ বোঝার মতো বুদ্ধি তার আছে। যদিও তার স্থির বিশ্বাস যে সে কোনও ভুল করেনি কিন্তু এখন সঙ্কট, এখন তর্কের সময় নয়। নন্দন চলে গেলে শ্যামাপদ স্বস্তি পায় কিছুটা, একটা সিগ্রেট ধরায়। মুখার্জি সাহেব এখনও এলেন না কেন সেই ভাবনা তাঁর মাথায় কুণ্ডলি পাকাতে থাকে।

(৩)

দু'গাড়ি ফোর্স এল, মুখার্জি সাহেব আসেননি। খবর পাঠিয়েছেন তিনি আসতে পারবেন না। গত রাতে পায়রাশোলে দু'জন লোক খুন হয়েছে, তিনি সেখানে গেছেন বাকি ফোর্স নিয়ে। সাহেব আসেনি জেনে হরিহরও স্বস্তি পেল। মাত্র দু'গাড়ি ফোর্স দেখে সে বিস্মিত হল। তারও অভিজ্ঞতা কম নয়। সে শ্যামাপদকে বলল, স্যার, এই ক'টা লোক দিয়ে আপনি করবেন কী? সত্যি গোলমাল বাধে তো আপনাদের লেজ তুলে দৌড়োতে হবে। তার চেয়ে ফোর্স না নামানোই ভাল। তাই না?

দাঁতে দাঁত ঘষে শ্যামাপদ বললেন, এই সোজা কথাটা কর্তাদের বোঝাবে কে হরিহর? আমি তো ফেল মেরে গেছি।

শ্যামাপদ যথার্থই ক্লান্ত ও হতাশ। গত তিন দিন দফায় দফায় কর্তাদের সঙ্গে শলাপরামর্শ হয়েছে। গতকালও শ্যামাপদ বলেছিলেন মুখার্জি সাহেবকে—কোনও সমস্যা হবে না স্যার, খামোখা ফোর্স নামিয়ে একটা টেনশান তৈরি করা কেন?

মুখার্জি সাহেব বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না চক্কোত্তি, চারদিকের অবস্থা তেমন ভাল নয়। সব পক্ষই সুযোগ খুঁজছে। যে কোনও সময় যে কোনও তুচ্ছ কারণে দাঙ্গা বেধে যেতে পারে। দাঙ্গা বাধানোর লোকের অভাব নেই। এস.পি., ডি.এম. কেউ যখন ঝুঁকি নিতে চাইছে না, সেখানে তুমি কেন ঝুঁকি নেবে? পঞ্চায়েতের সদস্যরাও বলেছে ফোর্স পাঠাতে।

শ্যামাপদ তাও জানেন। পঞ্চায়েতের মাতব্বররা গোড়ায় গোলমালের আশঙ্কা ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছিল। পরে তাদের কেউ কেউ বলেছে বটে যে, ঝুঁকি নেবার দরকার নেই, ফোর্স পাঠান।

—এতই যদি ঝুঁকি মেলার অনুমতি দিলেন কেন?

—আরে ব্বাস, অনুমতি না দিলে সবাই মিলে আমাদের মাথা চিবোত। ধর্মীয় অধিকারে-লোকাচারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠত। তাছাড়া তুমিও তো সম্মতি দিয়েছিলে।

—দিয়েছিলাম। না দেবার কোনও কারণ ছিল না। কোথায় পাঠানকালীর মন্দির আর কোথায় পীরথান। অন্তত পাঁচশ গজের তফাৎ।

—ওই দূরত্ব মেলার ভিড়ে মুছে যাবে।

—বহু যুগ ধরে এ মেলা হচ্ছে। কখনও মেলায় কোনও গণ্ডগোল হয়নি স্যার। মেলাতে হিন্দু-মুসলমান, সাধু-সন্ন্যাসী,

মোল্লা-ফকির নীচুজাত-উঁচুজাত সকলেই আসে। আমার থানা বেশ শান্তিপূর্ণ স্যার।

—সে সব অতীতের কথা ভুলে যাও। এখন আই.বি. রিপোর্ট অন্যরকম। এখন হিন্দু-মুসলমান, সাধু-ইমাম, নীচুজাত-উঁচুজাত এক ঠাঁই হলেই গোলমালের আশঙ্কা জাগে। তোমার এই শান্তিপূর্ণ থানা এলাকাতেই তো গত সপ্তাহে একটা গণ্ডগোল হল। কেন হল?

গত সপ্তাহে বনমালীপুরের পাশের গ্রাম ঝিমলিশোলে চায়ের দোকানে দুটো রগচটা ছেলের মধ্যে মারামারি হয় যাত্রা প্রসঙ্গে। একটি ছেলে হিন্দু, অন্যটি মুসলমান। সেদিন থানায় শ্যামাপদ ছিল না, রামগতিও না। তিলকে তাল করার ওস্তাদ নন্দন ছেলে দুটোকে হাজতে পুরে ওপরওয়ালাদের কাছে অতিরঞ্জিত রিপোর্ট পাঠায়। তারপর শ্যামাপদ বার বার বলেছেন যে, নন্দনের রিপোর্ট ঠিক নয়, এর মধ্যে কোনও সাম্প্রদায়িক গন্ধ নেই। কিন্তু কে শোনে!

শ্যামাপদ কাল মুখার্জি সাহেবকে বলে এসেছিলেন, স্যার শুধু ফোর্স পাঠালে হবে না। সঙ্গে আপনি অন্তত আসুন।

মুখার্জি সাহেব হেসে বলেছিলেন, বেশ, যাব আমি। তুমি পীরথানের খাদিম বরকত সাহেবের সঙ্গে কথা বলবে। সে না কি খুব প্রভাবশালী। প্রয়োজনে তাকে আটকাবে। আর পীরথানটা কর্ডন করবে ভাল করে। সকাল থেকেই কে কখন কী মতলবে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঠিক আছে না কি।

—ইয়েস স্যার। আর কোন হুকুম?

—হুকুম আর কী। রাতের জন্য ব্যবস্থা রেখো।

মুখার্জি সাহেব এলেন না। ঝুট-ঝামেলা সবটাই শ্যামাপদর কাঁধে চাপল। কর্তাদের মুণ্ডুপাত করতে করতে তিনি বাসার দিকে পা বাড়ালেন।

(৪)

হরিহর কাকা আসা মাত্র অভিমন্যু চুল আঁচড়ে, জামাজুতো পরে তৈরি। তখন তার মা নন্দিতা বললেন, না অভি, তুমি বারান্দায় বসে মেলা দেখতে পার, বেরোতে পারবে না।

অভিমন্যু এমন একটা নির্মম বাক্য উচ্চারিত হবে আশঙ্কা করছিল সকাল থেকে। সে চিৎকার করে কেঁদে উঠল, ঝাঁপিয়ে পড়ল বিছানায়, জুতোসুদ্ধ পা দিয়ে বিছানায় দাপাতে শুরু করল। তখনই ছুটে এলেন তার ঠাকুমা। প্রকাশিত হল তাঁর প্রশ্রয়। বললেন, যাক না বৌমা। ছোট ছেলে, মেলা দেখবে না? আমারই তো যেতে ইচ্ছে করছে। তাছাড়া, হরিহর সঙ্গে থাকছে—ভাবনা কী? তবে দেরি করো না দাদুভাই, সন্ধ্যে হলেই ফিরে এস।

অভিমন্যু অনুমতি পাওয়ায় হিরুর পক্ষে অনুমতি আদায় করা সহজ হল। কিন্তু আর কাউকে তারা সঙ্গে পেল না।

বনমালীপুরের মেলার অসাধারণত্ব কিছু নেই। নিছক গ্রাম্য মেলা, মনোরঞ্জনের সস্তা আয়োজন। তাতেই মেলা জমে উঠেছে। ভিড় ঠেলে এগোনো দায়। যে যার সাধ্যমতো কেনাকাটা করছে। ধুলোমাখা মুখগুলি হাসিতে উজ্জ্বল। হিরু ও অভিমন্যু এক বেলুনওয়ালার ভাঁড়ামো দেখল কিছুক্ষণ। হরিহরকাকা তাদের মৌরি 'লজেন্স' খাওয়ায়, তারা নিজেদের পয়সায় কেনে গ্যাস বেলুন। নাগরদোলায় পাক খায়। হরিহর চোখে কম দেখে কিন্তু সে বন্দুক ছুঁড়ে পরপর আটটা বেলুন ফাটিয়ে সবাইকে অবাক করে দিল।

অনেক হাঁটাহাঁটির পরও তারা কেউ ক্লান্ত হল না। গ্যাস বেলুন হাত ফসকে আকাশে উঠে গেলেও দুঃখ পায় না হিরু, বরং হেসে ওঠে। আর, অভিমন্যু পরম ঔদার্যে নিজের বেলুনটা দিয়ে দেয় হিরুকে। হরিহর যথাসময়ে ঘোষণা করে, অনেক হল, এবার বাড়ি ফের।

বার দু'তিন বলার পরও তাদের বাড়ি ফেরার রাস্তায় নিতে পারল না হরিহর। যথাসময়ে না ফিরলে হরিহরও খুব বকুনি খাবে। তাছাড়া, এদের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে হরিহর তো আবার মেলায় ফিরবে গান শুনতে। তার যে তাড়া আছে। বাড়িতে বকুনি খাবে খুব বলাতেও হিরু বা অভি তা গ্রাহ্য করল না। তখন হরিহর বলল, তোমরা কথা না শুনলে আমি বরকত সাহেবের কাছে নালিশ করব। বড়দের কথা না শুনলে তিনি কেমন রেগে যান সে তো তোমরা জানো।

অভিমন্যু বলল, চাচাকে মেলায় দেখছি না কেন? চাচা কি আসেনি এখনও? আমরা চাচার সঙ্গে দেখা হলেই চলে যাব।

—কেন?

কেন যে আসবে না তা হরিহর জানে কিন্তু সে কারণ তো শিশুদের ব্যাখ্যা করে বোঝানো সম্ভব নয়। হরিহর নিজেও যে বুঝেছে তাও না। সে বলল, চাচার শরীর ভাল নেই শুনেছি।

—পীরথানেও আসবে না?

—না।

হিরু ও অভিমন্যু দুজনেই অবাক হল। গত মাসেই চাচা একদিন এল কাশতে কাশতে। হিরু বলল, তোমার তো শরীর ভাল না, এলে কেন?

চাচা বলল, আমি না এলে দরগায় প্রদীপ জ্বালবে কে? পুজো না হলে যেমন তোমাদের ঠাকুর কষ্ট পান তেমন আমার আল্লাও। যিনি আমাদের এত সুখ দিয়েছেন তাঁকে কী দুঃখ দেওয়া ভাল?

—একটা দিন ছুটি নিতে পারতে?

—এ কাজে একদিনই ছুটি হয় রে বেটা। যতদিন পারব করব। নিতান্ত অক্ষম হলে তখন এ-কাজ অন্য কেউ করবে।

—কে করবে চাচা, হানিফদাদা?

বরকত সাহেব খুব হাসলেন। তিনি জানেন যে অভিমন্যুরা হানিফকে পছন্দ করে না। হানিফ বড় রুক্ষ, গোমড়ামুখো। ছেলের দল তার কাছে পাত্তা পায় না। কোনও কোনও বিশেষ দিনে বরকত সাহেব হানিফকে সঙ্গে আনেন। সেদিন এদের দস্যিপনা অনেক কমে যায়।

—তাই তো, হানিফ ছাড়া আর আছে কে?

—কেন আমরা আছি না?

—না না, তোমরা এ কাজ পারবে না।

—খুব পারব। অভিমন্যু বলল, কী এমন কাজ? হাত পা ধুয়ে প্রদীপ জ্বালা, ধূপকাঠি জ্বালা, চারদিকে ঘোরা আর উপুড় হয়ে প্রণাম করা। রোজ তো দেখছি, আমরা পারব। যেদিন মায়ের শরীর ভাল থাকে না সেদিন তো আমিই পুজো করি। সে কী তোমার মতো পুজো—বাড়ির পুজোয় আরও কত কী করতে হয়, সে সব তুমি তো জানো না। আর, আমার ঠাকুমা বলে, পীরের পুজো সকলেই করতে পারে।

বরকত চাচা হেসে বলল, তোরা সব পাগল।

বরকত চাচা অসুস্থ বলে আসেনি এ কথা হিরু বা অভিমন্যু মানতে চাইল না। তারা বলল, মেলায় না ঢুকলেও পীরথানে চাচা নিশ্চয় আমাদের জন্য এসে বসে আছে। চল দেখে আসি।

হরিহর হেঁকে বলল, কথা শোন বলছি। এখন বাড়ি চল।

অভিমন্যু বলল, পীরথানে চাচা এসেছে কি না দেখেই বাড়ি ফিরব।

হরিহর আর কী করে, রাজি তাকে হতেই হল।

(৫)

পীরথানের কাছে এসে তারা দেখল প্রচুর পুলিস আর হোমগার্ড। কিছু চেনা মুখ, কিছু মুখ অচেনা।—এরা এখানে কেন? হিরু বলল, নিশ্চয় কোনও গণ্ডগোল হয়েছে।

অভিমন্যু বলল, গণ্ডগোল হলে লোকজন ছুটোছুটি করে, হইচই হয়। কিন্তু এখানে সকলেই শান্ত। এখানে গোলমাল হয়নি।

বড়বাবুর ছেলের জ্ঞান বেশি হতে পারে, হিরু তাই মেনে নিল। সে বলল, তাহলে চাচার শরীর নিশ্চয় খুব খারাপ, নইলে দরগায় প্রদীপ জ্বলেনি কেন? অভি বলল, তবে তো পীরবাবার পুজো হয়নি আজ, কী হবে?—আজ তবে আমরাই পুজো করি, আয়। চাচা জানতে পারলে খুব অবাক হবে।

—খুশিও হবে। চাচা তো বলে যে আমরা ছোট, কিছুই পারি না। চাচাকে দেখিয়ে দেব—

হিরু থামল। রামগতি এগিয়ে এসেছে।—তোরা এখন এখানে কেন? কার সঙ্গে এসেছিস?

অভিমন্যু বলল, আমরা মেলা দেখতে এসেছি হরিহরকাকার সঙ্গে। রামগতি বলল, মেলা দেখতে এখানে কেন? হরিহর কোথায়?

হরিহর সামান্য পিছিয়ে পড়েছিল। সে কাছে এলে রামগতি তাকে কড়া ধমক দিল।—তুমি সব জেনেও এমন দিনে বাচ্চাদের নিয়ে বেরোলে কেন? যাও, বাড়ি পৌঁছে দাও, আর মেলা দেখতে হবে না।

হরিহর কিছু বলার আগেই অভিমন্যু বলল, মেলা দেখা শেষ। এবার আমরা পীরথানে প্রণাম করে বাড়ি ফিরব।

রামগতি হ্যাঁ বা না বলার আগেই হিরুর হাত ধরে অভিমন্যু দৌড় দিল পীরথানের দিকে। রামগতি এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে চিৎকার করে বলল, খবর্দার, আর এগোবে না কেউ। তাহলে ঠ্যাং ভেঙে দেব।

হিরু দাঁড়ালেও অভিমন্যু দাঁড়াল না। রামগতি হরিহরকে বলল, যাও তো ওকে ধরে আন।

হরিহর বলল, ওকে ধরে আনা আমার সাধ্যের বাইরে গো মেজবাবু। তবে ব্যস্ত হয়ো না। ও নিজেই ফিরবে।

—ব্যস্ত হব না? বল কী? তুমি তো জান, আজ পীরথানে প্রবেশ নিষেধ।

—তা হোক। একটা বাচ্চা ছেলে প্রণাম করতে চায় করে আসুক, ক্ষতি কী?

—সে প্রণাম তো এখানে দাঁড়িয়েও করা যায়। ওর অন্য মতলব কিছু আছে।

হিরু বলল, ও প্রণাম করবে চাচার মতো প্রদীপ জ্বেলে।

—সর্বনাশ! কী করতে কী করে ফেলবে, বেধে যাবে ধুন্দুমার কাণ্ড। যাও হরিহর ও ছোঁড়ার কানটা ধরে নিয়ে এস।

—পার তো তুমি যাও। ও ছেলেকে ধরে আনা সহজ নয়। তায় বড়বাবুর ছেলে।

রামগতি আতান্তরে পড়ল। বড়বাবুর ছেলেকে কান ধরে টেনে আনা তো সম্ভব নয়। কিন্তু কিছু একটা করতেই হয়। দুপুরটা নির্বিঘ্নে কাটার পর সন্ধ্যের মুখে এমন সমস্যায় পড়তে হবে কে জানত।

অভিমন্যু পুকুরে হাত পা ধুয়ে পীরথানের কুলুঙ্গিতে রাখা প্রদীপটা বার করল। আধপোড়া ধূপকাঠিও পেয়ে গেল খান কয়েক। কিন্তু দেশলাই তো নেই। প্রদীপ ও ধূপকাঠি হাতে নিয়ে সে ফিরে এল। রামগতিকে বলল, কাকু, এগুলি ধরিয়ে দাও তো।

রামগতি বলল, এসব যেখানে যেমন ছিল রেখে এস বাবা অভি। কে কোথায় দেখে ফেলবে—আমি বড় বিপদে

পড়ে যাব। তুমি বাড়ি যাও। পুজোটুজো তোমাকে করতে হবে না। যার কাজ সেই করবে।

—যার কাজ সে তো আসেনি। পুজো না হলে পীরবাবা দুঃখ পাবেন, জান না?

—আর, আজ পীরথানে প্রদীপ জ্বললে আমার যে কী হবে সে তো বাছা তুমি জান না। তুমি বাড়ি যাও, আমায় ঝামেলায় ফেল না। পুরো দুটো বছরও বাকি নেই রিটায়ার করতে। রামগতির গলায় বিনীত আবেদন।

হরিহর বলল, ঝামেলার ভয়ে কী ঝামেলা যে তোমরা বাধিয়েছো বুঝতে পারছি না। পীর খুব জাগ্রত দেবতা মেজবাবু, তার পুজোয় বাধা দিয়ো না।

ঝামেলার ভয়ে যে ঝামেলা বাধানো হয়েছে তাতে সন্দেহ কী। কিন্তু সে কথাটা কর্তাদের মাথায় ঢুকল না যে। ঢুকবে কেমন করে। আজকাল কী দ্রুত সবাই কর্তার আসনে বসে। দূরদৃষ্টি নেই, অভিজ্ঞতা নেই। দরকারও হয় না। মরুক গে তারা। রামগতি কর্তব্যনিষ্ঠ কর্মচারি, হুকুম তামিল করার জন্য উপস্থিত। পীরথানে আজ সে তাই কাউকে ঢুকতে দিতে পারে না। আজ পীরবাবা শুয়ে থাকুন অন্ধকার আকাশের নীচে, আজ প্রদীপ জ্বলবে না।

রামগতি বলল, দেখ হরিহর, যত ঝামেলা তুমি পাকিয়েছো। আর একটিও কথা নয়। এখুনি যদি তুমি এদের নিয়ে এখান থেকে বিদায় না হও তো এমন শিক্ষা দেব যে—

—এঃ, বড় লাটসাহেব এলেন আমাকে ভয় দেখাতে। আমার নাম হরিহর পাত্র। তুমি বাইরে থেকে এসে উর্দি চাপিয়ে হুকুম দেবে পীরের পুজো হবে না আর তাই আমাদের মেনে চলতে হবে? মানব না। আমিই প্রদীপ জ্বালব, দেখি তুমি কী করতে পার।

লোক জমছে। রামগতির নাড়ির স্পন্দন বেড়ে চলেছে। দ্রুত একটা কিছু করতে হয়। অভিমন্যুর হাত থেকে প্রদীপ নিজের হাতে নিয়েছে হরিহর। এইবার দেশলাই জ্বালল। ঠিক সেই মুহূর্তে এক ঝটকায় প্রদীপ কেড়ে নিল রামগতি।

—যাও, যাও এবার। আর এক মুহূর্তও এখানে দাঁড়াবে না কেউ। হটো—হটো—হটো—

রামগতির হাঁকডাকে ত্রস্ত সহকর্মীরাও এগিয়ে এসে হাঁক দেয়, হটো—হটো।

হরিহর এমনটা ভাবেওনি। তবে, মুহূর্তে সে এও বুঝল যে, এখন এখানে কোনও ভেলকি দেখানোর সুযোগ নেই—এ-তো আর মেলায় বেলুন ফাটানো নয়। রামগতি আর সাঙ্গপাঙ্গদের কিছুক্ষণ শাপ-শাপান্ত করে সে অভিমন্যু ও হিরুর হাত ধরে বলল, চল বাবারা, এরা আজ প্রদীপ জ্বালতে দেবে না।

হিরু ও অভিমন্যু রাগে দুঃখে অভিমানে কেঁদে ফেলল। বরকতচাচাকে খুশি করার, চমকে দেবার এমন সুন্দর একটা সুযোগ রামগতিকাকার জন্য নষ্ট হল। তারা রামগতিকে তাদের শত্রুতালিকার শীর্ষে রেখে, হাস্যকর অঙ্গভঙ্গি করে স্থানত্যাগ করল।

তারা চলে যাবার পর সামান্য এই ঘটনা ততোধিক সামান্য উত্তেজনা সৃষ্টি করে থিতিয়ে যায়। মেলার সহস্র রাগিনী, বেলুন ও বাঁশি, খাদ্য ও ভোজবাজি এবং মধ্যরাত্রে পাঠানকালীর পুজোর আয়োজন-উদ্যোগ, মেলার মাঠের পুবদিকের রাস্তার সীমানার নিষেধাজ্ঞা মেনে অন্ধকার ছুঁয়ে, তটছোঁয়া সমুদ্রের ঢেউ-এর মতো ফিরে যায়। অন্ধকারে একা রামগতি একটা হাত সার্ভিস রিভলবারে, আর একটা হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে, আজ ক্ষমা কর পীরবাবা। কাল তোমার থানে পাঁচসিকের বাতাসা দেব। □

চতুরঙ্গের আগামী সংখ্যা যথাসময়েই প্রকাশিত হবে। চতুরঙ্গের প্রতি সংখ্যার বর্তমান মূল্য মাত্র বারো টাকা। পত্রিকার কলেবরের অনুপাতে এই মূল্য যে খুবই কম, অভিজ্ঞ পাঠকমাত্রেই সেকথা বুঝবেন। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়েছে এবং যাঁরা নতুন গ্রাহক হতে চান তাঁদের এখন থেকে মাস কিংবা বৎসরের হিসাবে নয়, সংখ্যা হিসাব করে গ্রাহক হতে অনুরোধ করা হচ্ছে। অর্থাৎ তাঁরা ৪ টি, ৮ টি এবং ১২ টি সংখ্যার গ্রাহক হতে পারেন। যে-কটি সংখ্যার গ্রাহক হবেন সেগুলির মূল্য একত্রে যত দাঁড়ায় ততই গ্রাহকচাঁদা পাঠাবেন। আমরা কেবল ডাকখরচ বহন করব। গ্রাহকচাঁদা মনি অর্ডার কিংবা ড্রাফটে পাঠানো বাঞ্ছনীয়। কলকাতার বাইরের চেক ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ সহ পাঠাতে হবে। চেকে কিংবা ড্রাফটে 'চতুরঙ্গ' কথাটি লিখতে হবে। যাঁদের গ্রাহকচাঁদা শেষ হয়নি তাঁদের যতগুলি সংখ্যা এখনও প্রাপ্য যেমন যেমন পত্রিকা প্রকাশিত হবে তাঁরা পেতে থাকবেন। ঠিকানা :

চতুরঙ্গ, ৫৪, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা–৭০০ ০১৩। ফোন : ২৭-৩৭৭০

অভিনয় প্রসঙ্গে

শম্ভু মিত্র

অভিনয় শেখবার উপায় কী—একথা আমার প্রায়ই মনে হয়। অথচ এমন কোনও বিদ্যায়তন পাইনা, এমন কোনও মানুষ পাইনা যার পায়ের কাছে ব'সে অভিনয় শিল্পের নিগূঢ়-তত্ত্ব সব শিখতে পাই। এমন কোনও বন্ধুও পাই না যে প্রত্যেক অভিনয়ের দিন দর্শকদের মধ্যে ব'সে সম্পূর্ণ নাটকটি দেখবে এবং পরে তার রস-বিচার করবে। একেবারে অকর্ম্মা না হ'লে কে অতো সময় ব্যয় করতে পারে? অথচ আমরা কী করি!

একটা কথা সত্য মনে হয় যে, অভিনয়-শিক্ষা সুরু করতে হয় অনেক অল্প বয়স থেকে। তা না হ'লে কণ্ঠস্বরের যথেষ্ট পরিমাণ উন্নতি হয় না। ইস্কুলে চেঁচিয়ে পড়া, কবিতা মুখস্থ বলা ইত্যাদিতে যা কাজ হয় সেটা হোল জমি। তারপর প্রবেশিকা পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুরু হওয়া চাই পরিশ্রম। একদিকে অধ্যয়ন, অপরদিকে অনুশীলন। ঐটাই অবশ্য খাটবার বয়স, ঐ সময়ে ফাঁকি দেওয়ার চাইতে মর্ম্মান্তিক ঘটনা আর নেই। ঐ উঠ্‌তি বয়সেই অস্থির হয়ে জানবার আগ্রহে মানুষকে ছুটোছুটি ক'রে বই সংগ্রহ করতে হয়, তর্ক করতে হয়, সমস্ত প্রাচিনকে নসাৎ ক'রে দিতে হয়, আবার নতুন ক'রে নিজের মনে অস্তিত্বের পারম্পর্য্য গেঁথে তুলতে হয়। সেই বয়সেই আমরা অনেকে সুরু করেছি। কিন্তু মুশকিল হয়, কী উপায়ে গলা তৈরী করবো, বা এই গলা-সাধার উদ্দেশ্য কী তা মনে খুব স্পষ্ট থাকে না। তাই সুরু করি নকল। সেই সময়ে যে অভিনেতা সবচেয়ে সুখ্যাত তাঁর মতো আওয়াজ, ধরন-ধারণ রপ্ত করবার চেষ্টা করি। কিন্তু স্বকীয়তা তো থাকেই, তাই চেষ্টা চলে নিজের অনুভূতি দিয়ে অভিনয় করা। তখন হয়তো দেখা গেল আমাদের মধ্যে কারো কারো কণ্ঠস্বর স্পষ্ট, মিষ্টি ও কিছুটা প্রকাশক্ষম। এর পরে গোলমাল লাগে যে কী প্রকাশ করা কণ্ঠের উদ্দেশ্য! যাদের কণ্ঠ শ্রুতি-সুখকর তাঁরা ঐ মিষ্টত্বকেও একমাত্র অর্থ ও পরমার্থ মনে ক'রে এমন একটা মধু-চটচটে আওয়াজ অভ্যাস ক'রে তৈরী করে যে অনুভূতি হারিয়ে যায়। অর্ডারি মিষ্টত্ব প্রায় ন্যাকামির মতো শোনায়। তখন সচেতন হ'য়ে আবার চেষ্টা করি গলাটাকে ভেঙ্গে গড়তে-যাতে আমার অনেক অনুভূতি সেই কণ্ঠে সত্য হয়ে প্রকাশ হয়। খালি কান্না, কিংবা খালি মিষ্টত্ব নয়।

এই চেষ্টার পরে দেখা যায় যে, যে-কণ্ঠ তৈরী হোল তার বলিষ্ঠতা আছে, গাম্ভীর্য আছে, ও উচ্চগ্রামে ওঠার ক্ষমতা আছে। এইরকম সময়ে আবার নতুন একটা সমস্যা দেখা দেয়। হঠাৎ মনে হয় অভিনেতার শিল্প প্রকাশের ভালো মাধ্যম হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরের সাহিত্য। প্রথম স্তরের সাহিত্য এতই প্রকাশময় যে অভিনয় করবার কোনও প্রয়োজন থাকে না। মোটামুটি মানানসই চরিত্র সেজে কথাগুলো ব'লে গেলই হলো। গল্পই তার নিজের জোরে টেনে নিয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ মনে হয়, শিশিরকুমারের আলমগীর ও রমেশের অভিনয়। যে-বিরাট তরঙ্গ উত্থানপতনের শিহরন পাওয়া যায় তাঁর ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক চরিত্রাভিনয়ে সে ব্যাপ্তি নেই সামাজিক নাটকের। অথচ লেখা হিসাবে পরবর্তীগুলিই শ্রেষ্ঠ। এই দেখতে দেখতেই মনে হয় যে চরিত্রানুগ অভিনয় কথাটা বাজে কথা। অভিনেতার ব্যক্তিত্বই হচ্ছে আসল কথা। সেই ব্যক্তিত্বর উৎকর্ষ সাধন করা, দর্শকের মনের কাছে তাকে স্পষ্টতর করা, দর্শককে আকৃষ্ট করা এই হোল অভিনয়। এবং কেবল মাত্র এরই জোরে অভিনেতা বা অভিনেত্রী দর্শকের প্রিয় হয়। এর উদাহরণ তো স্বদেশে বিদেশে অজস্র। হলিউড থেকে ছবি আসে, তাই থেকে আমরা খালি যে অভিনয় শেখার চেষ্টা করি তা নয়, আমাদের বিচারের মানদণ্ডও তৈরি হয় মার্কিনী মতে। সেখানে 'তারকা' তৈরি করার প্রায় এক যান্ত্রিক ব্যবস্থা আছে। সেই ব্যবস্থা অনুসারে গ্রিটা গার্ব্বো চিরকাল গ্রিটা গার্ব্বোর অভিনয় ক'রে গেলেন। আমরা দূর থেকে তার সম্পর্কে কিংবদন্তী শুনে চলচ্চিত্র-পত্রিকায় নানা কাল্পনিক কাহিনী প'ড়ে ঠিক ক'রে নিই যে নান্য পন্থাঃ অয়নায়। অতএব, নিজেকে দেখাও, নিজেকে কল্পনার সঙ্গে মিশিয়ে দর্শকের সামনে দোকান মেলে বসো। মনোহরণ করতে হবে।

কিন্তু যৌবন একটা প্রচণ্ড শক্তি। সেই যৌবন থাকতে থাকতেই যদি আমাদের মনে এই ব্যক্তিত্বের বেসাতি করার লোভ জাগে তো রক্ষা পেয়ে যাই। অনর্থক মিষ্টত্ব যেমন প্রথম বয়সে পরিত্যাগ করা যায়, তেমনি এই Self-exhibitionismও ঠেকানো যায়। কিন্তু যৌবনের শেষপ্রান্তে এর সঙ্গে লড়াই ক'রে এঁটে ওঠা খুব শক্ত। আর সেই জন্যই এই শ্রেণীর নায়ক নায়িকাদের মুখে চুন মেখে বয়স চুরি করার প্রায় এক অর্দ্ধোন্মাদ প্রচেষ্টা করতে হয়। কিন্তু বয়স থাকলে তো এই দীনতা থাকে না। তখন তাই অন্য ক্ষুধা মনের মধ্যে আনচান করে। ইচ্ছা করে, নানান চরিত্রের মধ্যে নিজেকে খুঁজি, নিজেকে বুঝি। কেবল নিজের পুনরাবৃত্তি করতে অস্বস্তি লাগে, লজ্জা করে। অথচ এ কী আপদ যে সর্ব্বজনপ্রিয় সামাজিক নাটকগুলোর মধ্যে সে সুযোগ নেই। সে ব্যাপ্তি নেই, সে মুক্তি নেই। অভিনয় করতে চাই, যে অভিনয়ের মধ্যে জোয়ারে ফুলে ওঠা সমুদ্রের মতো দুরন্ত আবেগ আছে কিন্তু 'রঘুবীর' বা 'আলমগীর'-এর মতন নাটকে সে সুযোগ নেই। সে যেন অকালীন অতিকৃতি। অপর দিকে 'রমা', 'স্বামী-স্ত্রী' বা 'তটিনীর বিচারে'ও নেই। ব্যাপ্তি নেই।

এই যন্ত্রণার মধ্যে হয়তো হঠাৎ খবর পাই সাম্প্রতিক কালের কোনও বীরত্বের কাহিনীর। তারপর দেখি সেই বীরত্ব আমাদের চোখের সামনে, যখন হিন্দুকে বাঁচাতে মুসলমান বা মুসলমানকে বাঁচাতে হিন্দু দলবদ্ধ উন্মত্ততার বিরুদ্ধে একা দাঁড়াতে ভয় পায় না। সামান্য নিরীহ একজন লোক যখন পৈশাচিক জনতার সামনে মাত্র একটা বেড়াবার লাঠি নিয়ে খাড়া হয়—কেন? না, নারীর অসম্মান হ'তে দেবে না, শিশুহত্যা হ'তে দেবে না। তখন মনে হয় কীসের modulation শিক্ষা করেছি এতোদিন, কীসের মিষ্টত্ব? এই বীরত্ব কি প্রকাশ করতে পারি নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়ে? এর যে অপার গৌরব?

পারি না। পারি না বলেই হঠাৎ অভিনয় শিল্পের সমস্ত কারুকলা উড়িয়ে দিই ছলাকলা ব'লে। নির্বীর্য ব'লে। চেষ্টা করি কেবলমাত্র ঐ tensionটাকে মূর্ত্ত করতে। ঐ যে লাফ—সাধারণ থেকে অসাধারণে, সামান্য থেকে বীরত্বে,—সেইটুকু প্রকাশ করতে পারাকেই মনে করি অভিনয়ের চরম সাফল্য। তাই চাবকে চাবকে নিজের স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করি, ধনুর ছিলার মতো সমস্ত স্নায়ু, সমস্ত শরীর-মন ঝন্‌ঝন্ করে। কেবল ঐ মুহূর্ত্তটার জন্য। ঐ অস্বাভাবিক অবস্থার জন্য।

কিন্তু এ অত্যাচার মানুষের সইবে কেন? শরীর-মন ভাঙতে থাকে। খেয়াল হয়, এটা অভিনয় নয়। পাগলামি। একটা বিশেষ ক্ষণে climax থাকতে পারে, কিন্তু নাটক থাকে না। অভিনয়ের মূল কথা হোল মানুষকে ভালবাসা, তার গভীরতম মনটাকে প্রকাশ করা। কেমন ক'রে সে একটু একটু ক'রে বীর হচ্ছে এইটা ফোটাতে পারাই হোল নাটক, হোল অভিনয়। এঙ্গেলস্ বোধহয় কাদের যেন টিপ্পনি কেটে বলেছেন, '—ওরা নাটকের পঞ্চম অঙ্ক থেকেই সুরু করতে চায়। বিপ্লবের প্রস্তুতির কথা ভাবে না।'—আমরা ঠিক সেই লোক। গোড়া থেকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়ার ধৈর্য্য ও ক্ষমতা আমাদের নেই, তাই আমরা চরিতার্থ হ'তে চাই একটা বৈপ্লবিক মুহূর্ত্তে, একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে।

আবার তাই সুরু হয় নতুন ক'রে শিক্ষা। মনে মনে ভাবি যে এমন অভিনয় হবে যার প্রত্যেকটা কথা মনে হবে কাব্য, যার প্রত্যেকটা লাইন মনে হবে বহু অর্থব্যঞ্জক, গূঢ়। যার অভিব্যক্তি হবে রূপকের গভীরতা নিয়ে।

মানুষকে ফোটানই হোল অভিনয়ের কাজ। সেই মানুষটা ব্যষ্টিও বটে, সমষ্টিও বটে। অত্যন্ত বাস্তব, কিন্তু অত্যন্ত কাব্য।

পারিনি। স্বপ্ন দেখি। ঐটুকুই স্পর্দ্ধা। □

• চতুরঙ্গের চতুর্দশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা কার্তিক-পৌষ ১৩৫৯ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

শম্ভু মিত্র : চৈতন্যে সম্পৃক্ত তিনটি নাটক

কুমার রায়

শম্ভু মিত্রের প্রয়াণের পর দুটি স্মরণসভায় দুটি বিশাল প্রতিকৃতি রাখা হয়েছিল। নাট্যকর্মীদের সম্মিলিত উদ্যোগে প্রথমটি অনুষ্ঠিত হল মধুসূদন মঞ্চের বিশাল চত্বরে। উন্মুক্ত চত্বরের একদিকে বেশি উঁচুতে রাখা ছিল সে প্রতিকৃতি। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান হল ভারতীয় ভাষা পরিষদের প্রেক্ষাগৃহে ও সভা গৃহে। এর আয়োজক বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠি। বহুরূপী তার স্থপতি — শুধু স্থপতিই নয়, প্রাণপুরুষ, প্রতিষ্ঠাতা শম্ভু মিত্রের স্মৃতি তর্পণ করলেন। সেখানেও মঞ্চে ছিল সেই বিশাল প্রতিকৃতি। এই বিশালতা শব্দটি প্রয়াত শম্ভু মিত্রের সমস্ত নাট্যকৃতির সঙ্গেই যুক্ত হতে পারে।

বাংলা থিয়েটার খুব একটা প্রচিন নয় — বরং বলা যায় অর্বাচিন। ভ্রান্তভাবে সেই রুশি ভদ্রলোক লিয়েবেদেফকে ধরে, টেনেটুনে আমরা দুশ বছর বলছি। আসলে ১৪০ বছরের ইতিহাস ধারাবাহিকতা নিয়ে বর্তমান। সেই ইতিহাসে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিত ভাবেই একটা যুগ তৈরি করে দিয়েছিলেন। তিনিই পথ কেটেছিলেন, রথও চালিয়েছিলেন। তিনিও বিশাল। তাঁকে দেখা বা তাঁর কাজের সঙ্গে পরিচয় ঘটা বাস্তব কারণেই সম্ভব নয়। গিরিশ যুগের পর তার জের চলেছিল অনেকদিন। সেটাই স্বাভাবিক। তারপর শিশিরকুমার এলেন — আবারও একটা যুগ তৈরি করলেন ঐতিহ্যকে অস্বীকার না করেই। অনেক নতুনত্ব এল। নাট্যকলা নিয়ে দেশের মানুষ ভাবতে শিখল। তাঁকে আমরা অনেকেই পেয়েছি। তাঁর সৃষ্ট যুগ ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে তাও দেখেছি। কিন্তু শিল্পী হিসাবে তাঁর বিশালত্ব অমলিন আজও। শম্ভু মিত্রও স্থিরচিত্র হয়ে গেলেন পূর্ববর্তী দুই যুগস্রষ্টা মহৎ শিল্পীর মতোই বিগত ১৮ই মে মধ্যরাত্রের পর ইংরাজি মতে ১৯ শে মে ১৯৯৭-তে। তিনিও নতুন আর এক যুগের স্রষ্টা। পাশপাশি তিনটি বিশাল স্থিরচিত্র — তার মধ্যে প্রথমজনকে আমরা দেখিনি শুনিনি। দ্বিতীয় জনকে আমরা কিছুটা দূর থেকে দেখেছি এবং কিছুটা শুনেওছি। আর শেষজন যে আমাদের সময় এবং জীবনের বড় কাছাকাছি। প্রথম জনকে না দেখা, দ্বিতীয় জনকে কিছুটা দেখা-শোনা এবং তৃতীয় জনকে ত্রিশ বছর ধরে কাছে পাওয়া, ঘনিষ্ঠ থেকে দেখা-শোনার সুযোগ পাওয়া, — এসব নিয়েই বাংলা থিয়েটারের ইতিহাসের অন্তর্ভূত এই সমগ্র পট। আজকের আলোচনা এই সমগ্র ইতিহাসের অন্তর্গত ত্রিশ বছরের কিছু কাজ নিয়ে, — ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৭৮ সালের সময় সীমায় তা বাঁধা। শম্ভু মিত্রের নির্মাণ ও সৃজনের সব খুঁটিনাটি তুলে ধরব না এ নিবন্ধে শুধু কয়েকটি নিদর্শন। যার মধ্য দিয়ে স্রষ্টাকে চিনে নেওয়া যাবে বলেই আমার বিশ্বাস। গিরিশচন্দ্রের মতো শিশিরকুমারের মতো তিনিও অনুসরণীয় কিছু দৃষ্টান্ত নাট্যের ক্ষেত্রে রেখে গেছেন — যা পরের যুগেও (যদি আর কেউ ভবিষ্যতে সে যুগে তৈরি করেন।) অনুসৃত হবে বলেই বিশ্বাস করি। কেননা, তাঁর নাট্যের চেতনার ছাপ তাঁর নাট্যজীবনকে গড়েছে। সময়ের সঙ্গে চলতে গিয়ে তিনি তাঁর কাজের মধ্যে কখনওই চলতি জীবনধারার ছাপকে তাঁর চেতনার নিয়ন্ত্রক ভাবেননি। জীবনের কিছু মূল ধারাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন তাঁর নির্মাণ ও সৃজনের ক্ষেত্রে। তাই বুঝি তাঁর কাছে রবীন্দ্রনাথের নাটক, ধ্রুপদী নাটক শ্রেয় এবং প্রেয় হয়ে উঠেছিল। এইসব নাটকের মধ্যে যে চেতনার বিকাশ তিনি দেখেছেন তাই তাঁর জীবনধারায় ছাপ ফেলেছে। তাই তাঁর নাটক নির্বাচনে অনেক সময়েই দেখা গেছে — চলতি সময়ের, চলতি স্রোতের বিপরীতে গেছে। রবীন্দ্রনাথের চার অধ্যায়, হেনরিক ইবসেন অবলম্বনে দশচক্র এবং সোফোক্লেসের রাজা অয়দিপাউস — এই তিনটি নাট্য প্রযোজনার সময় তাঁকে এবং তাঁর দল বহুরূপীকে বিরূপ সমালোচনা সইতে হয়েছে।

কেননা সমালোচকদের মনে হয়েছে (স্বভাবতই তাঁরা চেতনার নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাটা মানতে চাননি) এ সব নাটক, সময়ের স্রোতকে মানতে চাচ্ছে না। আর্থ-সামাজিক অবস্থার দোহাই দিয়ে সুবিধাবাদ, মূল্যবোধহীন কুম্ভীপাক, দায়হীনতা যে মানুষের চৈতন্যকেই অস্বীকার করতে শিখিয়েছে। দায়হীন বদ্ অভিলাষই তখন শেষ কথা। কে আর গভীরের সন্ধান করে? কিন্তু শম্ভু মিত্র তাঁর নাটকের মধ্যে সেই গভীরের সন্ধানই করতে চেয়েছেন। একজন গভীরগামী মঞ্চপথিকের নাট্যচিন্তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করতে এই নিবন্ধে তিনটি নাটককে বেছে নেব। 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র' এবং 'রাজা অয়দিপাউস'। সে আলোচনার আগে তাঁর বক্তব্য থেকে কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করব যেখানে এ ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টিকোণটা বোঝা যাবে।

> "শুধু অবসর বিনোদন নয়, শুধু প্রমোদ বিতরণ নয়, আরও কোনও গভীর আকাঙ্ক্ষা। আরও কোনও অজানা অথচ গূঢ় অন্বেষণা থাকে মানুষের মনে। আমরা সবাই সেই জ্ঞান চাই, সেই উপলব্ধি চাই। যাতে আমরা দৈনন্দিন তুচ্ছতার বেড়া পার হয়ে যেন শিখার মতো জ্বলে উঠতে পারি। শিখার মতো জ্বলে উঠে যেন নিজেকে নিবেদন করতে পারি।" — ভূমিকা : সন্মার্গ সপর্যা

> "...আমরা ক'জন জানি এই সমাজটা কেমন করে বদলেছে? আর ভবিষৎ তো কিছুই জানি না। সমস্তটা অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের মধ্যেই মানুষকে নিজের মতো করে ন্যায় অন্যায় বিচার করে নিয়ে বাঁচতে হয়। ...তাকে মাথা খুঁড়ে ঠিক করতেই হবে — কোনটা ঠিক, কোনটা বেঠিক।" সাক্ষাৎকার

রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' ১৯৫১ সালে (২১.৮.৫১) অভিনীত হল — সে নাটক চলেছে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত (১২.১.১৯৭৮); 'দশচক্র' প্রথম প্রযোজিত হয় ১৯৫২ সালে। সেটা চলেছিল বেশ কিছু বছর। তারপর এই নাটকটি পুনঃপ্রযোজিত হয় ১৯৬২ সালে, চলেছে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত; আর 'রাজা অয়দিপাউস' ১৯৬৪ সালে — এ নাটকও হয়েছে ১৯৭৮ সাল পর্যন্তই। একটা কথা, শম্ভু মিত্রের প্রযোজনা পরিক্রমা করতে গিয়ে আমরা দেখতে পাব তাঁর সমস্ত কাজই আমাদের সমাজ পরিপার্শ্বের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হয়েছে। পঞ্চাশের দশক থেকে ষাটের দশকে আবার পরিবর্তন। পঞ্চাশের দশকে শম্ভু মিত্রের চেষ্টা ছিল যাতে তাঁর নাট্যকর্মের আবেদনে সমাজ প্রগতির মহৎ আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ পায়। বিপ্লবী মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব এবং স্বরূপভ্রষ্টতা, রাজনীতির বা মোহগ্রস্ত শক্তিমত্তার অবরোধ থেকে মুক্ত মানসিক সম্পূর্ণতার চরিত্রলক্ষণ যেন প্রকাশ পায় তাঁর নাটকে। যেমন, 'উলুখাগড়া'র (১৯৫০) তিক্ত আত্মগ্লানি, ছেঁড়াতার (১৯৫০)-এর অনুপম করুণার পর শম্ভু মিত্র এক নতুন জিজ্ঞাসাতে এসে পৌঁছোলেন 'চার অধ্যায়' (১৯৫১) এবং ১৯৫২ সালে 'দশচক্র' নাটকে। বাস্তববাদী নাটকের কাঠামোতেই সেই সব প্রশ্নের অবতারণা। প্রথম থেকেই, সেই পথিক, উলুখাগড়া নাটক থেকেই সমাজ ও ব্যক্তিসত্তায় জড়ানো তাঁর সংকটের বোধ একটু একটু করে প্রকাশ পাচ্ছে। অবশ্যই 'রক্তকরবী' নাটকে তার সার্থক রূপায়ণ। 'চার অধ্যায়' ও 'দশচক্র' নাটকে যেমন বিশেষ সময়, রাজনৈতিক বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছে, সমাজ ও পরিপার্শ্ব এসেছে আবার 'রাজা অয়দিপাউস' নাটকে ধ্রুপদী গ্রীক নাটকের আবহাওয়া তৈরি করেও উপস্থাপনায় অজ্ঞাত আত্মপরিচয়ের ট্র্যাজেডিতে সামাজিক বক্তব্যের নিহিত ব্যঞ্জনা অটুট রাখতে সচেষ্ট থেকেছেন। সামাজিক ও মানবিক তাৎপর্য ফুটে ওঠে সকল প্রযোজনাতে।

রবীন্দ্রনাথ, ইবসেন অথবা সোফোক্লেস — এইসব ক্ষেত্রে — নাটক নির্বাচন থেকে অভিনয়ের রীতিনীতি পর্যন্ত এমন এক আয়তনের বিন্যাসে শম্ভু মিত্র মানুষের সত্যকে ধরতে চেয়েছেন — যার বিস্তার অনেকখানি। চার অধ্যায়ের অতীন, দশচক্রের ডা. পূর্ণেন্দু গুহ কিংবা ধ্রুপদী অয়দিপাউস যে চরিত্রেই তিনি অভিনয় করেছেন সেখানেই সেই গূঢ় অন্বেষণা, দৈনন্দিন তুচ্ছতার বেড়া পার হয়ে মানুষেরই ঊর্ধ্বায়ণ।

শম্ভু মিত্র মনে করতেন যে রবীন্দ্রনাথকে আমরা এখনও সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারিনি নাট্যের ক্ষেত্রে। সেটা তিনি জরুরি কাজ বলেই বিশ্বাস করতেন। তাই তিনি প্রথম রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে কাজ করলেন বহুরূপীতে — সেই চার অধ্যায় প্রযোজনায় এবং অভিনয়ে নানা অনুভবের স্তর বৈচিত্র্য প্রকাশ করতে অসাধারণ কষ্ট করলেন — যে কষ্ট মর্যাদাযোগ্য। এই তিনটি নাটকে তাঁর চরিত্রসৃষ্টিতে আমরা খুঁজে পাব বিশিষ্ট অভিনয় ধারা, সেটা বিশ্লেষণ করলে বহুমাত্রিক বাস্তবানুগ অভিনয় শিল্পের নিদর্শন খুঁজে পাওয়া যাবে। তাঁর সকল সৃজনধর্মী কাজে এই রিয়ালিটির সন্ধান। শুধুমাত্র বিহেভিয়ার প্রকাশের স্বাভাবিক অভিনয়ে তিনি কোনওদিন তৃপ্তি পাননি।

আবার প্রযোজনার দিক থেকে কেবলমাত্র নান্দনিক তৃপ্তি পাবার জন্যে এই নাটকগুলি করেননি। সমাজের সঙ্গে যুক্ততা নাটকের মধ্যে আছে কিংবা সময়ের সঙ্গে যুক্ততা এবং সেই সঙ্গে নানান বিতর্ক, রাজনৈতিক বিতর্ক, সমাজে নিজের অবস্থান, রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সমাজের সর্বস্তরে খেয়োখেয়ি, মিথ্যাভাষণ — গণতন্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা, দায়হীনতা, এসব তাঁকে ভাবিয়েছে। সব মিলিয়ে যে অন্ধকারের বোধ তাই তাঁকে এই

নাটকগুলি বেছে নিতে প্রাণিত করেছে। অন্ধকারকে অতিক্রম করে তাঁর চেতনা এক সামগ্রিক জীবনদর্শনে ব্যাপ্ত হয়েছে।

প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যে এবং অভিনয় কুশলতায় 'চার অধ্যায়' শম্ভু মিত্র এবং বহুরূপীকে সমৃদ্ধ করেছে। দেশাত্মবোধের খণ্ডিত চেহারা এবং তারই দ্বন্দ্বে দীর্ণ মানুষের আকাঙ্ক্ষিত গণতান্ত্রিক পূর্ণতার অর্থ কী? সেই পূর্ণতা যে প্রেমে এটা অস্বীকার করেই যত জটিলতা; প্রাণের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য কোনও ব্যবস্থাই সুস্থ ব্যবস্থা হতে পারে না। 'চার অধ্যায়' সেই নাটক যেখানে এসব স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। দেখা দেয় বলেই কিছু মানুষের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। রবীন্দ্রনাথ কি এই নাটকের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক বিশিষ্ট পর্বকে ধিক্কার জানিয়েছিলেন? বহুরূপী কি সেই ধিক্কার দিতেই নাটকটি প্রযোজনা করেছে? নানা সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের গায়েও 'চার অধ্যায়' রচনার পর এই আগুনের তাপ লেগেছিল — তাই তাঁকে কলম ধরতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ 'চার অধ্যায়' সম্পর্কে বলেছেন — ' ...যেটাকে এই বইয়ের একমাত্র আখ্যানবস্তু বলা যেতে পারে সেটা এলা ও অতীনের ভালোবাসা। নরনারীর ভালোবাসার গতিপ্রকৃতি কেবল যে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে তা নয় চারিদিকের অবস্থার ঘাতপ্রতিঘাতের উপরেও।' আবার বলেছেন, '....আর-একটা তর্ক আছে। গল্পের প্রসঙ্গে বিপ্লব চেষ্টা সংক্রান্ত মতামত পাত্রদের মুখে প্রকাশ পেয়েছে। কোনো মতই যদি কোথাও না থাকত তাহলে গল্পের ভূমিকাটা হত নিরর্থক। ধরে নিতে হবে যারা বলছে, তাদেরই চরিত্রের সমর্থনের জন্য এই সব মত। যদি কেউ সন্দেহ করে এ-সকল মতের কোনো-কোনোটা আমার মতের সঙ্গে মেলে তবে বলব "এহ বাহ্য"। এ-কথাটা মিথ্যে হলেও গল্পের মধ্যে তার যে মূল্য, সত্য হলেও তাই। কোনো মত প্রকাশের দ্বারা পাত্রদের চরিত্রের যদি ব্যত্যয় ঘটে থাকে তাহলেই সেটা হীন অপরাধ।

'যদি কোনো অধ্যাপক কোনোদিন নিঃসংশয়ে প্রমাণ করতে পারে যে হ্যামলেটের মুখের অনেক কথা এবং তার ভাবভঙ্গী কবির নিজের, সেটা সত্য হোক আর মিথ্যে হোক তাতে নাট্যত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না।...'

'চার অধ্যায়' প্রযোজনার আগে শম্ভু মিত্র মানুষকে জানাবার জন্যে লিখলেন, 'একটা কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'চার অধ্যায়'ই বহুরূপী অভিনীত প্রথম রবীন্দ্র-রচনা। রবীন্দ্রনাথের-আপাত-অসহজকথোপকথনের মূলে যে সহজতার দাবী আছে, বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ একই সঙ্গে জীবনের নানান স্তর যে ভাবে অবলীলায় প্রকাশ করে তার নিদর্শন বাংলা ভাষায় প্রায় গরহাজির। এবং এই নাট্যাভিনয় থেকেই বহুরূপী রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রয়াস শুরু করেছে...।

'এই নাটকের পটভূমিকায় প্রচণ্ড violence। আর সেই রক্তাক্ত পটের উপরেই দু'জন মানুষের প্রেম। এ প্রেম সহজ প্রকাশের পথ পায়নি। তাই এর প্রকাশ ঘটে সাধারণ স্বাভাবিক জীবনের অতিরিক্ত আবেগে। এ দুটো মানুষ যেন তাদের মধ্যে তাদের চেয়েও বড় যে আবেগগুলো রয়েছে সেইগুলোর তুফানে তছনছ হয়ে যাচ্ছে। এবং সেই সম্পর্কে তারা সচেতন বলেই মাঝে মাঝে আবার আপ্রাণ চেষ্টা করে দৈনন্দিন সহজতার স্তরে নেমে আসবার। আর তাই, এই নাট্যাভিনয়ে এলা ও অতীনের অনুভবে যে স্বর বৈচিত্র্য প্রকাশ পায় সেটা — আমাদের অনুমান — ভাবীকালের বহু প্রতিভাশালী অভিনেতা ও অভিনেত্রীকে যেন লুব্ধ করবে। সম্পাদনের অসাধারণ কষ্টও তেমনি মর্যাদাযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।'

দীর্ঘদিন মহলা চলেছিল এ নাটকের। রবীন্দ্রনাথের ভাষা আয়ত্ত করার কঠিন সাধনা। গল্প রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন। নির্দেশক শম্ভু মিত্রের কাজ মুড্ ও পরিবেশ রচনা করা যাতে রবীন্দ্রনাথের উপপাদ্যকে অনিবার্য করে তুলবে। আর অভিনেতাকে শেখানো হচ্ছে যেন সেই উপপাদ্যের ব্যাখ্যা যাতে সে চরিত্রকে সজীব করে তুলতে পারে। প্রথম কয়েকটি অভিনয়ে সবিতাব্রত দত্ত করেছিলেন অতীনের চরিত্র। কেমন করে আঙ্গিক ও বাচিক অভিনয়ে স্বচ্ছতা আনা যায় সেই অনুশীলন। শম্ভু মিত্র বলবেন, — রবীন্দ্রনাথের এ অলোকসামান্য ভাষা। শেক্সপীয়রের নাটকের ভাষার মতোই কাব্যমণ্ডিত এ ভাষা। এখানে যে অনেক গভীর উপলব্ধির কথা আছে। যেমন, 'আলো যে গিয়েছে, এসো আরও কাছে এসো। আমার চোখ দুটো এসেছে ছুটির দরবারে তোমার কাছে। একমাত্র তোমার কাছেই ছুটি। অতি ছোট তার আয়তন...।' কিংবা, 'এই যা দেখছি — এইটিই আশ্চর্য সত্য, এর মানে কী, কাউকে বুঝিয়ে বলতে পারব না, কোনও এক অদ্বিতীয় কবির হাতে ধরা দিতে পারল না বলেই এর অব্যক্ত মাধুর্যের মধ্যে এত গভীর বিপদ।' এই জাতীয় সংলাপে দৈনন্দিনতার ছাপ থাকার কথা নয়। কিন্তু আমাদের মনের গভীরে যে প্রেমের আবেগ আমরা অনুভব করি তার যদি কোনও ভাষা থাকত তা হলে সে হয়ত এই ভাষা। শম্ভু মিত্র এই ভাষা আয়ত্ত করতে এবং অন্য সকলকে আয়ত্ত করাতে সচেষ্ট ছিলেন। শ্রবণেন্দ্রিয় ও কণ্ঠের সংস্কৃতি ছাড়া তো বড় শিল্পীর লেখা সূক্ষ্ম আবেগ বা ভাব প্রকাশ করা যায় না। এই প্রকাশের অনুশীলন হয়েছিল 'চার অধ্যায়'-এ। আবার শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে অতীন-এর অন্য দৃশ্যের সংলাপ যে অনুভব থেকে বলা হচ্ছে তা বিশেষ কোনও অতীতকালের কথা নয়। দেশে যখনই কোনও আন্দোলন ভুল পথ অবলম্বন করে তাদের অন্তরের সত্যকে হারাবে তখনই যে এ ঘোষণার সত্যতা বারবার পুনর্জীবিত হবে।

এই সামাজিক সত্যদৃষ্টি আমরা খুঁজে পেয়েছি এই সব সংলাপ উচ্চারণে —

'দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণকে বাঁচিয়ে রাখা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যে কথা পৃথিবীতে বহু স্থানে আজ ঘোষণা করা হচ্ছে।'

'পেট্রিয়টিজমের চেয়ে যা বড়ো তাকে যারা সর্বোচ্চ না মানে, তাদের পেট্রিয়টিজম্ কুমিরের পিঠে চড়ে পার হবার খেয়া নৌকো। মিথ্যাচার, নীচতা, পরস্পরকে অবিশ্বাস, ক্ষমতালাভের চক্রান্ত, গুপ্তচরবৃত্তি একদিন তাদের কখন নিয়ে যাবে পাঁকের তলায়। এ আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

'মানুষের স্বভাবকে হয়তো সংস্কার করতে পারো, তাতে সময় লাগে। স্বভাবকে মেরে ফেলে মানুষকে পুতুল বানালে কাজ সহজ হয় মনে করা ভুল। মানুষকে আত্মশক্তির বৈচিত্র্যবান জীব মনে করলেই সত্য মনে করা হয়।' — এই রকম অজস্র সংলাপ শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে তাঁর গভীর বিশ্বাসের উপলব্ধির সঙ্গেই যেন অতীন হয়ে মূর্ত হয়ে উঠত মঞ্চে। আমাদের গভীর আকাঙ্ক্ষার যে গণতন্ত্র, তার সম্পর্কে এই দৈববাণী সদৃশ উচ্চারণ তাঁর মুখেই মানাত।

নাটক শুরু হত অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে — জলদগম্ভীর কণ্ঠে চণ্ডীর একটি শ্লোক আবৃত্তি করতেন শম্ভু মিত্র নেপথ্য থেকে। সূত্রধারকে দিয়ে নাটক শুরু হত। তার কথার সূত্র ধরেই প্রথম অধ্যায়ের চায়ের দোকান উন্মোচিত হত। এলা, ইন্দ্রনাথ, কানাই গুপ্তকে নিয়ে নাটক শুরু। দৃশ্য শেষে ইন্দ্রনাথ একা চায়ের টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে অটল একটা মূর্তির মতন। পেছনে তখন সমবেত কণ্ঠে একটা তান শুরু হত যার শেষে গুলির আওয়াজ ও বন্দেমাতরম ধ্বনি। চার অধ্যায়-এর ঘটনাকালটারই নাট্য ভাষা দিয়ে তৈরি সে মুহূর্ত। প্রথম অধ্যায় শুরু হয় উপন্যাসে এই বর্ণনায় 'দৃশ্য — চায়ের দোকান। তারই পাশে একটি ছোট ঘর।' — বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় রবীন্দ্রনাথ সচেতন ভাবেই এ উপন্যাসের নাটকীয় সম্ভাবনা যেন দেখতে পেয়েছিলেন — লেখার সময়েই। দৃশ্য কথাটা উপন্যাসে তৃতীয় অধ্যায়েও ব্যবহার করা হয়েছে —। সেখানে দৃশ্য বর্ণনা প্রায় চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যের ভাষায়। লিখেছেন, — 'দৃশ্যটা এইখানকার পরিত্যক্ত পুরোনো পুজোর দালান,' এবং 'ছায়াচ্ছিন্ন দালান'। আমরা কৃতজ্ঞ থাকব শম্ভু মিত্রের কাছে চিরকাল যে তিনি উপন্যাসের বর্ণনাকে নাটকের ভাষায় অনুবাদ করেছেন মঞ্চে। উপন্যাস ও নাটকের ভাষা আলাদা। উপন্যাসের ইঙ্গিতটুকু নিয়ে তিনি কল্পনা করেছিলেন দৃশ্যপট ও পরিবেশ রচনা — নাটকেরই ভাষায়। দ্বিতীয় অধ্যায়ের সুর ও ছন্দটুকু ঘর সাজানোতে প্রকাশ পেল, — প্রকাশ পেল সেই ছায়াময় চিত্রে। নানান কম্পোজিশনে। পিছনে সেই গৈরিক রঙের টানা চটের পর্দায় দেওয়াল — সেটা যেন, এলার উক্তি, — 'তুমি আসবার আগেই শপথ করে দেশের আদেশ স্বীকার করেছি, বলেছি আমার একলার জন্য কিছুই রাখব না। দেশের কাছে আমি বাগদত্তা।' মঞ্চ সজ্জায়, শব্দ সংযোজনায়, দৃশ্য শেষে টেবিলে রাখা কালীমূর্তির পাশে অন্ধকার মঞ্চে একটি প্রদীপের শিখা — সেই এলা ও অতীনের ছায়ামূর্তি রচনা সবই নাটকে ভাষায় প্রকাশ পেল। দৃশ্য শেষে বন্দেমাতরম ধ্বনি, গুলির আওয়াজ সব যেন রাষ্ট্রীয় বিপ্লবের আর্তিটাকে প্রকাশের আয়োজন। তৃতীয় অধ্যায়ে উপন্যাসের বর্ণনার অংশেরই নির্যাস মঞ্চে। গাঢ় শ্যাওলাসবুজ রঙের পিছনের পর্দা। সেই মঞ্চ গভীরে পর্দায় লাগানো লাল-নীল কাঁচের খিলানযুক্ত দরজা। একটা দড়ির খাটিয়া। অভিনয়ের দিক থেকে সবচেয়ে বর্ণময় এই দৃশ্য। আত্মনিবেদন, অভিমান, তীব্র সমালোচনা, ক্ষোভ, স্মৃতিরোমন্থন। লজ্জা, সংকোচ, মর্মান্তিক উপলব্ধির জালে জড়িয়ে যাওয়ার ছট্‌ফটানি, ধিক্কার — এত সব বিচিত্র এবং ভিন্ন ভিন্ন আবেগের প্রকাশ হয় ক্ষণে ক্ষণে। আর এ সবের ছবি মঞ্চে তৈরি হয়ে চলে কম্পোজিশনে। সেই ছবিগুলি সেই সব আবেগেরই চিত্ররূপ। এরই জের চলবে অন্তিম দৃশ্যে। কিন্তু তখন সব কিছু বদলে গেছে — গলার আওয়াজ থেকে সব কিছু যেন আলাদা। ছন্দ আলাদা — লয় আলাদা।

তৃতীয় অধ্যায়ে আবহাওয়া, পরিবেশ এবং স্থানিক অবস্থান নির্ণয়ে শব্দের একটা বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। কানাই গুপ্ত আলিঙ্গন করে চলে যাওয়ার পর দূরে ট্রেনের আওয়াজ। হুইসিল দিয়ে ট্রেনটি যেন চলে গেল স্টেশন ছেড়ে। তারপর নিস্তব্ধতা। সেই নিস্তব্ধতা ভেঙে এলার প্রবেশ। এলা ও অন্তুর গভীর সংলাপ। তারই মধ্যে নির্দিষ্ট সংলাপে ঝড় জলের আওয়াজ শুরু হত — চলত শেষ পর্যন্ত — মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝলক। হুইসিলের সংকেত পেয়ে অতীনের এই গুপ্ত আস্তানা ত্যাগ, যার কথা কানাই গুপ্ত আগেই জানিয়ে গিয়েছিল। আবেগঘন মুহূর্তেই তাকে চলে যেতে হয়। এলা একা অন্ধকার মঞ্চে। প্রবেশ করেন দলনেতা ইন্দ্রনাথ। শুধু বিদ্যুতের আলোয় যতটুকু দেখা যায়। তার হাতে তিন ব্যাটারির টর্চ। সব মিলিয়ে এক গা ছমছমে পরিবেশ। এলাকে তিরস্কার করে বের করে দিয়ে — ইন্দ্রনাথ হাতের টর্চের আলোয় ঘরটা, মেঝেটা দেখে নেয়। পেয়ে যায় এলার গলার হার — যা সে অতীনকে দিতে চেয়েছিল। এই নাট্যক্রিয়া একটা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এনে দিত প্রযোজনায় — গুপ্ত আস্তানায় যেন কোনও কিছু পড়ে না থাকে।

চতুর্থ অধ্যায় এলার বাড়ির ছাদের দৃশ্য। কয়েকটি আবদ্ধ ঘরের পর প্রথম খোলামেলা আকাশের নীচে ছাদ। এই দৃশ্যে অভিনয়ের সৌকর্য ছাড়াও প্রযোজনায় শব্দের অনুষঙ্গ নাট্যমুহূর্ত তৈরি করে দিত। কখনও মধ্যরাত্রির সময় জানাতে অদূরে

চার্চের ঘন্টাধ্বনি। কখনও কুকুরের কামড়া-কামড়ির আওয়াজ। সংলাপের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এ শব্দগুলি হয়ে উঠত নাট্যেরই শরীর। অভিনয়ে আগের দৃশ্যে আবেগের তীব্রতা, তা যেন এ দৃশ্যে অন্তর্নিহিত। আবেগ, সংযম অনেক পরিমিত। সমস্তটাই যেন পরিমাপ করা, — সবটাই যেন উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এ নাটকে প্রথম অধ্যায়ে ইন্দ্রনাথ যে বলেছিলেন, — 'ঐতিহাসিক মহাকাব্যের সমাপ্তি হতে পারে পরাজয়ের মহাশ্মশানে' — আর আমরা দেখছি 'চার অধ্যায়' নামক কাব্যটির সমাপ্তি হল এই ভেবে যে, 'উপস্থিতির গণ্ডিটা নিতান্তই সংকীর্ণ' — 'মৃত্যুর মুখোসটা টান মেরে ফেলে দিয়ে' — কেননা 'মৃত্যু অত্যুক্তি করে না' — এই বিশ্বাসে। দলের পরওয়ানা নিয়ে আজ নিজের হাতে এলাকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে বলে। এলাও প্রস্তুত। অঞ্জলি ভরে সে ফুল দেয় ক্যাকটাস গাছের টবের পাশে বসে থাকা অতীনের মাথায়। আবেগের দৃশ্যে যে আবেগ নিয়ে এলা বলেছিল, 'আমি স্বয়ম্বরা, আমাকে বিয়ে করো অন্তু — গান্ধর্ব বিবাহ হোক।' — সে আবেগ অন্তর্হিত এ দৃশ্যে — এখন অন্তিম অঙ্কের জন্য প্রস্তুত যে সে! 'শেষ চুম্বন আজ অফুরান হোক' — এ সংলাপ সে ক্লোরোফর্মে ভেজা রুমালটা ফেলে দিয়ে বলে উঠত অন্তুর কোলের ওপর শুয়ে। বাইরে তান শুরু হত। অতীন পকেট থেকে রিভলবার বের করত। মুখটা নামিয়ে আনত এলার মুখের কাছে। নেপথ্যের তানের আওয়াজ বেড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে গুলির আওয়াজ এবং 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিত হ'ত তিনবার। চার অধ্যায় শেষ হত। মঞ্চের পিছনে তখন অন্ধকার — যেন, 'পিছনে মরণের কালো পর্দাখানা নিশ্চয় টানা রয়েছে' অসীমের মতো। 'জীবনের কৌতুক-নাট্য'-এর নাচ শেষ হল অন্তিম অঙ্কে।

রবীন্দ্রনাথ আস্বাদনের পর এল ইবসেন, করলেন 'দশচক্র'। বিশ্বনাট্যের আস্বাদন জরুরি মনে হয়েছিল তাঁর, সেই সঙ্গে শুধু বেদেশি নাটক ভালই নয় — শম্ভু মিত্রের মনে হয়েছিল — দেশীয় প্রেক্ষিতে, তাঁর বিশ্বাস অনুযায়ী, কিছু কথা এ নাটকের মধ্যে বলা যাবে। এ নাটকটি দশকের ব্যবধানে দু'বার প্রযোজিত হয়েছে এবং প্রযোজনায় বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ রূপের পরিবর্তন হয়েছে। সংক্ষেপে দু'টি প্রযোজনার রূপ সম্পর্কে লেখবার আগে ১৯৫২ সাল এবং ১৯৬২ সাল — এই দশকের ব্যবধানে এই কালটাকে বিবেচনা করতে চাই। কেননা শম্ভু মিত্রের সমস্ত নাট্যকর্মে সময় এবং সমাজবাস্তবতার প্রতিফলন আজকে লক্ষ করতে পারি। রাজনীতির লড়াই-য়ে মাথা-গুনতির যে হিসাব করা হয় তাতে কিন্তু গণতন্ত্রের চরম মূল্য নিরূপিত হয় না। গণতন্ত্রের চরম মূল্য সকল মানুষের সমান অধিকারের আদর্শে। সকল মানুষের সঙ্গেই একক মানুষও। এই বোধ বিপন্ন হলে ডা. গুহ-র মতো সৎ, বিবেকবান, বৈজ্ঞানিক ব্যক্তি মানুষের নিগ্রহ হতে পারে। এই চরিত্রেই শম্ভু মিত্র অভিনয় করেছেন ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত। তারপরেও কয়েকটি অভিনয় করেছেন। যে-ব্যবস্থায় এই রকম এক মানুষকে গণশত্রু আখ্যা দিয়ে নিগ্রহ করা যায় শম্ভু মিত্র তারই প্রতিবাদে এই নাটক বেছে ছিলেন — যেমন 'চার অধ্যায়' বেছে ছিলেন — 'দেশের আত্মাকে মেরে দেশের প্রাণকে বাঁচিয়ে তোলা যায় এই ভয়ঙ্কর মিথ্যা' কথাটার প্রতিবাদে। সাময়িক বাজিমাৎ হয় তো হয় — কিন্তু সত্য এবং ইতিহাস তখন সেই ব্যক্তিবিশেষের পক্ষেই থাকে গড্ডল প্রবাহের দিকে নয়। ১৯৫০ সালে ভারত প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান রচনা করেছে — ১৯৫২ সালে প্রথম নির্বাচন। মেজরিটির ভোটেই রাষ্ট্রশাসন কায়েম হয়েছে। তখনই তো সাবধান হবার সময়। আমাদের মতো দেশের ডেমোক্র্যাসি-কে বাঁচাতে গেলে সাধারণ মানুষের জীবনদর্শনকে প্রতিপদে সমালোচনা করা চাই — সেই সঙ্গে দেশ চালনার নিয়ামকদের। গলা-পচা-নোংরার ওপর ভিত গাঁথা হলে সে দেশ কেমন চলবে, এই সদ্য স্বাধীন দেশ? তাই সতর্কতা। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আর মানবিক মূল্যবোধ অভিন্ন হওয়া চাই। মানবিক মূল্যবোধের যথার্থ প্রতিনিধি হবেন তাঁরাই, যাঁরা নিঃস্বার্থ, বিবেকবান (চৈতন্যবান) ও দায়িত্বশীল। অপরিণতমনস্ক সোচ্চার মেজরিটি — তাঁর বিরুদ্ধে গেলেও, — তাঁকেই সম্মান জানাতে হবে। অন্তত ইতিহাস তাই করবে। চার অধ্যায়-এ মানুষকে পুতুল বানাবার বিরুদ্ধে ক্ষোভ জেগেছিল অতীনের মনে। দশচক্রে ডা. গুহ, এক সত্যসন্ধ সরল মানুষ, অভিজ্ঞতার জগতে প্রবেশ করে এক নতুন আবিষ্কার করে ফেলে। অতীনের প্রতিবাদ মাথা কুটে মরেছে আত্মবিনাশের পথে। এক ধাপ এগিয়ে, দশচক্রে, দুঃখ লাঞ্ছনায় ম্রিয়মান নয় — নতুন আবিষ্কার। ঘটমান বাস্তব আমাদের চোখের সামনে স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। মানুষের দুর্জয় আশার নিরন্তর সংগ্রামের নাটক হয়ে ওঠে 'দশচক্র'। ১৯৬২-তে নানান ভাঙনের পর্ব। চিন-ভারত যুদ্ধ আর এক বিপন্ন অভিজ্ঞতা। ১৯৬২ সালে নব পর্যায়ে দশচক্র তাই অন্যরূপ নিল। নাটকীয় সত্য অনড় নয়, সেটা শুধু শিল্পীর উন্নততর শিল্পবোধের প্রকাশও নয় — সময় ও সমাজের অবস্থার সঙ্গে যুক্ত। অন্তত শম্ভু মিত্র এই যুগ্মতা চেয়েছিলেন।

সামগ্রিক অভিনয় '৫২ সালেও ভূয়সী প্রশংসা পেয়েছে। প্রযোজনা অনেক সাধাসিধে ছিল। তখন মনে হয়েছিল নাটকটা করাই জরুরি। কিন্তু সেই '৫২ সালে এক পক্ষ থেকে বাধাও এসেছে। দর্শককে ঘুলিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু দশ বছরে অনেক মুখোস খুলে গেছে। মানুষ চিনতে এবং বুঝতে শিখে গেছে তখন। নাটকও তখন অভিজ্ঞতার ফলে অনেক বদলে গেল — অর্থাৎ বাহুল্য বর্জন করে অবান্তর বাদ দিয়ে,

সংলাপে নতুন মাত্রা যোগ করে ইবসেনের আসল উদ্দেশ্যটিকে প্রকাশ করতেই উদ্‌যোগ নেওয়া হল। রূপান্তর করতে গিয়ে কিছু বাহুল্য ঘটে গিয়েছিল। সুসংবদ্ধ ছিল প্রযোজনা। প্রথম অঙ্কে জলের বীজানু আবিষ্কার-ক্ষণে যখন ডাক্তারের স্ত্রী হৈম কৌতুকরস সৃষ্টি করবার জন্য বলে ফুলশয্যার রাতে তাকে শুনতে হয়েছে মানুষের মেরুদণ্ডে ক'খানা হাড়! — নাটক যত এগুতে থাকে, আমরা জানতে পারি ডাক্তার শুধু মানুষের ভিতরটাই দেখতে শেখায়নি — সমাজের ভেতরটাও দেখতে শেখাচ্ছেন। ব্যক্তি শম্ভু মিত্রকেও দেখতে পাওয়া যেত। যেখানে প্রতিশ্রুতি ছিল 'ভাল'-র সেটা বিশ্বাসভঙ্গ করে 'খারাপ' হয়ে গেল। ডাক্তারের সংলাপ, 'আমরা পাবলিসিটি করলাম, প্রপাগান্ডা করলাম যে লোকজনকে ভাল করে রাখব, সুখে রাখব, সস্তায় জমি দেব — তারা বিশ্বাস করে এসে গেল। আর আমরা এখন কী করছি। না জলের মধ্যে বিষ দিচ্ছি। মানুষকে বাঁচান দূরে থাক, বরঞ্চ যারাও সুস্থ আছে, তাদেরও আমরা মারবার পথ করে দিচ্ছি। বুঝলেন ব্যাপারটা? তা হলে? কেউ যদি, মনে কর, — কড়া করেই বলে, কী জবাব দেবে তুমি তার?' ডা. গুহ রূপী শম্ভু মিত্রের এই সংলাপের উচ্চারণে, সেই ১৯৬২ সালে, দর্শক বড় প্রেক্ষিতেই, আমাদের স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশটার কথাই ভেবে নিত। নাটকের কাহিনীর গণ্ডী ভেঙ্গে সেই তাৎপর্য পেয়ে যেত সে প্রযোজনা। এই সংলাপ যেন প্রতীক — আমাদের সময়ের প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসভঙ্গের।

অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আগেও এবং পরেও। কেননা শম্ভু মিত্রের সমস্ত প্রযোজনায় মানুষগুলিকে সত্য করে প্রকাশ করাই ছিল সাধনা। '৬২ সালের প্রযোজনায় সময়ের প্রকাশটা জরুরি হল অভিনয়ের ক্ষেত্রেও। অভিনয় তো কোনও এক সময়ের স্বরলিপিতে বাঁধা নয়। প্রথম দৃশ্যে ডা. গুহ মধ্যবয়স্ক। গলাবন্ধ কোট, প্যান্ট এবং হাতে একটা ছড়ি। তিনি দৃশ্যে প্রবেশ করতেন বাইরে থেকে গানের একটা তান ভাঁজতে ভাঁজতে — 'আমি ভয় করব না'। হাতের ছড়িটা দরজার পাশে ঝুলিয়ে রাখতেন। একটা প্রাণখোলা মানুষ। দরাজ হাসি। দেশান্তরে অনেক দুঃখ কষ্টের পর এইখানে এসে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। দাদার প্রতি কৃতজ্ঞ। নিজের জায়গায় ফিরে এসেছেন এবং একটা নতুন উদ্যম যেন খুঁজে পেয়েছেন — নিজের জন্মভূমির উন্নতির আকাঙ্ক্ষায়। কিন্তু পরের চারটি দৃশ্যে ক্রমশই চরিত্রটির পরিবর্তন আমরা দেখব। দৃশ্য শেষে সেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত থেকে যেত। একা হয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত! আর দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে — সেই একা হওয়ার অভিনয় মূর্ত হয়ে উঠত কণ্ঠস্বরের পরিবর্তনে, অভিব্যক্তিতে, হাঁটাচলার ভঙ্গিতে — চোখের চাউনিতে, তর্জনীর ব্যবহারে। সে তর্জনীর ভাষা দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে পালটে যায়। ৪র্থ দৃশ্যে, মিটিং-এর দৃশ্যে তাঁর কণ্ঠস্বর মন্দ্রসপ্তকে স্থাপিত। ক্রমশ তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার দশা। মিটিং-এর সাজানো মানুষগুলির মুখগুলি ক্রমশ হিংস্র হয়ে উঠছে। আর তখনই ডা. গুহ সেই কণ্ঠস্বরে ইতিহাসের অন্ধকার যুগ থেকে ক্রমবিবর্তনের যে ইতিহাস তাই বলে যেতেন। বলতেন যেন একজন শিক্ষক, একজন ইতিহাসবেত্তা। ইতিহাসের কোনও এক কালের এক ধর্মযোদ্ধা — একা, কিন্তু সীমাহীন তার শক্তি। বিরোধী পক্ষ তখন তাদের উলঙ্গ চেহারাটা প্রকাশ করত — জুতোর পাটি, পাথরের টুকরো ছুঁড়ত। আলো নিভে যেত। আলো তখন আক্রান্ত ডা. গুহ-র মুখে। অন্ধকারে দৃশ্যান্তর হত প্রায় আর্তনাদের মতো একটা গানের তানে এবং ভাঙা কাঁচের ঝন্‌ঝনানিতে। আর এই শেষ দৃশ্যে এক অপূর্ব নাট্য ব্যঞ্জনা। ছোট টেবিলে জড়ো করা পাথরের টুকরো, জানলার কাঁচ ভাঙার টুকরো যেন সাজানো। ডা. গুহই সাজিয়েছেন। যেন কমপ্যাক্ট মেজরিটির দান হিসাবে সাজিয়ে রাখা। তার ওপরেই — বোর্ড অব্ ডাইরেকটর-এর বরখাস্তের চিঠিটা যখন আসে সেটাও নিঃশব্দে রেখে দেন ডা. গুহ। এই তো সেই নাটকের কাব্য সৃষ্টি ও প্রকাশ। শুধু সংলাপে কাব্য নয়। নাট্যক্রিয়াতেও সেই কাব্য! এই দৃশ্যের শেষে উচ্চগ্রামে, 'স্ট্রাইক্ স্ট্রাইক দ্য টেন্ট' — এই বাক্যের উচ্চারণে যেন সেতারের প্রবল ঝালা। অসাধারণ সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের পাঁচটি নাটক এবং ইবসেনের দুটি নাটক করার অভিজ্ঞতা নিয়েই তিনি আড়াই হাজার বছর আগের লেখা সোফোক্লেসের গ্রীক্ নাটক রাজা অয়দিপাউস করলেন ১৯৬৪ সালে। বল্লালসেনি দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে এ নাটকেরও নিন্দাবাদ হয়েছে। 'বাঙালি নাটক নয়' — 'ভারতীয় সংস্কৃতি বিরোধী' — এসব অভিযোগ উঠেছিল। 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র' অভিনয়ের সময় থেকেই মানুষের পূর্ণ আত্মবিকাশ, অধিকার ও আত্মমর্যাদাবোধের প্রশ্ন ও প্রত্যয় জেগেছে তাঁর নাটকে। সত্য মর্মান্তিক হলেও তাকে প্রকাশ করতেই হয় এমন এক বোধের প্রকাশ দেখা গেল এই নাটকে। মর্মান্তিক সত্য উদ্‌ঘাটনের এ-নাটক।

'আধুনিক মঞ্চ অনুযায়ী' অনুবাদ করেছিলেন সোফোক্লেসের এই নাটক শম্ভু মিত্র নিজে। সুমিতি এবং সংহতি অব্যাহত রেখে এ প্রযোজনার গতিকে ক্ষিপ্র করে তুলেছিলেন। দেড় ঘন্টার নাটক কিন্তু মনে হত যেন রুদ্ধশ্বাস অনন্তকাল। যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ নাটকের সমালোচনা করেছিলেন শ্রীনিরপেক্ষ (অমিতাভ চৌধুরী); জানিয়েছিলেন সে অভিনয়ের দর্শকপ্রতিক্রিয়া :

'সময়ের দূরশ্রুত হাহাকার সমস্ত রাজকীয় দম্ভকে ছাপিয়ে ঈডিপাসের প্রাসাদের রক্তিম স্তম্ভ চূড়ায় যেন ক্ষণকালের জন্য

আবদ্ধ হয়েছিল এবং নাটকের চরম সর্বনাশের মুহূর্তে হতবল, হৃততেজ অন্ধ ঈডিপাস যখন শেষবারের মত এই প্রাসাদ গহ্বরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন—শম্ভু মিত্রের স্মরণীয় অভিনয় নৈপুণ্যে সেই বিষাদ গম্ভীর পরিণতি সমস্ত প্রেক্ষাগৃহকে অশ্রুতে, বিস্ময়ে নির্বাক করে দিয়ে গেল।'

সমস্ত প্রযোজনায় এই পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেত—অভিনয়, আলো, মঞ্চ, পোষাক, অভিনেতাদের বিন্যাস ও কণ্ঠস্বর। স্বরের ঐকতান একটা সাঙ্গীতিক গঠনে বেঁধে ছিলেন শম্ভু মিত্র। সমবেত আকুল আবেদন দিয়ে শুরু হত নাটক, শেষ হত একক আর্তিতে, 'আমাকে আমার সম্পূর্ণতার পথে নিয়ে চল'। অন্ধ মানুষটি তখন হাতড়াতে হাতড়াতে, হামাগুড়ি দিয়ে যখন সিড়ির মাথায় তখন থামের মাঝখানে সোজা হয়ে একবার দাঁড়িয়ে দু-হাত উর্ধ্বে তুলে, যেন সূর্যবংশের প্রতীক যে 'সূর্য' মঞ্চ সজ্জার অঙ্গ হিসাবে লাগানো থাকত, সেটাকে ছুঁতে চেষ্টা করতেন—সুতীব্র স্বরে—'আপোল্লন' বলে আর্তনাদ করে শরীর ছেড়ে দিয়ে—ভেতরে মিলিয়ে যেতেন। এ যেন অন্ধকারকে চিনে নেওয়ার অভিযাত্রা। নাটকের শেষে নিজের হাতে চোখের আলোকে সে নিভিয়ে দেয়। অজান্তে সে মায়ের শয্যাকে যে কলুষিত করেছে! প্রবলবুদ্ধি অয়দিপাউস যখন আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন মুহূর্তে 'আলো, আলো' —বলে আর্তিপ্রকাশ করে, —অন্দর মহলে রানি য়োকাস্তে তখন গলায় রজ্জু দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তার সন্তানরা অভিশপ্ত। চোখের আলো নিভিয়ে দিয়ে হতভাগ্য অয়দিপাউস অন্ধকারের মধ্যেও বুঝি, কোনও প্রশান্তির অভিজ্ঞান পেয়েছিল, কোনও প্রসন্নতার আশীর্বাদ। এ যে অপাবৃত্ত সত্যের প্রকাশ। সেই প্রকাশের আয়োজন শুরু হত মেষপালকের আগমনের পর থেকে। মেষপালকের সঙ্গে রাজা অয়দিপাউসের কথোপকথন দৃশ্যের অভিনয়—শুধু—প্রশ্নের পর প্রশ্ন। প্রশ্ন এবং উত্তর সবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু একটু একটু করে লয় বেড়ে যেত। প্রচণ্ড নাটকীয়, অবশেষে বিস্ফোরণ এবং প্রশ্নোত্তরের ধাপে ধাপে আরোহণ আমাদের নিয়ে যেত নাটকের তুঙ্গ মুহূর্তে। হতভাগ্য অয়দিপাউস আর্তনাদ করে উঠত। কিন্তু এ আর্তনাদের স্বর অন্য। আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন সম্পূর্ণ হল। মেষপালকের শেষ উত্তরে—যে আশঙ্কাটা মনে জেগেছিল তা সত্য হল। শম্ভু মিত্র মেষপালককে ছেড়ে দিয়ে কেমন স্তব্ধ হয়ে যেতেন তখন। আয়ত চোখে আর যেন দীপ্তি নেই। তারপর চাপা গলায় 'সব সত্য হল। আলো-আলো! আমার জন্ম অভিশপ্ত, আমার প্রেম অভিশপ্ত, আমার কর্ম অভিশপ্ত। আপোল্লন! আমি একবার শেষবারের মত তোমাকে দেখি'—এই বলে প্রাসাদ অভ্যন্তরে চলে যেতেন। এ অভিনয় তো স্মরণীয় পরীক্ষা নয়,—এ যে সৃষ্টি! সযত্ন শিল্পনির্মাণ সাধনার উজ্জ্বল প্রমাণ।

শম্ভু মিত্রের প্রযোজনার ঐশ্বর্য, অভিনয়ের ঐশ্বর্য নিয়ে কোনও বিতণ্ডা ছিল না। উচ্চ মানের জন্য বরাবরই সমাদৃত। কিন্তু সমালোচিত হয়েছে তাঁর কিছু নাটকের বিষয়বস্তু, ওই সব নাটক অভিনয় করার ঔচিত্য। তার মধ্যে চার অধ্যায়, দশচক্র ও রাজা অয়দিপাউস, এক বিশেষ মহলের কাছে, বিষয়বস্তু তেমনই আবার তার সূক্ষ্মতা নিয়ে, কাব্যগুণ নিয়ে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। তিনি গড্ডল প্রবাহে গা ভাসাতে পারেননি এইটাই তাঁর অপরাধ। কিন্তু যায় আসেনি তাতে মানুষটির। তিনি তাঁর জ্ঞান, বিশ্বাস এবং প্রত্যয় নিয়েই কাজ করে গেছেন। ব্যক্তিমানুষ, সামাজিক মানুষ, মানুষের চৈতন্যের জাগরণের কথা, এ সব নিয়েই এবং তাঁর সময়কে নিয়ে, তিনি যে-নাট্যপ্রযোজনার মধ্যে শিল্প সৃষ্টি করতে চেয়েছেন—তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল সামগ্রিক নাট্যসৃজন। সে সৃজনে একটা ঐকতান সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন নাটকের মধ্যে কোনও কথাই ভাল করে বলা যায় না যদি না প্রকাশটা নান্দনিক তাৎপর্য পায়। আর এই নান্দনিক তাৎপর্যের কথাটাই সব চেয়ে ব্যঙ্গের বলে মনে হয়েছিল কিছু মানুষের। আশ্চর্য! তিনি সতর্ক থাকতে গিয়েই কখনও কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চেয়েছেন। সেই বিচ্ছিন্নতা নাটকের পরিসর বাড়াবার, নতুন পথ তৈরি করতে মনঃসংযোগের জন্যেই দরকার ছিল। সুন্দর এবং সত্য হোক নাট্য; তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল মাটির সঙ্গে সংযোগ রেখেই আধুনিক থেকে ধ্রুপদী নাট্যচর্চা হোক এই দেশে। উত্তেজনা নয়, উদ্বোধনই তাঁর অম্বিষ্ট ছিল নাট্যের ক্ষেত্রে। তাঁর নির্মাণ ও সৃষ্টির মধ্যে আমরা এই পরম্পরা লক্ষ করি যা সঙ্গতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ। আর এই বিরল গুণেই তিনি বড় মাপের শিল্পী—বিশালতাই যাঁর পরিমাপ। □

পারিবারিক জীবনের মনোবিজ্ঞানী আশাপূর্ণা দেবী

হানা প্রাইনহেলত্রোভা

আশাপূর্ণা দেবীর পুরো রচনার একটি বিষয় হল পরিবার। পারিবারিক সমস্ত সম্পর্কের প্রতিই তিনি নজর দেন। সমস্ত ধরনের সম্পর্কগুলিই তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর জীবন তাঁকে বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ খুম কম দিয়েছিল। তিনি কিন্তু এই ত্রুটি দূর করেছেন নিজের কৌশলে। পারিবারিক ক্ষুদ্রজগৎ তিনি তাঁর মনস্তাত্ত্বিক অণুবীক্ষণের মধ্য দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন যেমন একজন জ্যোতির্বিদ দূরবীক্ষণে মহাজগত দেখেন। আর আশাপূর্ণা আবিষ্কার করেন যে পরিবারের জীবন আর নিখিল জগতের জীবন একই নিয়মকানুন অনুসরণ করে। অন্য কথায় পরিবার সমাজের একটা দর্পণ। আবিষ্কারটি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের থেকে আমার মতে কম নয়।

আশাপূর্ণার রচনায় পারিবারিক জীবনের কোনও অংশ বাদ দেওয়া হয়নি। পরিবারের তুচ্ছতম সদস্যের তুচ্ছতম মানসিক অনুভূতি পর্যন্ত অবহেলিত হয়নি। সীমিত জায়গার জন্য এই বৈচিত্র্যের মধ্যে আমি শুধু একটা বিষয় বেছে নিয়েছি। বিষয়টা হল পিতা আর পুত্র-প্রজন্মের মধ্যে সংঘর্ষ অর্থাৎ বয়সের পার্থক্যের সংকট। এই সমস্যা আশাপূর্ণা অনেক গল্পেই তোলেন। আমি উদাহরণ হিসাবে শুধু কয়েকটা গল্প উল্লেখ করব।

প্রথম গল্পটি হল 'নিবারণচন্দ্রের শেষকৃত্য'। গল্পটি যে-পরিবার নিয়ে সে-পরিবার এখনকার বাংলায় খুব কম দেখা যায়। এটা একটা বিরাট যৌথ পরিবার যেখানে একসঙ্গে চার পুরষের বাস।

আশাপূর্ণার অধিকাংশ গল্পের মতো এই গল্পেও কাহিনী প্রধান ভূমিকা নেয় না। এমনকী বলা যায় যে কাহিনী বলে কিছু নেই। পুরো গল্প এক দৃশ্যে সমাপ্ত। যা দৃশ্যটার আগে ঘটেছে তা অতীতবীক্ষণরূপে বিবৃত। আগেকার ঘটনা আসলে একটাই : যৌথ পরিবারের ছিয়ানব্বই বছরের বুড়ো কর্তা মারা গেলেন। 'কর্তা' অবশ্য তিনি ছিলেন শুধু নামেমাত্র। পরিবারের বিরাট বাড়ির দূরবর্তী একটা কোণে তিনি তাঁর শেষ বছরগুলি নিঃসঙ্গতায় কাটিয়েছিলেন শুধু স্ত্রীর সেবা নিয়ে। পরিবার চালানোর দায়িত্ব আর অধিকার তাঁর পুত্র আর নাতিরা নিয়ে নিয়েছে। যদিও বৃদ্ধ তাঁর বেঁচে থাকার শেষ সময়ে অবহেলিত ছিলেন, তাঁর মৃত্যুর অনুষ্ঠান আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করা হয়েছে পরিবারের মর্যাদা আর সমৃদ্ধি দেখানোর সুযোগ হিসাবে।

গল্পের কেন্দ্রীয় দৃশ্য হল স্বজন-আত্মীয়দের বিরাট সমাবেশ, যেখানে ঠিক করা হচ্ছে নিয়মভঙ্গের ভোজে কী কী খাওয়ানো হবে। নানাবিধ ভরপেট আর ব্যয়বহুল খাবারের প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে যে গুলোতে নাকি মৃতের আত্মা সন্তুষ্ট হবে। যার আসল উদ্দেশ্য কিন্তু নিমন্ত্রিতদের বিস্মিত করা। বৃদ্ধের পছন্দ মতো খাবার নিয়ে আলোচনা যখন প্রায় তামাসার সীমায় পৌঁছায় তখন হঠাৎ তাঁর বিধবা স্ত্রী হেমাঙ্গিনী ঘরে ঢুকে একটা অনুরোধ জানান। বৃদ্ধের নাকি অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল ভাল আঙুর খেতে। তাই ভোজের মেনুতে আঙুর ঢোকালে তাতেই তাঁর আত্মা তৃপ্তি পাবে।

সব উপস্থিত নাতি-পুত্রদের মনে অনুরোধটা লজ্জার আঘাত হানে। বৃদ্ধকে তারা যে অনেকদিন অবহেলা করত তা যেন বিধবার কথায় প্রকাশ পায়। আঙুরের মতো নগণ্য স্বাদও কেন এই বাড়িতে তাঁকে দেওয়া হয়নি? তাদের অনুতাপ আর বিবেক-দংশনের অনুভূতি বুড়ি বিধবার বিরুদ্ধে ঘুরে যায়। এরকম লজ্জার কথা বলছেন কেন? লজ্জার কথা বলাই তো লজ্জা। বিনীত আর বিষণ্ণচিত্ত সদ্যবিধবা অল্পবয়স্ক আত্মীয়দের এই আক্রমণে হঠাৎ নিজের ইজ্জতকে ফেরত পান। মাথা উঁচু করে বিদ্রূপভরা উত্তর দেন। তোদেরও তাই মনে হত? আমিও যে

ভাবছি এই কথা। উজ্জ্বলকুমার মজুমদারের ভূমিকায় গল্পটির উপর শেষ মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে ঠিক: 'হেমাঙ্গিনীর এই তির্যক বিদ্রূপ আসলে দ্রুত ব্যস্ত নতুন কালের নিষ্ঠুর ঔদাসীন্যের প্রতি বিচ্ছিন্ন ধীর মৃত্যুমুখী বার্ধক্যের বিদ্রূপ—যে নতুনকালে মৃত্যু যথাসময়ে না এলে তার মর্যাদা হারায়। [বাছাই, ভূমিকা, ৩]

পুরো গল্প আর বিশেষত তার চরম মুহূর্ত পাঠকের ওপর অসাধারণ প্রভাব রাখে। আমরা এখন একটু দেখব এই গভীর প্রভাবটি কি কি শিল্পপদ্ধতির মাধ্যমে লেখিকা অর্জন করেছেন।

গল্পের গঠন আশ্চর্যভাবে সংক্ষিপ্ত, তার ক্লাইম্যাক্স অপ্রত্যাশিত আর চমকপ্রদ। Shakespearian বা প্রচীন গ্রীক নাটকের সঙ্গে সাদৃশ্য দেখা যায় স্থানের আর সময়ের ঐক্যে আর আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে সংকটে (King Lear, Oresteia-তে যেমন)। পুরো গঠনটাই নাটকের মতন। চরিত্রের বা পরিবেশের বিস্তারিত সাহিত্যিক বিবরণ এখানে অনুপস্থিত। হেমাঙ্গিনী হলেন একটিমাত্র চরিত্র যাঁর চেহারা আর পোশাকের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কারণ তাঁর চেহারা আর পোশাকের পরিবর্তন তাঁর ভাগ্যের প্রতিফলন।

হেমাঙ্গিনীর প্রথম আবির্ভাব গল্পের মাঝখানেই। তাও খুব নাটকীয়ভাবে; নিয়মভঙ্গের খাওয়া-দাওয়ার উত্তেজনাপূর্ণ আলোচনার মাঝখানে, যখন আলোচনাটা প্রায় মজার রূপ নেয়। নতুন বিধবার প্রবেশে সব হইচই হঠাৎ থেমে যায়। এই নিস্তব্ধতা হল একটা মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের আগেকার নিস্তব্ধতা যেখানে একদিকে বাড়ির সবাই—উলটোদিকে একা হেমাঙ্গিনী, একমাত্র লোক যাঁকে নিবারণের মৃত্যু সত্যি আঘাত দিয়েছে। এই দলের বৈষম্য আর হইচই-নিস্তব্ধতার বিরোধিতা অতি লক্ষণীয়।

'...এক ভাগ্নে... হঠাৎ বলে বসল, তোমাদের সব সাহেব-সুবো বন্ধু-বান্ধব তো আসবে। কিছু স্কচ হুইস্কি আনব আমি। ...আমার চাকরির উন্নতিতে ওই স্কচ-হুইস্কির একটি অবদান ছিল। মামা নিজে তো একটু আধটু ইয়ে করতেন। একবার এক সাহেব বন্ধুর সঙ্গে—মানে তখন তো বৃটিশ আমল। বেশ জমজমাটই আমল, মামার সেই সাহেব বন্ধু—

মস্ত একটা গল্প ফাঁদতে বসছিল বোধ হয় সে। হঠাৎ বিঘ্ন ঘটল, সভা ক্ষেত্রে একটা ছায়ামূর্তির আবির্ভাব। সকলেই প্রায় চমকে উঠল।

এই কঙ্কালসার প্রেতাত্মাটি আবার বাড়ির কোনখানে অবস্থান করছিল?

নিবারণের এক নাতনী নীচু গলায় বলল, সাজে মানুষকে কি বদলেই দেয়। এই তো কিছুদিন আগেও দিদিমাকে দেখে গেছি। তখন তিরাশী বছর বয়স। রোগা একখাবলা মানুষ। তবু বড় সিঁদুরের টিপে চওড়া পাড় শাড়িতে, একগোছা চুড়িতে কি ঝলঝলেই দেখিয়েছে। আর এখন দেখ—কে বলবে সেই মানুষ। রঙটা সুদ্ধ কালিঝুল হয়ে গেছে।' [বাছাই, ১২]

বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে হেমাঙ্গিনীর বিবরণ লেখিকা নিজে দেন না। গল্পের জন্য চরিত্ররাই দেয়। তাও নাটকের মতন।

পরবর্তী প্রজন্মের কড়া স্বভাবের বর্ণনাও দেওয়া হয় তাদের নিজের উক্তির মাধ্যমে:

'থান-পরা হেমাঙ্গিনীকে দেখে ওদের এই প্রথম মনে পড়ল মাও বুড়ো হয়েছেন। তবু মেজ নাতি বলে উঠল আচ্ছা ঠাকুমা একেবারে এই বিছানার চাদরটা কি না পরলেই চলে না? আজকাল তো বাবা সকলেই দেখি শাড়ি-ফাড়ি চুড়ি-টুড়ি পরে। হেমাঙ্গিনী এ কথার উত্তর দেন না। শুধু তার দিকে একবার তাকিয়ে দেখে বলেন, যা বলতে এসেছিলাম—একটু থামলেন। তারপর বেশ স্থির স্বরেই বললেন...' [বাছাই, ১৩–১৪]

এখানে নায়িকার চরিত্রবৈশিষ্ট্য দেওয়া হয়। কিন্তু তাঁর ব্যবহারের মাধ্যমে। পাঠকের চোখের সামনে নাটকের মতন একটা দৃশ্য ওঠে যাতে একসঙ্গে হেমাঙ্গিনীর অসহায়তা আর মর্যাদাবোধও প্রতিফলিত।

লেখিকা যেভাবে তাঁর চরিত্রের বিবরণ দিয়েছেন তাতে পাঠকের কোনও সন্দেহ থাকে না কোন দিকে তাঁর মানসিক সমর্থন। তবু পিতা-পুত্র প্রজন্মের দ্বন্দ্ব তাঁর গল্পে সাদাকালো ভাবে আঁকা নয়। বিদ্বেষভাবাপন্ন ভাবেও দেখানো নয়। এই বিশাল পরিবারের সব সদস্যরা তাদের কর্তব্য পালন করে আর সকলেরই খানিকটা করে নিজের সত্য আছে। তাদের প্রজন্মের সত্য। সাধারণত তারা তাদের পারিবারিক একতাও অনুভব করে। শুধু দৈনন্দিন কষ্টকর জীবনযাপনের মধ্যে তারা মাঝে মাঝে পরস্পরের প্রতি কিছু অন্যায় করে। পরস্পরের কষ্ট আর দুঃখ অবহেলা করে। সেটা কিন্তু সচেতন পাপ নয় আর লেখিকা তাকে পাপই বলেন না।

ঠিক এইভাবে তাঁর চরিত্রের ব্যবহার আশাপূর্ণা বিচার করেন 'রিফিল ফুরিয়ে যাওয়া ডটপেন' গল্পটিতে। এই গল্পের যৌথ পরিবার আজকালকার মাপের। একসঙ্গে থাকেন শুধু বিধবা ঠাকুমা, তাঁর দুই ছেলে, তাদের বউ ও দুই নাতি।

এই গল্পও আসলে একটা ছোট নাটক। দুঃখদায়ক আগের গল্পের তুলনায় এই গল্পটা কিন্তু হাস্যরসের সীমানা স্পর্শ করে। তবু যে এটা একটা কমেডি তা একদম বলা যায় না। আশাপূর্ণার সাহিত্য-শিল্পের গুণ এই যে জীবনের হাস্যকর আর দুঃখদায়ক দিক আলাদা করেন না। জীবন নিজে যেমন করে না।

কাহিনী মজার, সাধারণ একটা সকালে জানা গেছে যে ঠাকুরমা বাড়িতে নেই। যদিও এই সময় তিনি কখনও বেরোন না। সমস্ত খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হয়। সবার চিন্তা বেড়ে যায় যখন

নাতি একটুকরো কাগজ বার করে যেখানে ঠাকুমার হাতে লেখা আছে তিনি চলে যাচ্ছেন। কেন আর কোথায় কিন্তু লেখা নেই কারণ তাঁর ডট-পেনের রিফিল ফুরিয়ে গেছে। সবাই তখন ঠাকুমার চলে যাওয়ার কারণ আর উদ্দেশ্য খুঁজতে শুরু করে। কারো কারো কল্পনায় আত্মহত্যার ধারণাও ওঠে। বিশৃঙ্খলা যখন চূড়ান্তে উঠছে তখন হঠাৎ ঠাকুমার আবির্ভাব। সন্তুষ্ট গলায় তিনি জানাচ্ছেন যে দক্ষিণেশ্বরে গিয়েছিলেন, যা তাঁর অনেকদিনের ইচ্ছা ছিল।

প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গল্পটা উত্তেজনায় ভরা। তার কারণ শুধু গল্পের মোড় নয়। প্রধান কারণ হল গল্পের নায়িকার গঠন। চরিত্রটি আসলে একটা হেঁয়ালি। তিনি কীরকম মানুষ সোজা বলা হয় না। তাঁর স্বভাব আন্দাজ করা যায় শুধু অন্য চরিত্রের উক্তির মাধ্যমে। তাদের বিচার কিন্তু পরস্পরবিরোধী। ছেলেদের বউ-এর মতে ঠাকুমা ধাপ্পাবাজ, কলহপ্রিয়াবুড়ি, তিনি সবসময় সংসারের খুঁত ধরেন। নাতিদের চোখে তিনি একজন অপ্রয়োজনীয় সেকেলে মানুষ। যিনি ভাল মন্দ বোঝেন না। ছোট ছেলের কাছে মায়ের ছবির প্রকাশ তার ছেলেবেলায় যখন মা ছিলেন সুন্দরী, মমতাময়ী, তাদের জন্য সর্বত্যাগী, সবসময় হাসিখুশি মহিলা যাঁর কোলে তারা সারা দুনিয়ার বিপদ থেকে আশ্রয় পেত। অন্যদিকে বড় ছেলে মায়ের সাম্প্রতিক স্মৃতি মনে আনে একটু লজ্জার সঙ্গে। শেষ বছরগুলির মধ্যে মায়ের [illegible] ওর মধ্যে অস্বস্তি জাগাত কারণ তাঁকে নিয়ে প্রায়ই বাড়িতে ঝগড়া বাধত।

ইউরোপীয় পাঠকের মধ্যে ঠাকুমার সম্বন্ধে আরও একটা ধারণা হতে পারে। যদিও ধারণাটা ভুল: মহিলাটি অস্বাভাবিকভাবে ধার্মিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পূজার ঘরে কাটান, সমাধিস্থ হয়ে যান। নিজের জন্য আলাদা রান্না পর্যন্ত করেন। হিন্দুরা অবিশ্যি তার কারণ ঠিকই বোঝেন—ঠাকুমা বিধবা, যা করেন তা করাই উচিত।

যাই হোক, গল্পের মূল রহস্য শুধু এই নয় ঠাকুমা কোথায় গেলেন। ঠাকুমা মানুষটি কেমন সেটাই হয়ত সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। স্বস্তিকর সমাপ্তিতে দুটো প্রশ্নেরই সমাধান হয়। ঠাকুমা কোনও কাল্পনিক করুণরসের নায়িকা নন। আর দশটা সাধারণ মহিলার মতোই তিনি সাধারণ মানুষ যার চরিত্র, এমনকী ভাগ্যও সাধারণ। লেখিকার শিল্পের সার্থকতা এইখানে যে দুটো রহস্যের এই সমাধান আসলে কোনও সমাধান নয়। ঠাকুমার নিরুদ্দেশ হওয়ার কারণ জেনে নেওয়ার পরেই পাঠক আবার তার দুটো ব্যাখ্যা পায়। নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়ে তিনি বাড়িতে সবাইকে ভয় পাইয়ে দিতে চেয়েছিলেন ও সবাইকে লজ্জায় ফেলতে চেয়েছিলেন। যেমন বউদের মতামত বা কাউকে কিছু না বলে ওঁর চলে যাওয়ার কারণটা হল যে ওঁর ভয় বাড়ির লোকে ওঁকে যেতে দেবে না। যেমন ছেলেরা ভাবে এই দুটো প্রশ্নের আর উত্তর দেওয়া হয় না। সেটাই লেখিকার গুণ।

পাঠকের পক্ষে অনুভব করা খুবই স্বাভাবিক যে এই ঘটনার পরেও পরিবারের জীবনে আর তার সম্পর্কগুলিতে কোনও পরিবর্তন ঘটবে না। প্রতিটি কাজ, প্রতিটি বাক্য বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারিত হবে, বাড়িতে আবার ছোটখাটো কারণে মনকষাকষি উঠবে। যে যে-ভাবে মাকে দেখছে মায়ের সেই রূপটা তার পক্ষে সত্যি। তেমনই বলা যায় পরিবারের প্রত্যেক সদস্যের ঠিক ততগুলি রূপ হবে যত চোখের জোড়া তাকে দেখবে। আগের গল্পেও মৃত নিবারণচন্দ্রের রূপ নির্দিষ্টভাবে আঁকা নয়। তিনি কি অবহেলিত অভাগা ছিলেন যেমন তাঁকে হেমাঙ্গিনী দেখেন বা শৌখিন কড়া শাসক যেমন তার ছেলেরা মনে করে বা বদান্য সুহৃদ। যেমন তিনি বোনঝিদের স্মৃতিতে রয়েছেন? লেখিকার এই বহুরূপী বিবরণে তাঁর প্রত্যেক গল্পের নায়ক পাঠকের চোখের সামনে অনেক বাস্তবিকরূপে আবির্ভূত হয়।

আশাপূর্ণার চরিত্রগুলির আপেক্ষিক বিচার মাঝে মাঝে এত গভীরে যায় যে বোঝা কঠিন কার দিকে লেখিকার আন্তরিক সমর্থন। যেমন 'নিজের জন্য শোক' গল্পে।

অবিনাশ নামে একজন ষাট বছরের বৃদ্ধের ঘুম মাঝরাতে হঠাৎ ভেঙে যায় একটা অসহ্য অস্বস্তির অনুভূতিতে। তাঁর মনে হয় পক্ষাঘাত হয়েছে। ডেকে আনা সমস্ত পরিবারের মাঝখানে অনুভূতিটা কেটে যায়। সবাই তখন নিজের বিছানায় ফেরে অবিনাশকে আবার একা রেখে। তাদের সহানুভূতি আর ভালবাসা অবিনাশকে যত আরাম দিয়েছে তত আঘাত দিয়েছে তাদের আবার শীঘ্র চলে যাওয়া। অভিমানী অবিনাশ প্রার্থনা করেন অসুখের নতুন আক্রমণ এসে তাদের দেখাক যে তাদের অবহেলা তাঁকে হত্যা করেছে।

লেখিকার এই গল্প বিছানায় শায়িত এক মানুষের সঠিক মনঃস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ। যেন একজন মনোবিশেষজ্ঞর করা। মনোবিশেষজ্ঞ হিসাবে লেখিকা অগ্রসর হয়েছেন আগের দিনে মানুষটি কি করেছিলেন পুনরালোচনা করে। রাত্রিবেলায় অসুখের আঘাতের পরবর্তী তাঁর অনুভূতির বিরোধপূর্ণ ক্রমবিকাশ বর্ণনা করে মৃত্যুর আশঙ্কা থেকে মৃত্যুর কামনা পর্যন্ত। গল্পের সমাপ্তি কাহিনীমূলক নয়, মনস্তাত্ত্বিক। লেখিকার রচনায় এরকম প্রায় দেখা যায়।

অবিনাশের চরিত্র আবার অন্তত দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা যায়।

হালকা মনের পাঠকেরা হয়ত লেখিকার আপাত বিদ্রূপটি গ্রহণ করবে কারণ সেটাই প্রথমে চোখে পড়ে। তারা অবিনাশকে একজন আত্মকেন্দ্রী অহংকারী মনে করবে যার যত চিন্তা নিজেকে নিয়ে। এই ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষত ইউরোপীয় পাঠকরা গ্রহণ

করতে পারে, সেখানেই বিপদ। তাদের কাছে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক যে অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ একটু একঘরে হয়ে থাকে। সনাতনি হিন্দু পরিবারে কিন্তু সেটা স্বাভাবিক নয়। ষাট বছর বয়সের বৃদ্ধের যদি শরীরের সামর্থ্য থাকে তাহলে এই বয়সেও উনি পরিবারের প্রধান হয়ে থাকতে পারেন।

'নিজের জন্য শোক' গল্পটা কিন্তু সনাতনি হিন্দু পরিবারের গল্প নয়। পুত্ররা আর তাদের স্ত্রীরাও আধুনিকভাবে শিক্ষিত ও সেইভাবে তারা তাদের জীবন গড়ে তুলতে চায়। পরিবারের সংগঠন তারাই ঠিক করে কারণ পরিবারের মধ্যে তারাই সক্রিয় তারাই বেশি পয়সা উপার্জন করে। তাদের এই আধুনিকভাবে সংগঠিত সংসার অবিনাশের প্রাপ্য অধিকারগুলি অবহেলা করে। নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে-ঘরে থাকতেন সে-ঘর থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। যেভাবে তিনি নাতি-নাতিনিদের মানুষ করতে চান তার থেকে অন্যভাবে তাদের পালন করা হয়। যে-খাদ্য তিনি সারা জীবন খেতেন, খেতে অভ্যস্ত, খেতে ভালবাসেন সে-খাদ্য এখন অখাদ্য হয়ে গেল, তা বাড়ির কেউ ছুঁতেও চায় না।

আগের গল্পগুলিতে যেমন এখানেও অবশ্যি পিতা-পুত্র সম্পর্কের মধ্যে শত্রুতা নেই। দুই পক্ষ পরস্পরকে ভালবাসে। বাবা যথা উচিত ভালবাসা পান। তবু যে সম্মানের প্রতীক্ষায় তিনি সারা জীবন কাটিয়েছেন সেই সম্মান থেকে আধুনিককাল তাঁকে বঞ্চিত করে। সংসারে যা ঠিক করবার তাঁর ছেলেরাই ঠিক করে। এমনকী যেসব কাজ করবার আছে তাও অন্য কেউ অন্যভাবে করে। অবিনাশ যা করতে চান তা অবশ্যি কেউ বাধা দেয় না। তবু সবাই স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে যে অবিনাশের কাজ অপ্রয়োজনীয়। তাঁর উপদেশ, তাঁর সারা জীবনের অভিজ্ঞতা তাদের কোনও কাজে লাগে না। যা তিনি এখন করেন তা নিজের খেয়ালের জন্যই করেন। বাড়ির কারুর তাতে কোনও লাভ নেই।

নিজের অপ্রয়োজনীয়তা, নিজের ব্যর্থতার অনুভব হল অবিনাশের জীবনের এই পর্যায়ের প্রধান অনুভূতি। বার্ধক্যের প্রত্যাশিত মর্যাদা তিনি পাননি, জীবন তার শেষ ভাগে অবিনাশের প্রতি যে অন্যায় করে বসল সেই অন্যায়ের জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। এই দিক থেকে অবিনাশের অবস্থা বিচার করে মনে হবে না কোনও একজন হাস্যকর দুঃখিতচিত্ত ভীতু মানুষ, বরং নতুন সামাজিক পরিবর্তনের বলি, যার প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা উচিত।

আশাপূর্ণার নায়িকারা ভাগ্যের পরিবর্তনগুলির সঙ্গে বেশির ভাগই সহজে খাপ খাইয়ে নেয়। বিশেষ করে সনাতনি পারিবারিক সংগঠন থেকে আধুনিক ব্যবস্থায় তারা অনায়াসে পার হতে পারে। পুরুষদের থেকে অনেক সহজেই। সেইজন্যই তাদের কষ্ট তাদের স্বামীদের তুলনায় কম। তার কারণ বোধ হয় হিন্দু সমাজ মহিলাদের কাছ থেকে খাপখাওয়ানোর কর্তব্য সবসময়েই দাবি করে থাকে। তাই ওরা চিরদিনই নিজেকে সমর্পণ করতে অভ্যস্ত। আধুনিক পরিবারেও ঠাকুমা দিদিমারা নিজেদের জায়গা করে নেয়। নিজেকে উপযোগী করতে পারে। কিন্তু তাদের স্বামীরা ঠিক সেই অবস্থায় খাপখাওয়ানোর অক্ষমতা আর নিজের অহংকারের জন্য প্রায়ই কষ্ট পায়।

এটা আমরা 'নিজের জন্য শোক' গল্পে দেখেছি। অবিনাশের স্ত্রী অবিনাশের জন্য সনাতনি খাদ্য রান্না করেন। কিন্তু বাচ্চাদের জন্য তাদের নিজেদের পছন্দ মতো খাদ্য তৈরি করেন ও তাদের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গেই খান। বিনা বাক্যব্যয়ে স্বামীর খাট ছেড়ে নাতনিদের সঙ্গে শুতে যান। নিজের সম্মানহানির জন্য কান্নাকাটি করেন না।

'স্বর্গের বারান্দায় উঠে' গল্পের নায়িকা ঠিক এই ধরনের। এখানেও আধুনিক মাপের যৌথ পরিবার: ঠাকুরদা, ঠাকুমা, তাদের ছেলে, বউ আর বাচ্চাদের সঙ্গে আর একজন অবিবাহিতা মেয়ে। পরিবেশও অতি আধুনিক: বহুতল শীততাপনিয়ন্ত্রিত বাড়ির উপর তলার বাসা। পুরনো কলকাতার ওদের বাড়ি ছেড়ে আসার পরেই ঠাকুমা নতুন বাড়ির সব সুবিধা উপভোগ করতে সমর্থ, আধুনিক সব সরঞ্জাম ব্যবহার করতে শিখে ফেলেন। ওঁর স্বামী কিন্তু নতুন অবস্থায় নিজেকে এত শিকড়বিহীন মনে করেন যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। নতুন জীবনযাপন তাঁর কাছ থেকে যা দাবি করে ঠাকুমা তা পূরণ করেন: ছেলেমেয়েকে আর নাতিনাতনিকে সেবা করেন নিজের মর্যাদার কথা না ভেবে। ঠিক যেমন ইউরোপের মেয়েরা করে। অপরপক্ষে ওঁর স্বামীর মনে লাগে যে ছেলের বউ শ্বাশুড়ির সেবা করে না। হিন্দু প্রথা অনুসারে যা করা উচিত।

এই গল্পেও লেখিকা কোনও পক্ষের পক্ষপাতী নন। তিনি নতুন যুগের পরিবার আর সনাতনি পরিবারের ঠাকুরদার আদর্শ পাশাপাশি বসিয়ে কোনওটার প্রচার না করে দুটোরই সুবিধা আর অসুবিধা দেখান আর বিনা পক্ষপাতিত্বে বিবরণ দেন। মেয়েদের খাপখাওয়ানোর সামর্থ্য আর ছেলেদের পুরাতনি মনোভাব লেখিকার প্রচার নয়। এটা বাস্তব।

এই বাস্তবের যে ব্যতিক্রমও হতে পারে তার উদাহরণ লেখিকা দিলেন 'চরিত্রহীন' গল্পে। সেখানে পুরুষই, মৃতদার ঠাকুরদা, পুরাতন নিয়ম ভাঙেন আর নিজের ছেলের বাড়ি ছেড়ে একজন বিধবার সঙ্গে সহবাস করেন কারণ জানেন যে প্রথাগত মর্যাদাহানি ছাড়া তাতে কোনও পাপ নেই। কিন্তু অনেক গুণ আছে: বিধবার জীবন সার্থক করা। নিজের বার্ধক্য সুন্দর করা। যৌথ পরিবারের অনবরত ঝগড়াঝাঁটি থেকে উদ্ধার পাওয়া।

এই গল্পের চরিত্রগুলিও কালোসাদা রঙে আঁকা নয়। লেখিকা পাঠকের উপর ভার দেন কাকে দোষ দেবে আর কাকে সমর্থন করবে। গল্পের সমাপ্তিতে ঠাকুরদার 'পাপ'-এর আলোচনা আস্তে আস্তে থেমে যায় আর বিচারকরা চুপ করে নিজের মনে নিজের জন্য পুরো ব্যাপারটা আর একবার ভেবে দেখে।

আমার মনে হয় যে লেখিকার পুরো রচনার ঠিক সেটাই উদ্দেশ্য: পাঠক অন্য কারুর মতের সামনে মাথা হেঁট না করে নিজের মনের মধ্যে ভেবেচিন্তে নিজেই বিচার করুক এই দুনিয়াতে কোনটা ঠিক আর কোনটা ঠিক নয়।

প্রবন্ধটা সমাপ্ত করার আগে আশাপূর্ণার রচনা আর এক দিক থেকে একটু বিবেচনা করতে চাই। লেখিকার জীবনী পড়ে একটা প্রশ্ন জেগে ওঠে: কোনও বিদেশি ভাষা যে তিনি জানতেন না আর তার ফলে বিদেশি সাহিত্য দিয়ে যে প্রভাবিত ছিলেন না সেটা আশাপূর্ণার লেখার জন্য ভাল না মন্দ?

ইংরেজি জানা সমকালীন বাঙালি লেখিকাদের সঙ্গে আশাপূর্ণাকে তুলনা করতে গেলে আমরা দেখি যে আশাপূর্ণা দেবীর সাহিত্য তাঁদের থেকে কোনও অংশে দুর্বল নয়। ভাষার দিক থেকে তিনি নিজের দেশের সবচেয়ে সুন্দর উৎস ব্যবহার করেছেন। ইংরেজি শব্দ দিয়ে বা ইংরেজি বাক্যগঠন প্রভাবে তাঁর বাংলা বিকৃত নয়। তাঁর জটিল, অলংকারবহুল বাক্যের সমাবেশ রবীন্দ্রনাথের গদ্যের শিল্প মনে করিয়ে দেয় যদিও তাঁর রচনা রবীন্দ্রনাথের অনুকরণ একদম নয়। তাঁর ভাষা বাঙালি নারীর ভাষার সহজাত। সুকুমার সেন নারীর ভাষার যে বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন সেগুলি আশাপূর্ণার ভাষায়ও পাওয়া যায়: অনেক প্রবাদবাক্য, উপকথা, পুরাণ থেকে উপমার সমাবেশ। যেহেতু তিনি কোনওদিন ইংরেজিতে কথা বলেননি সেইহেতু হয়ত তিনি মাতৃভাষার অনুভূতি সামান্যতমও হারাননি। তাঁর চরিত্রগুলির ভাষা তাদের সামাজিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখে। কথোপকথনে বেশির ভাগ শব্দভাণ্ডার পারসি-আরবি যেটা ঘরোয়া বাংলার একটা বিশেষত্ব। লেখিকার নিজের উক্তিতে সুন্দর তৎসম শব্দ পাওয়া যায় যেখানে তাঁর 'বেশি শিক্ষিত' সহলেখিকারা ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করেন।

ভাষার ওপর এই ছোট মন্তব্য আমাদের প্রধান বিষয় থেকে সরে যাওয়া নয়। বিদেশি প্রভাব থেকে আশাপূর্ণার ভাষা যেমন বঞ্চিত তেমনই স্বতন্ত্র তাঁর জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি আর শিল্পগঠন।

আশাপূর্ণা দেবী তাঁর সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টি সমর্পণ করেন সমাজে নারীজাতির সম্মানজনক স্থান অর্জনের চেষ্টায়। তবু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি একপেশে নয়। নতুন ও পুরাতনের ভাল ও মন্দ দুই দিকই বিচার করতে পারেন আর এই বিচার অনেক পুরুষ-লেখকদের থেকে বেশি তীক্ষ্ম ও বিশদতর। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির 'মহিলাপনা' দুদিকেই দেখা যায়। প্রথমটা তিনি পারিবারিক জীবনের সমস্যাগুলির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে পরিচিত বা বরং বলা যায় যে সেই সমস্যাগুলি তাঁর নিজের গায় লেগে রয়েছে। তাঁর তুলনীয় অভিজ্ঞতা পুরুষেরা কখনও পেতে পারে না।

দ্বিতীয় দিকটা হল জীবনের বাস্তব ও প্রাত্যহিক মূল্যায়নের প্রয়াস। আশাপূর্ণা বড় বড় তত্ত্বের অনুসরণকারিণী নন। নিজের মতামত কোনও নির্দিষ্ট তত্ত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন না। সাধারণ মানুষের সাধারণ ভাগ্যের ছোটখাটো ঘটনা দিয়ে তিনি একটা বহুরূপী অসম্পূর্ণ মোজাইক ছবি গড়ে তোলেন। ছবিটা আমাদের এই দুনিয়ার মতোই বিচিত্র আর অসমাপ্ত।

এই বৈচিত্র্যধর্মী বিপরীতরূপী তাৎপর্যের জন্যই আশাপূর্ণা দেবীর রচনা গভীরভাবে সত্য। □

শ্রীমতী হানা প্রাইনহেলত্রোভা বর্তমানে চেকোস্লাভাকিয়ার প্রাগে চালর্স বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগে ভারতবিদ্যা কেন্দ্রে অধ্যাপনারত। নিবন্ধটি সরাসরি বাংলাভাষায় তিনি নিজেই লিখেছেন।

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ : 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর রচয়িতা কে ?

আদিত্য ওহদেদার

অনামা একটি ইংরেজি প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের বলে কথিত হয়ে আসছে। রচনাটি বাংলা সাহিত্য বিষয়ক একটি বিশিষ্ট সমালোচনা। এর আখ্যা—'বেঙ্গলি লিটারেচার'। এটি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে তখনকার বিখ্যাত ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-তে প্রথম প্রকাশিত হয়।[১] তখন ওই পত্রিকায় মুদ্রিত কোনও লেখাতেই লেখকের নাম থাকত না। এই লেখাতেও ছিল না। পত্রিকার ২৩ পৃষ্ঠা (পৃ: ২৯৪–৩১৬) ব্যাপী এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচিত হয় ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হরিমোহন মুখোপাধ্যায়কৃত 'কবিচরিত' গ্রন্থটিকে[২] সামনে রেখে। যদিও উক্ত প্রবন্ধের মধ্যে কোথাও হরিমোহন বা তাঁর গ্রন্থের কোনও উল্লেখ দেখা যায় না। যাই হোক, প্রবন্ধটির বিষয় পরিধি ও উদ্দেশ্য হল তৎকাল পর্যন্ত গড়ে-ওঠা গোটা বাংলা সাহিত্য ও তার একটা সংক্ষিপ্ত সমীক্ষা। তবে এর সিংহভাগ জুড়ে আছে তখনকার খ্যাতনামা বাঙালি লেখকদের সাহিত্যকৃতির পরিচয় ও মূল্যায়ন। এই লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লিখিত হয়েছেন, হুতোম, প্যারীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, দীনবন্ধু মিত্র এবং তিনখানি উপন্যাস লিখে যশশিখরে সদ্য আরূঢ় বঙ্কিমচন্দ্র।

॥ ২ ॥

'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটির উল্লেখ কিম্বা এর থেকে উদ্ধৃতিপ্রদান প্রধানত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র কর্তৃক বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির অবমূল্যায়নের কথা বলতে গিয়ে। যেমন কয়েক বছর আগে, ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্গীয় সাক্ষরতা প্রসার সমিতি প্রকাশিত 'প্রসঙ্গ বিদ্যাসাগর' নামক গ্রন্থে নিবদ্ধ একটি প্রবন্ধের[২ক] এই প্রারম্ভিক উক্তি—'... বলে রাখা ভালো যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকলেও ঈশ্বরচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর সেই 'And beyond translating and primer making Vidyasagar has done nothing'—এই উক্তিকে অগ্রাহ্য করেই এই আলোচনা।' এখানে উদ্ধৃত ইংরেজি বাক্যটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা বলে কথিত ওই 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধ থেকেই গৃহীত।

'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটির রচয়িতা যে বঙ্কিমচন্দ্র, এমন ধারণা সৃষ্টি হবার কারণ জানতে গেলে আমাদের পাঠ করতে হবে ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত একটি পুস্তকের[৩] 'বিজ্ঞাপন' অর্থাৎ ভূমিকা। গুরুত্বপূর্ণ এই 'বিজ্ঞাপন'টি সম্পূর্ণই উদ্ধৃত করছি—

'সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের যে রচনাই পাঠ করা যায় তাহাতেই তাঁহার অসাধারণ মৌলিকতা, অপূর্ব চিন্তাশীলতা ও অলৌকিকী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী বাঙ্গালীর অতি প্রিয়। কিন্তু তাঁহার ইংরাজি প্রবন্ধাবলী এখনও সংগৃহীত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হয় নাই। অধিকাংশ বাঙ্গালী পাঠকের সহিত সেই দুষ্প্রাপ্য প্রবন্ধাবলীর পরিচয় ঘটে নাই। বিশেষতঃ, ইংরাজিতে অনভিজ্ঞ পাঠকগণ এই সকল রচনার রসাস্বাদন হইতে বঞ্চিত আছেন। এই সকল কারণে আমরা কয়েক বৎসর পূর্বে 'সাহিত্য'-সম্পাদক স্বর্গীয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়কে তৎসম্পাদিত মাসিকপত্রে উক্ত প্রবন্ধগুলির বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত করিতে অনুরোধ করি এবং প্রবন্ধগুলি তাঁহাকে সংগ্রহ করিয়া দিই। তিনি প্রথমে আমাদিগকেই প্রবন্ধগুলির অনুবাদ করিয়া দিতে বলেন কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে আমরা স্বভাবতই সঙ্কোচ অনুভব করি এবং যোগ্যতর লেখকের উপর ভার প্রদান করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করি

অবশেষে সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক ও লেখক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে উক্ত ভার প্রদান করা হয় এবং তিনি 'বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা'য় পঠিত বঙ্কিমচন্দ্রের দুইটি প্রবন্ধের সুন্দর অনুবাদ করেন। অনুবাদগুলি 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হইয়াছিল। তৎপরে তিনি কার্যান্তরে নিযুক্ত থাকায় এই অনুবাদ কার্যে আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই, এবং সমাজপতি মহাশয় পুনর্বার আমাদিগকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিলে আমরা সে অনুরোধ লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া 'মুখার্জীস ম্যাগজিনে' ও 'কলিকাতা রিবিউ' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত আরও তিনটি প্রবন্ধের অনুবাদ করি। উহা 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়। বর্তমান প্রবন্ধটি ১৩২৩ ও ১৩২৪ সালের 'সাহিত্যে' ধারাবাহিকভাবে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

'মূল প্রস্তাবটি ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ১০৪ সংখ্যক 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেকালে উক্ত ত্রৈমাসিক প্রবন্ধ লেখকগণের নাম মুদ্রিত হইত না। বলা বাহুল্য, সম্পাদিত প্রবন্ধটির নিম্নেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাক্ষর ছিল না। সেই জন্যই বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধে তাঁহার নব প্রকাশিত কয়েকখানি গ্রন্থের উল্লেখ ও আলোচনা করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। বহু বৎসর পরে, 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের প্রকাশকগণ 'Selections from the Calcutta Review' নাম দিয়া পুরাতন 'কলিকাতা রিবিউ' হইতে নির্বাচিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধগুলি পুনর্মুদ্রণের আয়োজন করেন। সেই সময়ে তাঁহারা যে 'অনুষ্ঠান পত্র' বাহির করেন, তাহাতে কার্যালয়ের কাগজপত্র দেখিয়া প্রবন্ধগুলির রচয়িতৃগণের নাম নির্ধারিত করিয়া প্রকাশিত করেন। আমরা এই অনুষ্ঠানপত্র হইতে জানিতে পারি যে প্রবন্ধটি সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়েরই রচিত।

'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে সম্প্রতি অনেক গবেষণা ও আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। সমালোচনায় অতুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ বহু বৎসর পূর্বে রচিত হইলেও উহাতে ভাবিয়া দেখিবার অনেক কথা আছে। প্রবন্ধটি 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের কয়েকমাস মাত্র পূর্বে—বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভা-রবি যখন প্রতিষ্ঠার সমুচ্চ শিখরের সমীপবর্তী সেই সময়ে রচিত। সেই হিসাবেও প্রবন্ধটি মূল্যবান। সুতরাং আশা করি, সুধীসমাজে এই ক্ষুদ্র অনুবাদ-গ্রন্থখানি উপেক্ষিত হইবে না।'

'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর এই বাংলা অনুবাদ করেন মন্মথনাথ ঘোষ। 'সাহিত্য' পত্রিকার ১৩২৩ মাঘ, ফাল্গুন ও ১৩২৪ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ—এই চার সংখ্যায় যখন ধারাবাহিকভাবে অনুবাদটি ছাপা হয় তখন এর সঙ্গে কোনও ভূমিকা ছিল না। ভূমিকা যুক্ত হয় উক্ত অনুবাদ যখন পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করা হয়।

১৩৩৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে মন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ পুস্তিকাটি[৩] বার হয়। তার ১২ বছর পর, ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে, বঙ্কিম জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপন উপলক্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে প্রকাশিত হয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর একটি সংকলন। এই গ্রন্থে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি সংকলতি হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞপ্তিতে ক্যালকাটা রিভিয়ু প্রচারিত 'প্রসপেক্টাস' (Prospectus)—মন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদে 'অনুষ্ঠানপত্র'-এর কথা উল্লিখিত হয়েছে; তবে সেই সঙ্গে এ-কথাও জ্ঞাপন করা হয়েছে যে কোনও অজ্ঞাত কারণে লেখাটি Selections from the Calcutta Review-তে আদৌ ছাপা হয়নি।

শেষোক্ত তথ্যটির উল্লেখ মন্মথনাথ ঘোষের 'বিজ্ঞাপন'-এ নেই। কিন্তু তথ্যটির গুরুত্ব আছে। যে-লেখা বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত বলে চিহ্নিত হল এবং পুনর্মুদ্রণের জন্য নির্বাচিত হল, সে লেখা শেষ পর্যন্ত সংকলন গ্রন্থে কেন ছাপা হল না তার একটা কারণ অবশ্যই ছিল, কিন্তু যথাযথ তথ্যের অভাবে কারণটা পরবর্তীকালে অজ্ঞাত, রহস্যাবৃত অবস্থায় রয়ে গেছে। এবং প্রবন্ধটি সম্পর্কে একটা সংশয়, একটা ধন্ধ উৎপন্ন হবার অবকাশ থেকে গেছে।

আর সে কারণেই অতি সম্প্রতি প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর রচয়িতা কে ? প্রশ্নটি তুলেছেন ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ভবতোষ চট্টোপাধ্যায়, যাঁর সম্পাদনায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে 'সাহিত্য আকাদেমি' (নয়া দিল্লি) কর্তৃক ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে বৃহৎ আকার ৬৫২ পৃষ্ঠার 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি / এসেজ ইন পারস্পেকটিভ (Bankim Chandra Chattarjee/Essays in Perspective) নামক গ্রন্থ। গ্রন্থভুক্ত ইংরেজি প্রবন্ধগুলি এবং ড. চট্টোপাধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সাম্প্রতিক বঙ্কিমচর্চার একটা বড় নিদর্শন।

এই গ্রন্থেই ড. চট্টোপাধ্যায় একটি ক্ষুদ্রকায় পরিশিষ্টে (পৃ: ৫৯১–৯২) উপরোক্ত বিতর্কমূলক প্রশ্নটি উত্থাপন করেছেন। তাঁর মতে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে। তিনি তিন প্রস্থ কারণ বিবৃত করেছেন যাতে তাঁর এই অভিমতই ব্যক্ত হয়েছে যে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নয়।

॥ ৩ ॥

আমরা কিন্তু মনে করি 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই লেখা। আমাদের ধারণার যাথার্থ্য প্রমাণ করতে আমরা ড. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য এক এক করে খণ্ডন করতে চেষ্টা করব।

ড. চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম বক্তব্য :

ড: চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা নয় বলেই ওটি 'সিলেকসনস ফ্রম দা ক্যালকাটা রিভিয়ু'—তে ছাপা হয়নি। তিনি মনে করেন, প্রস্‌পেক্‌টাস-এ প্রবন্ধটির পাশে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সম্ভবত অনবধানবশত ভুল করে ছাপা হয়, এবং ওই অনুষ্ঠানপত্র (প্রস্‌পেকটাস) হয় বঙ্কিমচন্দ্রের চোখে পড়েনি, নয় বিষয়টাকে তিনি কোনও গুরুত্ব দেননি।

আমাদের বক্তব্য :

ড. চট্টোপাধ্যায়কে আমাদের প্রশ্ন, আলোচ্য প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নয় বলেই তা পুনর্মুদ্রিত হল না—এ কেমন যুক্তি? প্রকৃত লেখকের নামেই তো প্রবন্ধটি ছাপানো যেত। আর প্রকৃত রচয়িতাকে চিহ্নিত করা সম্ভব না হলে লেখাটি লেখক নাম ছাড়াই ছাপানো যেত।

ড. চট্টোপাধ্যায়ের অনুমানের বিপরীতে আমাদের অনুমান হল, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই প্রস্‌পেক্‌টাসে তাঁর নাম ছাপা হবার পর ক্যালকাটা রিভিয়ু-র কর্তৃপক্ষকে বারণ করে দেন তাঁর লেখাটা ছাপতে। আমাদের এই অনুমান যে খুবই যথার্থ এবং যুক্তিগর্ভ তা পরিশেষে স্পষ্ট হবে।

ক্যালকাটা রিভিয়ু-র প্রস্‌পেক্‌টাসে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম যে ভুলক্রমে ছাপা হয়নি, সঠিক ছাপা হয়েছিল তা প্রতিপন্ন করা যায় রচনা-সনাক্তকরণের গবেষণাগত পদ্ধতি প্রয়োগ মারফৎ। আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে যে ক'টি প্রমাণ পেয়েছি তা আমাদের অভিপ্রেত সত্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট। প্রমাণগুলি পেশ করছি।—

১৮৭১ খ্রিস্টাব্দে ক্যালকাটা রিভিয়ুতে বেঙ্গলি লিটারেচার প্রকাশিত হবার বছরখানেক আগে বঙ্কিমচন্দ্র বেঙ্গল সোশ্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর ১৮৭০, ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে অনুষ্ঠিত এক বিদ্বজ্জন সভায় 'এ পপুলার লিটারেচার ফর বেঙ্গল' (A Popular Literature for Bengal) নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্রের নামেই উক্ত প্রতিষ্ঠানের কার্যবিবরণী (Transactions)-তে ১৮৭০ সালেই মুদ্রিত হয়। স্পষ্টতই বঙ্কিমচন্দ্র তখন একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষজ্ঞরূপে বিদ্বৎসমাজে পরিচিত ছিলেন। এবং সেই সময় হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থটি প্রকাশিত হওয়ায়, এই গ্রন্থের সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে বাংলাসাহিত্য সম্পর্কে লিখতে ক্যালকাটা রিভিয়ুর তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিল এবং ঐ অনুরোধ রক্ষার্থে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি লিখিত হয়েছিল, এমন অনুমান সহজেই করা চলে। এই অনুমান ছাড়া, উক্ত দুটি রচনার রচয়িতা যে একই ব্যক্তি অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র, তার অভ্যন্তরীণ প্রমাণ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে লেখাদুটি সতর্কভাবে পাঠ করলে। যদিও লেখা দুটির বিষয়বস্তুর প্রকৃতি ও পরিধির মধ্যে বিস্তর ফারাক—একটির বিষয়বস্তু, জনসাধারণের সাহিত্য এবং লেখাটি ছোট মাপের; অন্যটির বিষয়বস্তু, শিক্ষিত সমাজের সাহিত্য এবং লেখাটি বেশ বড় মাপের, তবু দুটি লেখার অংশবিশেষে বক্তব্য ও ভাষার অকাট্য মিল দেখা যায়। বক্তব্যের মিল ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস লক্ষ করেছেন।[৩] আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর অনুবাদ করেন মন্মথনাথ ঘোষ আর 'এ পপুলার লিটারেচার ফর বেঙ্গল' প্রবন্ধটির অনুবাদ করেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, যে অনুবাদ 'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য' আখ্যায় জ্যৈষ্ঠ ১৩২০ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত প্রথমে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কৃত অনুবাদ 'বাঙ্গালার জনসাধারণের সাহিত্য' থেকে এই অংশ উদ্ধৃত করেছেন—'আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের মাতৃভাষায় পুস্তক রচনা করিতে অভিলাষী নহেন। চাটুকার মোসাহেব পণ্ডিত (fawning) ও অভাবজীর্ণ ব্যক্তিরা আমাদের দেশে গ্রন্থকার হইয়া থাকেন। ....কর্মহীন ব্যবসায়হীন বাজে লেখকগণই গ্রন্থকার সাজিয়া বসে। কেননা এমন লেখকের পক্ষে যে আর কিছু হইতে পারে না।... যে তীক্ষ্মবুদ্ধি তেজস্বী বাঙ্গালী যুবক ঠিক ইংরেজের মতন ইংরেজি ভাষায় কথা কহিতে লিখিতে পারে, সে মনে করে বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক রচনা করা হীন বৃত্তি মাত্র, তাহার পদের ও শিক্ষার যোগ্য নহে।'

এরপর ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্তর মন্তব্য: '১৮৭১ খ্রীস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রে প্রকাশিত বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার [বঙ্কিমচন্দ্রের] বেনামী প্রবন্ধে এই কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন,—'অর্ধশিক্ষিত ক্ষিপ্র লেখকগণই বাঙ্গালা গ্রন্থের প্রণয়নে ব্রতী। এই কার্যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিজাতীয় ঘৃণা আছে এবং ইঁহারা মাতৃভাষায় লেখা নিতান্ত অপমানজনক মনে করেন। (মন্মথনাথ ঘোষ কৃত অনুবাদ, পৃঃ ১৫)।'

আমরা আমাদের আলোচনার শেষে, 'তথ্য-সূত্র ও টীকা' অংশে উপরে প্রদত্ত অনুবাদ অংশগুলির মূল ইংরেজি পাঠ উদ্ধৃত করেছি।[৪] তাতে দুটি উদ্ধৃতির বক্তব্যগত মিল ছাড়া ভাষাগত মিলও স্পষ্টভাবে লক্ষ করি এবং সে কারণে অভ্যন্তরীণ প্রমাণ আরও সূচীমুখ হয়ে উঠতে দেখি। দুটি উদ্ধৃতিতেই authorship, vocation ও বিশেষ করে Scribbler শব্দের ব্যবহার লক্ষ করলে বেশ বোঝা যায় যে দু ক্ষেত্রের উদ্ধৃত বাক্যগুলি একই কলম থেকে বেরিয়েছে। আরও লক্ষণীয়, দুটি উদ্ধৃতিতেই absence of intelligent criticism শব্দগুচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে বিশেষ করে criticism এর পূর্বে intelligent বিশেষণ শব্দটির

ব্যবহার লক্ষ করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে দুটি উদ্ধৃতির লেখক একই ব্যক্তি।

'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এ কবিয়ালদের গান বা 'কবিগান' সম্বন্ধে বলা হয়েছে, '...দুইটি বিপক্ষ দলের গায়কগণ কর্তৃক গীত হইত... রাম বসু, হরু ঠাকুর ও নিতাই দাসের কতকগুলি গানে কিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌন্দর্য আছে।'[৫] (মন্মথনাথ ঘোষ-কৃত অনুবাদ)। বছর দুই পরে বঙ্গদর্শন-এ 'মানস বিকাশ' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, 'রাম বসু, হরু ঠাকুর ও নিতাই দাসের এক একটি গীত এমত সুন্দর আছে যে, ভারতচন্দ্রের রচনায় তত্তুল্য কিছুই নাই।'[৬] দু ক্ষেত্রেই প্রশংসিত তিন কবিয়ালের নাম একই এবং বিশেষ করে লক্ষণীয় যে তাদের উল্লেখের ক্রমও একই। এই সাদৃশ্য দৃঢ়ভাবে আমাদের অনুমান সমর্থন করে।

'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এ পড়ি— '... 'একেই কি বলে সভ্যতা'-র অনুকরণে যত পুস্তক রচিত হইয়াছে তত আর কোনও গ্রন্থের আদর্শে রচিত হয় নাই।'[৭] (মন্মথনাথ ঘোষের অনুবাদ)। পুনরায়, '(এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানির) অনুকরণে এতগুলি পুস্তক রচিত হইয়াছে বলিয়াও ইহার গৌরববৃদ্ধি হইয়াছে।'[৮] এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রকে পাই, কারণ এই কথাই বছর খানেক পরে বঙ্গদর্শনে একটি প্রহসন ('কিঞ্চিৎ জলযোগ')-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রকে লিখতে দেখি—' 'একেই কি বলে সভ্যতা'র জন্মাবধি প্রহসনের কিছু ছড়াছড়ি হইয়াছে।'[৯]

ড. চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় বক্তব্য :

অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের মতে বেঙ্গলি লিটারেচারের লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রকে যদি চিহ্নিত করতে হয় তাহলে বলতে হয় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই লেখায় নিজের ঢাক নিজে বাজিয়েছেন; কারণ, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মগরিমাই প্রকট হতে দেখি—মনে হয় তিনি নিজেকে বাংলার সব চেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ (promising) ও সর্বশ্রেষ্ঠ (greatest) ঔপন্যাসিক রূপে গণ্য করেছেন।[১০] যেহেতু এমন আত্মপ্রশংসা বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাববিরুদ্ধ ছিল সেহেতু, অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায়ের সিদ্ধান্ত, ওই লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের নয়।

আমাদের বক্তব্য :

বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ঢাক নিজে বাজিয়েছেন, এমন ধারণা ড. চট্টোপাধ্যায়ের কেন হল, কী সূত্রে হল, জানি না। ওই প্রবন্ধে এমন কোনও বাক্য বা শব্দের প্রয়োগ দেখি না যা বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের সম্পর্কে অথবা নিজের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে কোনও প্রকার আত্মগরিমাসূচক। যা লেখা হয়েছে তা তো এই—'রোমান্স লেখকদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ রচিত 'বঙ্গাধীপ পরাজয়' সম্পর্কে সম্প্রতি এই পত্রিকায় (ক্যালকাটা রিভিয়ু-তে) আলোচনা করা হয়েছে। এই শ্রেণীভুক্ত আর যে লেখকের রচনা উল্লেখযোগ্য তিনি হলেন বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাঁর দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় বাংলা পুস্তকের মধ্যে গণ্য।'[১১] এরপর বঙ্কিমচন্দ্র (আমরা 'বঙ্কিমচন্দ্র' বলছি যেহেতু আমরা ধরেই নিয়েছি 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর লেখক হলেন বঙ্কিমচন্দ্র) শুধু বিস্তৃতভাবে কপালকুণ্ডলার গল্পাংশ বিবৃত করেছেন। কেবলমাত্র একটি মন্তব্য করেছেন এবং সেটি বিরূপ মন্তব্য: 'কপালকুণ্ডলার রূপবর্ণনার ভাষা যতটা জাঁকালো (lofty) ততটা স্পষ্ট (distinct) নয়।'[১২] এবং পরিশেষে কেবলমাত্র একটি বাক্যে 'মৃণালিনী'-র উল্লেখ করে লিখেছেন, 'মৃণালিনী ভিন্ন ধরণের বই; অনেকের মতে এটি বঙ্কিমবাবুর সর্বাপেক্ষা সফল সৃষ্টি (successful production)।'[১৩]

স্পষ্টই দেখছি, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের সম্বন্ধে এমন কিছুই বলেন নি যাতে মনে হতে পারে তিনি নিজের ঢাক নিজে বাজিয়েছেন। তিনি তো নিছক তাথ্যিক বিবরণ দিয়েছেন। এটা তো জানা কথা যে দুর্গেশনন্দিনীর আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র অতিক্রুত খ্যাতিমান হয়ে ওঠেন। কপালকুণ্ডলা ও মৃণালিনী তাঁর খ্যাতি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, প্রসারিত করে—বাংলা উপন্যাস ক্ষেত্রে তাঁকে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় করে তোলে। শিবনাথ শাস্ত্রীর সাক্ষ্যে—'১৮৬৪ সালে তাঁহার প্রণীত দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। আমরা সে দিনের কথা ভুলিব না। দুর্গেশনন্দিনী বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ-জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।... অল্পদিন পরে 'কপালকুণ্ডলা' দেখা দিল। যে তুলিকা দুর্গেশনন্দিনীর নয়নানন্দকর কমনীয়তা চিত্রিত করিয়াছিল, তাহা কপালকুণ্ডলায় গাম্ভীর্যরস-পূর্ণ ভাব সৃষ্টি করিল। লোকে বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল।'[১৪]

'সংবাদ প্রভাকর'-এ ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৬৫ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশে একটি অভিনন্দন পত্রে লেখা হয়, 'আপনি এক্ষণে আমাদিগকে নবপল্লবিত অক্ষয়বৃক্ষের অমৃত ফলের রসাস্বাদন করাইলেন।'

'মৃণালিনী' প্রকাশিত হলে এর সম্পর্কে রাজেন্দ্রলাল মিত্র তাঁর রহস্য-সন্দর্ভ পত্রিকায় লেখেন, '...আমরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি যে বঙ্গভাষায় গদ্যে মৃণালিনীর সদৃশ সুচারু গ্রন্থ অদ্যাপি মুদ্রিত হয় নাই।' (১৯২৭ সম্বৎ, ৫৭ খণ্ড, পৃ: ১৪২)।

এই সব তথ্য এ-কথাই প্রমাণ করে যে ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় (মনে রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্র 'the greatest' অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ বা সর্বোত্তম শব্দ ব্যবহার করেননি) ঔপন্যাসিক রূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন

করেছিলেন। সুতরাং, সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, এই বিশেষণ ব্যবহার করে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মগরিমা-প্রকাশ বা নিজের ঢাক নিজে বাজাবার মানসিকতা দেখাননি।

ড. চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় বক্তব্য :

'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বলে মেনে নেবার বিরুদ্ধে ড. চট্টোপাধ্যায়ের তৃতীয় বক্তব্য হল, এই লেখায় অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকদের সম্পর্কে যে সব কটু সমালোচনা করা হয়েছে তা খুবই অশোভন ও নিম্নরুচি-পরিচায়ক এবং সে কারণে তা বঙ্কিম-লেখনি নিঃসৃত নয়। যেমন, যে মধুসূদনের প্রতিভার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ছিল এবং যাঁর কাব্য থেকে কপালকুণ্ডলায় ছ' ছ'টা এপিগ্রাফ (epigraph) অর্থাৎ পরিচ্ছেদ-শিরস্ক রূপে উদ্ধৃত আছে, সেই মধুসূদনকে উক্ত প্রবন্ধে দুয়ো দেওয়া হয়েছে। প্রশংসার ছিটেফোঁটা ছড়িয়ে বহুল ভাবে নিন্দা করা হয়েছে। যে দীনবন্ধু মিত্র তখন জীবিত এবং বঙ্কিমের বিশিষ্ট বন্ধু সেই দীনবন্ধু মিত্রও রূঢ়-কটু সমালোচনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আর বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যে সব মন্তব্য আছে তা তো বালভাষিতের চূড়ান্ত।

ড. চট্টোপাধ্যায়ের মতে প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত হলে এমন অভাবিত অসঙ্গতি দেখা যেত না।

আমাদের বক্তব্য :

ড. চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য বা অভিমত যতটা আত্মগত ধারণা প্রসূত ততটা রচনাপাঠ নির্ভর ও তাথ্যিক সাক্ষ্যবহ নয়। প্রবন্ধটিতে অন্যান্য লেখকদের সম্পর্কে নিন্দার বদলে বরং প্রশংসার বর্ষণই দেখা যায়। নিন্দা যা তা তো কেবল বিদ্যাসাগর সম্পর্কে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কপালকুণ্ডলায় মেঘনাদবধ ও বীরাঙ্গনা থেকে ৬টি কাব্যাংশ উদ্ধৃত করেছেন—এতে করে বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কবি-প্রতিভার যে স্বীকৃতি দিয়েছেন তারই স্পষ্ট প্রতিফলন আছে তাঁর ওই প্রবন্ধে। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসূদনের কাব্যের যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। যেমন, (বাক্যগুলি মন্মথনাথ ঘোষ-কৃত অনুবাদ থেকে নেওয়া) 'বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নতুন পরিবর্তন ও অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনের জন্য তাঁহাকে অনেক কটু সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছে; কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে তাঁহার ন্যায্য স্থান বোধহয় সকলের উপরে।... 'মেঘনাদবধ'ই দত্ত সাহেবের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ..ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন এবং শব্দচয়ন এরূপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে।'[১৫] ...'বীরাঙ্গনা' কাব্যখানি 'তিলোত্তমা' অপেক্ষা অধিকতর পরিপক্কতার পরিচায়ক।... 'মেঘনাদবধে'র পরই ইহা রচিত হয় এবং ইহাতেও 'মেঘনাদবধে'র ন্যায় সুন্দর রূপকাদি অলঙ্কার, ভাষার চমৎকারিত্ব, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমধুরতা আছে।'[১৬] ...'ব্রজাঙ্গনা' একখানি ক্ষুদ্র অসমাপ্ত কাব্য। ইহা মিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।.... অমিত্রাক্ষরের ন্যায় মিত্রাক্ষর ছন্দেও অনুরূপ সাফল্য লাভ করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার মিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা বাঙ্গালা ভাষায় সর্বোৎকৃষ্ট।'[১৭]

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কেও প্রশংসার খামতি দেখি না। তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ইনি সর্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালী নাট্যকার, বাস্তবিক পক্ষে তাঁহাকেই একমাত্র উৎকৃষ্ট নাট্যকার বলা চলে।'[১৮] লীলাবতী ও নবীন তপস্বিনীর খানিক বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার পর বলা হয়েছে যে, নবীন তপস্বিনী-তে দীনবন্ধু যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক রূপে প্রতিভাত, লীলাবতী-তে তেমনই তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠতম বাক্-রসিকতাপটু লেখকরূপে প্রতিষ্ঠিত।'[১৯]

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এ যে সব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে, তা যে বঙ্কিমচন্দ্রেরই তারও প্রমাণ সহজলভ্য। বাস্তবিক পক্ষে, যে সমস্ত বলিষ্ঠ সাক্ষ্যে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত বলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তার অন্যতম হল উক্ত অভিমত। বাংলাসাহিত্যে বিদ্যাসাগরের যে একটা অসামান্য কীর্তি আছে যা চিরস্মরণীয়—এমন কথা আদপেই গ্রাহ্য করেন নি বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর সমগ্র রচনাবলীর কোথাও বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকীর্তির স্বীকৃতিমূলক গুণগ্রাহী কোনও মূল্যায়ন দেখি না। ১৮৭১ সালে অনামা 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে যে মন্তব্য করা হয়েছে, অর্থাৎ সাহিত্যক্ষেত্রে কিছুই করেননি—এমন কথাই বছর দুই পরে আরও উৎকটভাবে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপে শাণিত করে বঙ্গদর্শন-এ এক বঙ্কিম-শিষ্য (অক্ষয়চন্দ্র সরকার) লেখেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি সিকি আধুলি ও টাকা ব্যতীত কিছু নহে। সাগরী-টাকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্যস্থানে রূপা ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ডরূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে Queen Victoria ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপাকে একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোন করিয়া চারিদিকে ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়।' যেমন, লেখকের ভাষায়, বিদ্যাসাগর 'এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান; সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান, সে টাকার নাম 'বেতাল পঁচিশ'।[২০] বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের তাচ্ছিল্যভরা মনোভাব ছিল বলেই তাঁর বঙ্গদর্শন কাগজে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের অমন বিদ্রূপ-কষায়িত বিদ্যাসাগর-বিরোধী লেখা ছাপা সম্ভব হয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, বঙ্কিমচন্দ্র যে ঈশ্বরচন্দ্রকে নিছক অনুবাদক রূপেই দেখতেন তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে বঙ্গদর্শনে

তাঁর নিজেরই লেখায়। ১২৮১ শ্রাবণ সংখ্যার বঙ্গদর্শনে 'প্রাপ্তগ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' বিভাগে আর্যদর্শন পত্রিকার সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'বিদ্যাসাগর মহাশয় পণ্ডিততেরা অনুবাদ করেন..'।[২০ক] এ কথার তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ বেরয় 'এডুকেশন গেজেট ও 'সাপ্তহিক বার্তাবহ'-র ২৩ শ্রাবণ ১২৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত একটি পত্রে। তাতে লেখা হয়—'প্রতিষ্ঠা স্থাপনের নানা উপায় আছে, তন্মধ্যে বঙ্গদর্শন খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভের নিমিত্ত অতি কুৎসিত পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। উন্নত মুণ্ডকে হেঁটমুণ্ড করিতে পারিলেই নিজ মুণ্ড উন্নত হইবে বলিয়া বঙ্গদর্শন সময় পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দুই এক ঠোঁস মারেন। শ্রাবণ মাসের বঙ্গদর্শন তাহাই করিয়াছেন। যিনি যাহাই বলুন, বিদ্যাসাগর মহাশয় যে কেবল অনুবাদক একথা আমরা কখনই স্বীকার করিতে পারি না। বঙ্গদর্শন বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইয়া অবধিই সময় পাইলেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিপক্ষে দু এক কথা কহিয়া লয়েন।'[২১] পত্রিকাটি সমকালীন দলিল, যার সাক্ষ্যে আমরা জানতে পারি যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'কেবল অনুবাদক' রূপেই স্বীকার করতেন।

জানি, বঙ্কিমচন্দ্রের একটি লেখায় এই বাক্যদুটি আছে—'বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারেন নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।'[২২] বাক্যদুটিকে কেউ কেউ বিদ্যাসাগরের সাহিত্যকৃতির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধার্ঘের দৃষ্টান্ত হিসাবে দেখেছেন। ড. চট্টোপাধ্যায়ও তাই করেছেন।

কিন্তু এঁরা বাক্যদুটিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছেন। বাক্যদ্বয়ের আগে ও পরে যে-সব বাক্য আছে সেগুলির প্রতি একটু খেয়াল করলেই ধরা পড়বে ওই দুই বাক্যে বঙ্কিমকৃত বিদ্যাসাগরের প্রশংসার পরিমাপ এবং আমাদের মনে পড়বে রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব' প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য : 'সরলচিত্ত অধ্যাপক মহাশয় অতটুকু বুঝিতে না পারিয়াই বিদ্যাসাগরী ভাষার মহিমাকীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।'[২৩] বাক্যদুটির আগে লেখা হয়েছে—'এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তর হাতে কিছু সংস্কারপ্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্বোধ্য নহে' এবং বাক্যদুটির পরে যা লেখা হয়েছে তা থেকে কিছু উদ্ধৃত করছি—'কিন্তু তাহা হইলেও সর্বজন বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে রহিত।... কাজেই বাঙ্গালা সাহিত্য পূর্বমত সঙ্কীর্ণপথেই চলিল।... সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসঙ্কলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না।' এরপর বিদ্যাসাগরকে স্পষ্টতই অনুবাদক বলা হয়েছে—'বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে এবং বেতাল পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত।' বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে 'প্রতিভাশালী লেখক' বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু সে-প্রতিভার কোনও পরিচয় বা মূল্যায়ন বঙ্কিমরচনাবলীর কোথাও পাই না। —সে প্রতিভা কি তবে কেবলমাত্র সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা তত দুর্বোধ্যভাবে ব্যবহার না করার মধ্যেই বিকশিত ছিল ?

॥ ৪ ॥

কেবলমাত্র একটি বাহ্য প্রমাণ সূত্রে লেখকনামহীন 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র রচিত বলে বঙ্কিমচর্চায় এযাবৎকাল স্বীকৃত হয়ে এসেছে। কিন্তু এই বাহ্য প্রমাণটির পায়ের তলার মাটি তেমন শক্ত নয় বলেই প্রমাণটি অস্বীকার করা সম্ভব। অস্বীকার করাও হয়েছে। বলা হয়েছে, ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' প্রচারিত প্রস্পেক্টাস-এ 'বেঙ্গলি লিটারেচার' বিষয়নামের পাশে লেখক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম ভুলবশত ছাপা হয়। ড. চট্টোপাধ্যায়ের এই বক্তব্য খণ্ডন করার সুবাদে আমরা রচনা সনাক্তকরণের গবেষণাগত পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রবন্ধটি যে বঙ্কিমচন্দ্র-লিখিত তার একাধিক বাহ্য তথা অভ্যন্তরীণ প্রমাণ উদ্ঘাটন করতে প্রয়াস পেয়েছি। বলতে পারি এমন প্রয়াস এই প্রথম। এ বিষয়ে অবশ্যই আরও অনুসন্ধান চলতে পারে, আরও প্রমাণ উদ্ধার করা যেতে পারে। যেমন, একটা অকাট্য বাহ্য প্রমাণ পেয়ে যাব যদি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা কোনও চিঠি আবিষ্কার করা যায় যাতে 'বেঙ্গলি লিটারেচার'এর উল্লেখ আছে, এবং সে উল্লেখ এমন যা প্রবন্ধটিকে তাঁর রচনা হিসাবে চিহ্নিত করে। উদাহরণত উল্লেখ্য, ওই ক্যালকাটা রিভিয়ু-তেই প্রকাশিত 'বুদ্ধিজম্ অ্যাণ্ড দ্য সাংখ্য ফিলসফি' (Budddhism and the Sankhya Philosophy) শীর্ষক লেখকনাম-হীন রচনাটি যে বঙ্কিমচন্দ্র রচিত সে সম্বন্ধে একটি নিশ্চিত প্রমাণ হল ১৮৭২ সালে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে লেখা বঙ্কিমচন্দ্রের একটি চিঠি, যাতে তিনি লেখেন—'সাংখ্যদর্শনটাই আমি রীতিমত পড়িয়াছি এবং সাংখ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য, তাহা আমি পূর্বেই 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রে একটি প্রবন্ধে—প্রকাশিত করিয়াছি।'[২৪]

নামী লেখকের স্বাক্ষরহীন রচনা সনাক্ত করার একটা সফল আধুনিক পদ্ধতি হল পরিসংখ্যানগত সমীক্ষা। কম্পিউটার যন্ত্র প্রচলিত হওয়ায় এই সমীক্ষার কাজ এখন বিশেষ আয়াস-সাধ্য নয়। এই সমীক্ষা মারফৎ অক্সফোর্ড বডলিয়ন লাইব্রেরির সংগ্রহে প্রাপ্ত একটি পুরনো অনামা ৪২৯ শব্দবিশিষ্ট কবিতার রচয়িতা যে শেকস্পীয়ার এই অনুমান সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে।[২৫] 'বেঙ্গলি লিটারেচার'-এর ক্ষেত্রেও এমন সমীক্ষা প্রযুক্ত হতে পারে।

পরিশেষে প্রশ্ন, 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি কেন 'সিলেক্‌শন্‌স ফ্রম দ্য ক্যালকাটা রিভিয়ু'-তে ছাপা হল না? ড. চট্টোপাধ্যায় মনে করেন লেখাটা বঙ্কিমচন্দ্রের নয় বলেই ছাপা হয়নি। এ যুক্তি ধোপে টেকে না। আমরা আগেই বলেছি, নির্বাচিত রচনা ভুলক্রমে বঙ্কিমচন্দ্রের বলে প্রস্‌পেক্‌টাস-এ ছাপা হতে পারে, কিন্তু সিলেক্‌শন্‌স-এ রচনার প্রকৃত লেখকের নাম দিয়ে অথবা লেখকের নাম সম্পর্কে খোঁজ না পাওয়ায়, অনামায় মুদ্রিত হতে কোনও বাধা ছিল না। তাই আমরা মনে করি খোদ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকেই বাধা আসাতে লেখাটা ছাপা হয়নি।

তবু প্রশ্ন থেকে যায়—কেন বঙ্কিমচন্দ্র নিষেধ করেন প্রবন্ধটি ছাপাতে। এর সঠিক উত্তর তখনই উদ্ধার করা সম্ভব হবে যখন আমাদের হাতে আসবে এমন দলিল যাতে উক্ত নিষেধ সম্পর্কে উল্লেখ আছে। এমন দলিল পেতেও যে পারি সে সম্ভাবনার প্রতি ইঙ্গিত দেয় একটি ঘটনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর একটি প্রবন্ধ 'দ্য কনফেশসন্‌স অফ আ ইয়ং বেঙ্গল' (The Confessions of a Young Bengal) শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেন 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এর জন্যে। কিন্তু পরে একটি পত্রে শম্ভুচন্দ্রকে নিষেধ করেন লেখাটা ছাপতে।[২৬] অথচ শম্ভুচন্দ্রের একান্ত ইচ্ছা লেখাটা ছাপা হোক। তিনি দুই কুল বজায় রাখলেন লেখাটা অনামায় ছাপিয়ে। শম্ভুচন্দ্রকে লেখা উক্ত চিঠি যেমন নিঃসন্দেহে প্রমাণ করছে অনামা 'দ্য কনফেশসন্‌স অফ আ্য ইয়ং বেঙ্গল' লেখাটা বঙ্কিমচন্দ্রেরই রচনা তেমনই 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'র কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো নিষেধ-পত্র (যদি পাওয়া যায়) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করবে 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিত এবং তারই সঙ্গে নিশ্চিতরূপে এটাও জানা যাবে প্রবন্ধটি কেন সিলেক্‌শন্‌স-এ ছাপা হয়নি।

যতদিন এমন দলিল আবিষ্কৃত না হচ্ছে ততদিন অনুমান করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমরাও তাই অনুমান নির্ভর করেই বলছি, 'সিলেক্‌সন্‌স ফ্রম দ্য ক্যালকাটা রিভিয়ু'-তে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লেখাটা ছাপতে নিষেধ করেন তার কারণ ওই লেখার অন্তর্ভুক্ত বিদ্যাসাগর সম্পর্কে তীব্র কঠোর সমালোচনা। আমাদের এই কথার পরোক্ষ সমর্থন পাই বঙ্কিমচন্দ্রেরই একটি লেখায়। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রসঙ্গ—দ্বিতীয় ভাগ'-এ সন্নিবেশিত 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটির ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন, "স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রবর্তিত বহুবিবাহ-বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে বঙ্গদর্শনে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া ছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই।" ১৮৮১ তে ক্যালকাটা রিভিয়ু-র 'প্রস্‌পেক্‌টাস' বার হয়। বিদ্যাসাগর তখন জীবিত। বিদ্যাসাগর যাতে পুনরায় বিরক্ত না হন তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বেঙ্গলি লিটারেচার' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত করতে চাননি।

তথ্য-উৎস ও টীকা

১. Anon. "Bengali Literature", **Calcutta Review,** No. 104 (1871).

২. Lives of the Bengali Poets. By Hari Mohan Mukurjya, Calcutta: New Sanskrit Press, 1869; Mitra Prakas, No. 1 Dacca: 1870. এই গ্রন্থই পরে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে 'বঙ্গভাষার লেখক' নামে প্রকাশিত হয়।

২ক. প্রবন্ধের নাম: "বিদ্যাসাগরের মৌলিক রচনা"; লেখক: দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়।

৩. বাঙ্গালার সাহিত্য/৺রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর বিরচিত ইংরাজি প্রস্তাব হইতে মন্মথনাথ ঘোষ কর্তৃক অনুবাদিত। ১৩৩৫। ৭৭ পৃ:।

৪. দ্র: সাহিত্যসাধক চরিতমালা: বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত।

৫. "The first is the disinclination of the more educated classes to write for their country in their own language. "Authorship is with us still the vocation of the needy and fawning Pundit, or the ambitious School-boy, or the idle Scribbler who must needs be an author simply because he cannot be anything else. Those who can teach their country, consider it beneath their social position to do so. It is degrading for the dashing young Bengali who writes and talks English like an Englishman, to be caught writing a Bengali book. ... The second cause is the absence of sound and intelligent criticism. Intelligent criticism may be said to be a thing unknown to the Native Press."

—"A Popular Literature for Bengal", **Essays and Letters,** Bangiya Sahitya Parishat, 1940, p.16.

" Authorship in Bengal is the vocation of half-educated scribblers. The educated native has a sort of ultra-utilitarian contempt for the office, and considers himself above writing in his own language. The case of criticism is worse. We can hardly hope for a healthy and vigorous Bengali literature in the utter absence of anything like intelligent criticism."

—"Bengali Litterature", **Calcutta Review,** No. 104 (1871), p. 298.

৬. " The Kabi ... was a series of songs ... sung by two opposite bands of performers. ...among the songs of Ram Basu, Haru Thakur and Nitai Das, there are some of peculiar excellences."

—"Bengali literature", p. 296.

৭. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০। পৃ: ৪০২।

৮. "... no work has formed the model for so many imitations as **Is this Civilization?"** —"Bengali Literature", p. 308.

৯. "This little work, ... gains additional importance from the large number of other books written after its model." —"Bengali Literature", p. 308.

৯ক. বঙ্গদর্শন, চৈত্র ১২৭৯। পৃ: ৫৭১।

১০. The unmistakable impression is that he is the most promising—and the greatest—writer in Bengali fiction. ... Drumming up one's own glory has these days been refined into a fine art, but a man of Bankimchandra's integrity would have turned away from such vulgarity in revulsion."

—Bhavatosh Chatterjee, ed., **Bankim Chandra Chatterjee Essays in Perspective** (New Delhi, Sahitya Akademi, 1994, P. 591.

১১. "Among the romance writers, Babu Protap Chandra Ghose, author of **Bangadhip Parajay,** has recently been noticed at length in this review. The only other writer of this class whose works it seems necessary to notice, is Babu Bankim Chandra Chatterji, whose **Durgesnandini, Kapal Kundala** and **Mrinalini** are among the most popular of Bengali books."

—"Bengali Literature", p.312.

১২. "The young woman thus described in language rather more lofty than distinct, turns out to be a Kapal Kundala..."

—"Bengali Literature", P.313.

১৩. "**Mrinalini** is a book of a very different stamp, and many consider it Babu Bankim Chandra Chatterji's most successful production."

—"Bengali Literature", p. 316.

১৪. রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' অধ্যায়।

১৫. 'He has incurred much hostile criticism by his innovations in language, and by his introduction into Bengali of the use of blank verse, but his rightful place in Bengali literature is perhaps the highest, ...the **Meghanad Badh** is Mr. Dutta's greatest work... The diction is richly poetic, and the words so happily chosen as constantly to bring up by association ideas congruous to those which they directly express."

—"Bengali Literature," p. 306-7.

১৬. "We gladly turn from the **Tilottama** to a less ambitious but more mature work, the **Birangana.** ...It followed the **Meghanad Badh,** and there is the same gorgeous imagery, the same rich poetic diction, and the same musical, variously modulated versification."

—"Bengali Literature", p. 307-8.

১৭. "**The Brajangana** is a short and fragmentary poem in rhyme. ...he is just as successful in rhyme as in blank verse. In fact, his rhyme is the best in the language. —"Bengali Literatue," p. 308.

১৮. "...Babu Dinobandhu Mitra, the best Bengali dramatist, indeed the only good dramatic author."

—"Bengali Litarature", p.309.

১৯. "...as in **Nabin Tapaswini** Babu Dinabandhu Mitra has proved himself the greatest humourist so in **Lilabati** he appears as the wittiest writer in the Bengali Language." —"Bengali Literature", p.311.

২০. শ্রী সঃ, তুলনায় সমালোচনা। বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১২৮০। পৃঃ ৩৭—৩৮।

২০ক. বঙ্গদর্শন (পুনর্মুদ্রিত সং ১৩৪৬) শ্রাবণ ১২৮১ পৃ: ২০৬

২১. বিনয় ঘোষ সম্পাদিত, সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৩য় খণ্ড। পৃঃ ২২৬।

২২. "বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্র", বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬)। পৃঃ ৮৬২

২৩. "বাঙ্গালা ভাষা", বঙ্কিম রচনাবলী, ২য় খণ্ড (সাহিত্য সংসদ, ১৩৬৬)। পৃঃ ৩৭১।

২৪. মন্মথনাথ ঘোষ, বঙ্কিমবাবুর প্রবন্ধ। সাহিত্য, অগ্রহায়ণ ১৩২৩। পৃঃ ৫০৮। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি ক্যালকাটা রিভিয়ু-র ১৮৭১ খ্রিস্টাব্দ, সংখ্যা ১০৬-তে প্রকাশিত হয়।

২৫. দ্রঃ C.R. Rao, **Statistics and Truth** (New Delhi: Council of Scientific & Industrial Research, 1989), p.103-5.

২৬. দ্রঃ মন্মথনাথ ঘোষ, বঙ্কিমবাবুর আর একটি প্রবন্ধ। সাহিত্য, পৌষ ১৩২৩। পৃঃ ৫৮০

২৭. বঙ্গদর্শন, আষাঢ় ১২৮০। □

আজকের সিলেট এবং এক বিস্মৃতপ্রায় কবি

দেবযানী দত্ত
রণবীর সমাদ্দার

ও এগো সজনী
গুয়া গাছো টেক্সো লাগিলনি।
বাটার উপর পাইলো ঠাটা
গাল ভরি পান খাইতায়নি॥

তামাক পাতায় টেক্সো ধরে
পুকা মাকড় ভাগে ডরে
(এগো) ধানের গোলা খাইয়া,
গালের পানো আত দিলনি।

বাতাসেতে টেক্সো বইলো
দমের হিসাব গণে লইলো,
(এবার) টাট্টি গেলে টেক্সো লাগে
পেসাবের হিসাব রাখনি॥

টেক্সো দিও বিয়া বইলে
টেক্সো দিও পুয়া অইলে
(এগো) মইলে এবার টেক্সো দিয়া
চিতার আগুইন জ্বালবায়নি॥

অরার টেক্সির তেল জুগাইয়া
আমরা মরি টেক্সো বইয়া
(এগো) ভূতের বেগার খাটিয়া মইলাম
মইলে ভূত অইমুনি
গুয়া গাছো টেক্সো লাইগলনি॥

উল্লিখিত বিশেষ সঙ্গীতটির রচয়িতা আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরী বাংলাদেশের সিলেট জেলার বিস্মৃতপ্রায় কবি। কবিপুত্র আলি মোস্তাফা চৌধুরী ওঁর মৃত্যুর তিন দশক পরে এক বিস্মৃতপ্রায় কবিকে কীভাবে সাহিত্য জগতে পুনপরিচিত করছেন তা খুবই কৌতূহলজনক এবং আজকের সিলেটের এক বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত দেয়। আবদুল গফ্ফরের সমসাময়িক সিলেট শহরের ব্যক্তিদের স্মারক লেখায় ওঁর সম্পর্কে যে ছবি ফুটে উঠেছে তাতে পাওয়া যায় এক মিশ্র-প্রতিক্রিয়া। তৎকালীন রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সিলেট শহরে সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় প্রগতি লেখক সংঘ এবং মুসলিম সাহিত্য সংসদ গড়ে উঠেছিল।

'প্রগতি লেখক সংঘ' সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী এবং ফ্যাসি বিরোধী আন্দোলনের প্রচারে বিভিন্ন গণসঙ্গীত এবং গল্প কবিতার চর্চা করত। শিল্পী খালেদ চৌধুরী, বর্তমান বাংলাদেশের শিক্ষক সমিতি ও মহিলা আন্দোলনের নেত্রী হেনা দাস, লোকসঙ্গীত গায়ক নির্মলেন্দু চৌধুরী ও অন্যান্যরা হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মঞ্চ থেকে বিভিন্ন গণসংগীত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, সভায়, আন্দোলনে গাইতেন। খালেদ চৌধুরী ও হেনা দাসের স্মৃতিচারণে আবদুল গফ্ফরের রচিত উল্লিখিত গানটি বহুবার গেয়েছেন তার উল্লেখ রয়েছে। আন্দোলনের জোয়ারে বিচিত্রভাবে গানটি জনপ্রিয় হলেও গানের কথাকারকে কেউ তখন বিশেষভাবে মনে রাখেননি বা মনে রাখার প্রয়োজন মনে করেননি। খালেদ চৌধুরী গানটির লেখককে মনে রাখলেও পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে কোনও যোগাযোগ রাখেননি। একথা ওঁর লেখায় স্বীকার করেছেন। এমনকী ছেলে আলি মোস্তাফা

চৌধুরী ওঁর কাছে পিতা আবদুল গফ্ফরের ইতিহাস সংগ্রহ করতে গেলে ওর নামটিও লিখে রাখেননি। কিন্তু 'গুয়া গাছে ট্যাক্সো লাগিলনি' গানটি খালেদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেনা দাস এবং অন্যান্য শিল্পীরা '৪০ দশকের প্রথম দিকে অসমের নানা স্থানে, কলকাতার বিভিন্ন সভায় এবং নেত্রকোনা সম্মেলনে গেয়েছেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শোষণের বিরুদ্ধে গানটি যে খুব শক্তিশালী ছিল তা আজকের স্মৃতিচারণায় জানা যায়। '৪০ দশকে আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরী প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নিয়মিত তিনি ওই বৈঠকে যেতেন তার উল্লেখ করেছেন হেনা দাস। তিনি তাঁর লেখায় স্বীকার করেছেন, কবির গানের গায়িকা হয়েও তিনি কবির পরিচয় জানতেন না। পরবর্তীকালে ওঁর বড় ভাই সত্যব্রত দত্তর আত্মজীবনী থেকে আবদুল গফ্ফরের প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে যোগাযোগের কথা এবং 'গুয়া গাছে ট্যাক্সো লাগিলনি' গানটা সংঘের কোন বৈঠকে গীত হয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন। কবিপুত্র আলি মোস্তাফার উদ্যোগে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির যোগাযোগের মধ্য দিয়ে কবির কীর্তি এবং ব্যক্তিত্ব যে ভাবে উন্মোচিত হয়েছে, তাতে স্মারক গ্রন্থটি সার্থক।*

'নীরব' কবি আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীর পারিবারিক পরিচয় ওঁর জীবনের মতোই বিচিত্র। সাবেক সিলেটের জকিগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাজাধর মৌজার বীরশ্রী গ্রামের বাসিন্দা সর্বানন্দ দত্তর পূর্বপুরুষ মহারাজা ভগবদ দত্ত। দাবা খেলার বাজিতে হেরে গিয়ে শর্তানুসারে সর্বানন্দ দত্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সরল খাঁ নাম নেন। ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি বর্তমান ভারতের অন্তর্গত করিমগঞ্জ অঞ্চলের বাগরসাঙ্গনের দানিশ চৌধুরীর মেয়েকে বিবাহ করেন। সর্বানন্দ দত্তর হিন্দু স্ত্রীর পুত্রদের উত্তরপুরুষ হলেন স্বনামধন্য গুরুসদয় দত্ত এবং আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরী সর্বানন্দ দত্তর মুসলমান স্ত্রীর পুত্রদের উত্তর পুরুষ। বাগরসাঙ্গন গ্রামে আবদুল গফ্ফরের শৈশব এবং বাল্যকাল কাটে। পরবর্তী কালে ওঁর ছাত্রজীবন এবং কর্মজীবন সিলেটের বিভিন্ন স্থানে, করিমগঞ্জে এবং শিলচরে অতিবাহিত হয়।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি কবিতা এবং গল্প লিখতে শুরু করেন। তৎকালীন সিলেট শহরে সাহিত্যচর্চা হত। সিলেট শহরের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ থেকে প্রকাশিত আল ইস্‌লাহ্ পত্রিকায় কবি নিয়মিত লিখতেন। নজরুল ইসলামের সঙ্গে কবির সাক্ষাৎ হয় সিলেট শহরেই। পরবর্তীকালে জসিমুদ্দিন, হুমায়ুন কবির, সুফিয়া কামাল প্রমুখ কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে ওঁর ঘনিষ্ঠতা হয়। আল ইস্‌লাহ্-এর অন্যান্য কর্ণধারদের সঙ্গেও ওঁর হৃদ্যতা ঘটে। ১৯৩০ ও ১৯৪০ দশকে কবি প্রেমের কবিতা ও সনেটের পাশাপাশি বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে অনেক গান ও কবিতা রচনা করেন।

'৪০ দশকে কবির নয়টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। মুনাফা খোরের কবি, গরীবের গান, ভোটের লড়াই-এর কবি, দীওয়ানা, শেরোয়া, হেলাল, মিতালি গান ১ম এবং ২য় খণ্ড এবং মোজহিদের গান। এছাড়া আরও অনেক অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি রয়ে গেছে। সংগ্রাহকদের মতে ৯১৭টি সনেট ৫৯৬টি গান এংব ৭২৪টি কবিতা তিনি রচনা করেন। তাঁর সঙ্গীত ও কবিতায় বিষয়ের বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। তবে আবদুল গফ্ফর যে একজন মানবদরদী ছিলেন তা তাঁর কাব্য পড়লেই অনুভব করা যায়। এত রচনা সত্ত্বেও '৬০ এর দশকে কবি মানসিক অবসাদে ভুগতে থাকেন। হতাশাগ্রস্ত, অস্থিরচিত্ত কবি মানসিক বৈকল্যের শিকার হয়ে পড়েন এবং অচিকিৎসায় ১৯৬৬ সালে মারা যান। আবদুল গফ্ফরের হতাশাগ্রস্ত মনের প্রতিফলন ঘটে বেশ কিছু কবিতা, সনেট এবং গল্পে।

কবিকে নিয়ে স্মারকগ্রন্থ

স্মারকগ্রন্থটিতে ওঁর কবিতা, সনেট এবং গল্প নিয়ে নানা আলোচনায় লেখকরা তাঁর সাহিত্যকৃতিতে মাইকেল মধুসূদন, নজরুল এমনকী বোদলেয়রের ছায়া দেখেছেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে তাঁর লেখা গানগুলির প্রেক্ষাপট ছিল সিলেট জেলার গণ আন্দোলন। আসামের লাইন প্রথাবিরোধী আন্দোলন, সিলেটের গণভোটের আন্দোলন, সুপারি গাছের উপর ট্যাক্স বসানোর বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি চারণ কবির মত 'হেলাল' গ্রন্থের গানগুলি লিখেছিলেন। এমন একটি গানই হল পূর্বোল্লিখিত 'গুয়া গাছে ট্যাক্সো লাগিলনি' রচনাটি। এই গানটি তিনি খালেদ চৌধুরীকে সিলেটের গোবিন্দ পার্কের বেঞ্চিতে শোনান, তার উল্লেখ করেছেন খালেদ চৌধুরী। স্মারক গ্রন্থে হেলালের আরেকটি বিদ্রোহী গানের উল্লেখ রয়েছে—

তস্‌বিহ রাখো দূরে তলোয়ার হাতে নাও
আল্লার রাহে জান কোরবান দাও দাও ...।

স্মারক গ্রন্থের লেখকরা কবি সম্পর্কে বারে বারেই উল্লেখ করেছেন ওঁর ছন্নছাড়া মনোভাবের কথা। স্কুল জীবন থেকে বি.এ. পর্যন্ত তিনি বারবার স্থান পরিবর্তন করেছেন। জকিগঞ্জ, করিমগঞ্জ, শিলচর, সিলেট, করচিয়া এবং পুনরায় সিলেট। কলকাতাতেও ছিলেন কিছুকাল। শিক্ষকতা এবং স্কুল পরিদর্শকের চাকরি ছাড়াও ফ্যাসিবিরোধী প্রচারের কাজে যুক্ত ছিলেন। চাকুরি জীবনের কিছু সময় আত্মীয় গুরুসদয় দত্তর আহ্বানে কলকাতায় ব্রতচারী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু শিকড়ের টানে

* কবি আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরী স্মারকগ্রন্থ। সম্পাদক—মোঃ আবদুল আজিজ/ইসলাম ভিলা, ইসলামপুর, সিলেট-৩১০০/ডিসেম্বর '৯৬

কলকাতা ছেড়ে সিলেট চলে আসেন আবার। তবে গুরুসদয় দত্তর অনুরোধে তিনি সিলেট জেলার লোকসংগীত সংগ্রহ করেছিলেন। এরই মধ্যে সুনামগঞ্জে চাকুরি করাকালীন প্রায় হঠাৎই একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। এ বিবাহ স্থায়ী হয়নি। তেমনই হঠাৎ তিনি কিছুদিন সিলেট শহরের বন্দরবাজারে 'ধূমপায়ী সখা' নামে এক দোকান দিয়ে তামাকের ব্যবসায় শুরু করেন। এটাও বেশিদিন চলেনি।

আবদুল গফ্ফর ওঁর বৈচিত্র্যময় জীবনের অনেক ঘটনার প্রভাবে ছাত্রজীবনেই অনেক গল্প রচনা করেন। স্রোতের শ্যাওলা, মধ্যাহ্ন সন্ধ্যা, মাতৃহারা, সখিয়া, ল্যাংরা আম ইত্যাদির রচনাকাল ১৯৩৫–৩৬ সাল। অল্পবয়সের রচনা হওয়ায় লেখাগুলি খুব পরিণত না হলেও সাধারণ মানুষের দুঃখ, বেদনা এবং মানসিক আঘাতকে তিনি সহজ সরল ভাষায় রচনা করেছেন।

বৃহত্তর সিলেটের লৌকিক ঐতিহ্যের দুটি ধারা। একটি বৈষ্ণব ও অপরটি সুফি। দুটি ধারার মূল উপজীব্য প্রেম। বৈষ্ণব ও সুফি সাধকগণ প্রেমের বিরহ মিলনের পথেই স্বরূপের সন্ধান করেছেন। বাউল এবং মরমী কবিরা গীত রচনা করেছেন এই প্রেমের পথ ধরে। যেমন বাউল রাধারমণ বা মরমী কবি হাসানরাজা এবং কবি আমানের গানের ভনিতায় একই ধরনের পদ লক্ষণীয়। কবি আমান বা আবদুল গফ্ফরের গানেও সেই প্রভাব রয়েছে তার নিদর্শন নিম্নের পদগুলি —

ওরে বন্ধু ওরে নিদারুণ
অন্তরে জ্বালিয়া রেখে গেলে পিরিতের আগুন
মনের আগুনে ঢালি নয়নের জল
নিভিয়া নিভে না আমার পিরিতের অনল।

রাধাকৃষ্ণের প্রেম নিয়ে রচিত একটি গান এইরকম :

সখি কেমনে বাঁধিয়া হিয়া
আমি যত ভুলি আঁখির মলিন
রাখে তারে তত বাঁধিয়া।
আমি কলসী লইয়া যমুনার জলে জল নিতে গেনু সই
আমার কলসী ভাসিল যমুনার জলে জল ভরা হল কই!

অথবা রামপ্রসাদী সুরে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছেন

লুকাবি আর বল্ কোথা মা
ধরেছি ওই অভয় চরণ, ভয় দেখানো মিছে শ্যামা

বৈষ্ণব বা হিন্দু গীতিকাব্যের প্রভাবে যেমন তিনি গান রচনা করেছেন তেমন ইসলামি ঐতিহ্যও ওঁর কবিতায় প্রকাশিত।

জাহানারা, জাহানারা
তোমার-পরশে ফেরদৌস হল কঠিন পাষাণ-কারা
রাজার দুলালী হয়ে তুমি হায়
ভোগ বিলাসের দলিলে দু পায়
পথ ভুলে এলে পথ দেখাইতে
আকাশের ধ্রুবতারা।

আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীর অসংখ্য সনেট বর্তমান বাংলা সাহিত্যে এক আলোচ্য বিষয় হতে পারে। জীবনানন্দ, সুধীন্দ্রনাথ, অশোকবিজয় রাহা প্রমুখ ওঁর সমসাময়িক। ১৯৩০ থেকে ১৯৪২ এই সময়ে কবি প্রায় এক হাজারটি সনেট রচনা করেছিলেন। কিন্তু তার অনেকগুলিই অপ্রকাশিত রয়ে যায়। অপ্রকাশের বেদনাই কবিকে অপ্রকৃতস্থ করে তুলেছিল। অপ্রকাশিত সনেটগুচ্ছ 'অশ্রুলেখা'র একটি হল 'আব্দার'।

যদি মোর গানে জমে না তোমার সুর
বল সখা তুমি মোরে যাবে কি পাসরি?
তুমি শ্যাম আমি তব মোহন বাঁশরী
কেমনে আমারে ছারি চলে যাবে দুরে?

নয় শতাধিক সনেট রচয়িতা কবি যুগন্ধর না হলেও রোমান্টিকতা ও মানবতাকে জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছিলেন '৪০-এর দশকে উদ্দীপ্ত সিলেটে তরুন কবির দুরন্ত রোমান্টিকতা এবং মানববোধ তাঁকে যতখানি সৃষ্টিশীল করেছিল, পরবর্তী দশকগুলি সম্ভবত সেই পরিবেশ এবং প্রেরণা দিতে পারেনি। ফলে কবির মনের গতিময় ভাবনার বহিঃপ্রকাশ না ঘটার ফলে কবি মানসিক বৈকল্যের শিকার হন এবং মধ্য বয়সেই মারা যান। বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য দুটি উপন্যাস — 'গায়ত্রি সন্ধ্যা' এবং 'খোয়াবনামা'য় হতাশাগ্রস্ত এবং মানসিক রোগগ্রস্ত কবি সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবীর চরিত্র বিশেষভাবে পাই। এটা কি একটা সময়ের প্রতিফলন? তা স্মারক গ্রন্থের আলোচনায় পেলে ভাল হত।

সে কালের সিলেট

আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীর সময়কালে সিলেটের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ ছিল খুবই গতিশীল। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী গণআন্দোলন, হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেতৃত্বে গণসঙ্গীতের দল, প্রগতি লেখক সংঘ ইত্যাদির কার্যকলাপ সিলেটের সারস্বত সমাজকে যেমন উজ্জীবিত করেছিল, অন্যদিকে মুসলমান শিক্ষিত সমাজের উদ্যোগে, কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ ও তার পত্রিকা আল ইস্‌লাহ্-এ নিয়মিত সাহিত্য চর্চা চলত। তাছাড়া লোকসঙ্গীতের ধারা খুবই শক্তিশালী।

সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, ফ্যাসি বিরোধী এবং কমিউনিস্ট আন্দোলনে সিলেট অগ্রণী ছিল। সুর্মাভ্যালি কালচারাল ফ্রন্ট, সুর্মাভ্যালি ছাত্র ফেডারেশন এবং ফ্যাসি বিরোধী প্রগতিশীল

লেখক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস, খালেদ চৌধুরী, নির্মলেন্দু চৌধুরী, হেনা দাস, সত্যব্রত দত্ত, অশোকবিজয় রাহা প্রমুখ। সিলেটের কমিউনিস্ট সংগঠনের তৎকালীন নেতা সত্যব্রত দত্ত এবং ওঁর দাদা বরীন দত্ত (আবদুস সালাম) সিলেটের কমিউনিস্ট আন্দোলনে সুপরিচিত নাম। সিলেটের অনেকেই টঙ্ক আন্দোলন ও অন্যান্য আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় রাজনৈতিক আন্দোলনও তীব্র হয়ে ওঠে। আবার এই ধারার পাশাপাশি খেলাফত আন্দোলনপরবর্তী শিক্ষিত মুসলিম জাগরণ থেকে উদ্ভূত মুসলিম সাহিত্য সংসদ মুসলিম সাহিত্যিকদের বাংলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা এবং আরও পরে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু না বাংলা, এ নিয়ে বিতর্ক আলোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল সিলেট। আল ইস্‌লাহ্, যুগবাণী, নওবেলাল প্রভৃতি সাহিত্য ও রাজনৈতিক পত্রিকা সিলেটের মুসলিম মানসের প্রতিফলন।

কথিত আছে শাহ জালাল কর্তৃক সিলেট জয়ের পরে 'হিন্দু বাংলা' পরিহারের জন্য সিলেটের মুসলমানেরা 'ছিলট নাগরী' বা 'সিলেট নাগরী' ভাষার প্রচলন করেছিল। সুতরাং সাহিত্য সংস্কৃতিতে সিলেটের স্বকীয়তা বজায় রাখার চেষ্টা সিলেটের সমাজে বহু দিন থেকেই ছিল। অন্যদিকে হিন্দু সমাজ ও সাহিত্যে মুসলিম বিদ্বেষের ফলে মুসলিম সাহিত্যের স্বকীয়তাবোধ ও চর্চা বৃদ্ধি পায়। সিলেট শহরে মুসলিম সাহিত্য সংসদের সম্পাদক নুরুল হকের স্মৃতি কথায় জানা যায় মুসলিম সাহিত্য সংসদ গড়ে ওঠার কথা।

খেলাফত আন্দোলনের পর স্বাধীনতার জন্য শহরবাসী মুসলমানেরা হিন্দুদের সঙ্গে স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হল। তখন থেকেই হিন্দু জাতীয়তাবোধের পাশাপাশি মুসলিম জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটল। সিলেটের খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা আব্দুল হকের আহ্বানে ডা. মুর্তজা চৌধুরী প্রমুখ সমগ্র সিলেটের প্রতিষ্ঠিত মুসলমান ব্যক্তিত্ব আন্দোলনে যোগ দেন। ওই সময় জাতীয় মাদ্রাসার অধ্যাপকেরা স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাবে খদ্দর পরতে শুরু করেন।

মুহম্মদ নুরুল হক ওঁর স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেছেন কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদে আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরী এবং আবদুল রেজ্জাকের সম্বর্ধনা সভার কথা। প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সাহিত্যিকদের সঙ্গে সংসদের যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল তার বিবরণও তিনি দিয়েছেন।

পূর্ব-পাকিস্তান গঠিত হবার পরই রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে মুসলমান বিদ্বৎ সমাজ সরব হয়ে ওঠেন। সিলেট ছিল এ বিষয়ে অগ্রণী। 'আল ইসলাহ' ও তমুদ্দন মজলিস, নওবেলাল প্রভৃতি প্রকাশনা এবং কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ সিলেটের জনমানসে বাংলা ভাষার সম্পর্কে চেতনার সূচনা করে। ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলনেও সিলেট ছিল অগ্রণী। জোবেদা খাতুন সহ অনেক মুসলমান নারী বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলনে সামিল হন। এই সময়েই আবদুল গফ্ফরের 'হেলাল' কাব্যগ্রন্থটির প্রকাশ। ১৯৭১ সালের পর সিলেটের সামাজিক চেহারার অনেক পরিবর্তন ঘটে। সিলেটবাসীর বিদেশযাত্রা এবং ধনোপার্জনই এক প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে ওঠার ফলে সিলেটের সাহিত্য চর্চা এবং লোকসঙ্গীতের ধারা অনেকটা ম্রিয়মান হয়ে পড়ে। শিক্ষা সমীক্ষার কয়েক দশকের চিত্রে সিলেটের শিক্ষার হারের ক্রমাবনতি লক্ষণীয়। আশির দশক থেকে সিলেটের শিক্ষিত ব্যক্তিদের অনেকেই আজ মসজিদ মাদ্রাসা নির্মাণের জন্য ব্যাপক অর্থ সংগ্রহ করছেন। বিপরীতে সিলেটের শিক্ষিত উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিরা এবং প্রবাসী সিলেটিরা সিলেটের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করছেন। এই প্রচেষ্টার অন্যতম নিদর্শন স্মারক গ্রন্থটির প্রকাশনা ও তার জন্য কয়েক বছর ধরে একাধিক ব্যক্তির প্রচেষ্টা।

সেকালের সিলেটকে ফিরে পেতে চাই

চল্লিশের দশকে সিলেটের একজন সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতন ব্যক্তিকে বিস্মৃতির গভীর গহ্বর থেকে বার করে নিয়ে আসার পিছনে যে তাগিদ কাজ করছে, তা আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীর ব্যক্তিত্ব বা সাহিত্যকৃতির মতোই কৌতূহলোদ্দীপক।

সিলেটের আধুনিকতার ইতিহাসে দুটো ধারা চলেছে পাশাপাশি। কখনও কখনও যোগাযোগ হলেও দুটি ধারার স্বাতন্ত্র্য থেকে গিয়েছিল। একদিকে শাহ্ জালালের সিলেট। তারপর মুসলমান সমাজের সাহিত্য, গ্রন্থাগার আন্দোলন, প্রকাশনা ইত্যাদি; অন্যদিকে সামগ্রিক এক 'হিন্দু' পরিবেশে স্বদেশি, অসহযোগ, কমিউনিস্ট আন্দোলন, গণসঙ্গীত চর্চা ইত্যাদি। সিলেটের আধুনিকতার একালেও এই কাঠামোর কোনও মূল পরিবর্তন আসেনি। একদিকে উদারতাবাদ, অন্যদিকে চিরায়ত লোকসাহিত্য চর্চা। আধুনিকতার এই দ্বৈতরূপের ভুবনে চল্লিশের সিলেট এক অতিকথাময় রূপ গ্রহণ করেছে — সাম্যবাদী আন্দোলন, উপনিবেশবাদ বিরোধিতা, গণসংস্কৃতিচর্চা, এই সব উপাদানে অম্বিত চল্লিশের সিলেট আজকের মানসলোকে প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে; এই অতীত এমন এক মানসিকতার চিহ্ন যা তদানীন্তন এবং আজকের দ্বিধাবিভক্তির উর্ধ্বে। অতীত চর্চায় অতিকথা, বাস্তবতা সবসময় মিলেমিশে থেকেছে। অতিকথার তাগিদে অতীত আবিষ্কৃত হয়েছে নানা রঙে, নানা রূপে, নানা ব্যক্তিত্বে। সত্য পাওয়া যায় এই রকমই অতিকথার তাগিদে। আবদুল গফ্ফর দত্ত চৌধুরীকে আমরা আজ খুঁজে পেয়েছি এমনই এক প্রক্রিয়ায়। □

■ গ্রন্থসমালোচনা

‘অনুমোদিত জীবনী’ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের অরাজনৈতিক উপস্থাপনা

পুলকনারায়ণ ধর

জ্যোতিকিরণ বসু ওরফে গণা এবং অজ্ঞাতবাসে ‘বকুল’ ও বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দোর্দণ্ডপ্রতাপ মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর একটি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘জীবন স্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন স্মৃতির পটে জীবনের ছবি যে আঁকে ‘সে আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দেয়, কত কী রাখে। কত বড়কে ছোট করে, ছোটকে বড় করিয়া তোলে।’ লেখিকা সুরভি বন্দোপাধ্যায়ও আপনার অভিরুচি অনুসারে কত কী বাদ দিয়ে ছোটকে বড় এবং বড়কে ছোট করে স্বয়ং জ্যোতি বসুরই ‘অনুমোদন’ লাভ করে একটি ‘অনুমোদিত’ জীবনী উপহার দিয়েছেন।

ভূমিকায় লেখিকা জানাচ্ছেন জ্যোতি বসুর ‘রহস্যময়, জটিল ও বহুব্যাপ্ত ব্যক্তিত্বের পরত উন্মোচন করা’ তাঁর কাছে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ। ‘মিথ্ এর আলোকচ্ছটা ভেদ করে ভেতরের মানুষটিকে আবিষ্কার করার’ প্রবল তাগিদে লেখিকা ‘আপাত বিরোধী বৈশিষ্ট্যের অদ্ভুত সমন্বয়ে গঠিত, জ্যোতি বসুর জীবনী রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন।

লেখিকার সুরভিত চোখে জ্যোতি বসু একজন মাটি ছোঁয়া ‘নক্ষত্র তারকা।’ জীবনী গ্রন্থের বিষয় হিসাবে জ্যোতি বসুকে বেছে নেবার কারণ ‘জ্যোতি বাবুর বহির্জীবন এক অজেয় সাফল্যের মডেল’ আর অন্তর্জীবন ‘মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মানুষের যতটা জানা আছে, তার থেকেও অজানা’। আর লেখিকা যেহেতু বিদেশে গেলেই প্রথম খোঁজ করেন জীবনীগ্রন্থ এবং অধ্যাপক জীবনে ক্লাসরুমেও জীবনী পড়াতে হয়েছে তাই তাঁর উপলব্ধি হয়েছে ‘গবেষণালব্ধ জীবনীর আর এক নাম অনুসন্ধান।’ জ্যোতি বসুর এই ‘অনুমোদিত’ জীবনীগ্রন্থটি লেখিকার এই গভীর উপলব্ধিসঞ্জাত।

লেখিকা ইতোপূর্বে জ্যোতি বসুর একটি ইংরাজি জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৯৭-এর ফেব্রুয়ারিতে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তিনি দাবি করেছেন এই গ্রন্থটি তাঁর ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদ নয়, ‘সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থ।’ ইংরাজি গ্রন্থটির সঙ্গে যাদের পরিচয় ঘটেছে ‘সম্পূর্ণ নতুন গ্রন্থ’ হিসাবে বাংলা গ্রন্থটি থেকে তাদের বিশেষ কিছু পাবার আছে বলে মনে হয় না। দুটি গ্রন্থ প্রকাশের মধ্যে সামান্য কালের ব্যবধানে তিনি অন্য কোন জ্যোতি বসুকে আবিষ্কার করলেন তা বোঝা গেল না। নতুন ঘটনা বলতে দেবগৌড়ার পরিবর্তে গুজরালের প্রধানমন্ত্রীত্বে অভিষেকের নাটক ছাড়া ভারতের রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে উল্লেখযোগ্য আর কিছু ঘটেনি।

এই ঘটনা এবং এতে জ্যোতি বসুর ভূমিকা তিনি বর্ণনা করেছেন বাংলা সংবাদপত্রগুলির পরিবেশিত সংবাদের ভিত্তিতে বিশ্লেষণহীন গতানুগতিক ধারায়। অবশ্য ইংরাজি গ্রন্থটির ভুল ভ্রান্তিগুলির কিছু সংশোধন করা হয়েছে বাংলা গ্রন্থটিতে। যেমন ‘তেভাগা’ আন্দোলনের ‘তেভাগা’র অর্থ করেছিলেন ফসলের এক-তৃতীয়াংশ। বাংলায় দুই-তৃতীয়াংশ। পুলিশ ইন্সপেক্টর-জেনারেল ইংরাজি গ্রন্থে হিতেন সরকার। বাংলায় হীরেণ সরকার। জনতা পার্টির সরকারের পতনের সময় জ্যোতি বসু ইংরাজি গ্রন্থে ছিলেন ‘বুখারেস্টে’। বাংলায় ‘ওয়ারস’তে। ইংরাজি গ্রন্থে Dacres Lane হয়েছে Dekkers Lane। বাংলায় তো ‘ডেকার্স’ লিখলেই ল্যাটা চুকে গেল। এই ধরনের আরও কিছু কিছু ভ্রান্তি সংশোধন প্রশংসনীয়। তবে তা কোনও অবস্থাতেই গ্রন্থের নবজন্ম নয়।

জ্যোতি বসু সম্পর্কে যে ‘মিথ্’-এর কথা লেখিকা উল্লেখ করেছেন তা তাঁর রাজনৈতিক জীবনে কীভাবে গড়ে উঠল সে সম্পর্কে কোনও বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা নেই। জ্যোতি বসুর পিতা নিশিকান্ত বসু ছিলেন ডাক্তার। ছেলেকে বিলেত পাঠিয়েছিলেন আই সি এস বা ব্যারিস্টার করার জন্য। দেশের মাটির রাজনীতি বা স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা কোনও রকম সেবামূলক কাজের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার কোনও পারিবারিক পশ্চাৎপট নিশিকান্ত বসুর ছিল না। কলকাতায় স্কুল কলেজে পড়ার সময়ও জ্যোতি বসুর এ ব্যাপারে কোনও আগ্রহ ছিল না। তৎসত্ত্বেও জ্যোতি বসু দেশে ফিরে এলেন (১৯৪০) ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্ত-র কাছ থেকে কমিউনিস্ট রাজনীতির মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে। ব্যারিস্টারের তক্‌মা থাকলেও এবং কয়েকদিন হাইকোর্টে গিয়ে বসলেও শেষ পর্যন্ত অর্থ উপার্জনের পথ ছেড়ে ট্রেড ইউনিয়ন ও পার্টির কাজে মনোনিবেশ করলেন এবং ধাপে ধাপে পার্টির নেতা তথা ‘জনগণের নেতায়’ উত্তীর্ণ হলেন। বাংলার আইন পরিষদে বিরোধী নেতা হিসাবে তাঁর ভূমিকা তাঁকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিল। এ সবই সাদামাটা এবং সর্বজনবিদিত ঘটনা। জ্যোতি বসুও অন্যত্র এ সব লিখেছেন

বরং বিলেতে রজনী পাম দত্ত সম্পর্কে জ্যোতিবাবুর মূল্যায়ন বা তাঁর সম্পর্কে জ্যোতিবাবুর কাছে শোনা তাঁর জীবন চর্যার কাহিনী যা ভারতের কমিউনিস্টদের, যারা বিদেশে তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের প্রত্যেককেই প্রভাবিত করেছিল। লেখিকা সে বিষয়ে অজানা তথ্য কিছু জানাতে পারতেন।

জ্যোতিবাবুর রাজনৈতিক উত্থান দেখাতে গিয়ে লেখিকা জোর দিয়েছেন তাঁর কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও বিলাসবিমুখতার ওপর। এ সবই এককালে তাঁর সম্বন্ধে সত্য ছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে সে-সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের মধ্যে পরিশ্রমী ও নিষ্ঠাবান কর্মীর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা সর্বত্যাগী ব্যক্তিও বিরল ছিল না। জ্যোতি বসুর তো তবু ঘর বাড়ি ছিল। দিনান্তে গৃহে ফিরে যেতেন। অনেকেরই সে বালাই ছিল না। সুতরাং কষ্টস্বীকারের মাহাত্ম্যে জ্যোতি বসুর ‘মিথ’ তৈরি হয়েছে তা মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। যে-রাজনৈতিক পটভূমি এবং ঊনবিংশ-শতাব্দীর মধ্যবিত্ত বাঙালি মানসিক ধারা জ্যোতি বসুদের মতন বিলেত ফেরত ব্যারিস্টার ডাক্তারদের সামাজিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্র প্রস্তুত করে সে-সম্পর্কে কোনও ধারণা না থাকলে জ্যোতি বসুর ধাপে ধাপে ওপরে ওঠা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। সবচেয়ে বড় কথা জ্যোতি বসু দেশে প্রত্যাগমনের বহু পূর্বেই ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নানা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল। মীরাট ষড়যন্ত্র মামলায় ভার্রতের কমিউনিস্ট পার্টি সমস্ত দেশে একটি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিল। জ্যোতি বসু বিলেত থেকে এসে একটি প্রস্তুত ক্ষেত্র পেয়েছিলেন। তাঁর বিলেতি শিক্ষা ও পারিবারিক আভিজাত্য এদেশের মুগ্ধ মধ্যবিত্তদের কাছে তাঁকে এক লহমায় অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছিল। সে সময় কমিউনিস্ট পার্টিতে বিলেতফেরতদের কদর ছিল। এটা ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিক ধারার ফল। শিক্ষিত ও বনেদী ঘরানার ব্যক্তিরাই বাঙালির ‘ন্যাচারাল লিডার’ হিসাবে গৃহীত ও আদৃত হয়ে এসেছেন। এই সামাজিক বাতাবরণ জ্যোতি বসুর ক্ষেত্রে বিশেষ অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। জ্যোতি বসু কোনও কালেই পার্টির সাধারণ কমরেড বা কর্মী হিসাবে বিবেচিত হননি। আপদে বিপদে তিনি পার্টি ত্যাগ করেননি বটে কিন্তু মলিনবসন বা উস্কোখুস্কো বাউণ্ডুলে চেহারার কমরেড হবারও কোনও আগ্রহ তাঁর ছিল না। তাঁর চারিত্রিক গঠন অন্যান্য সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে একাত্মতা বোধের উপযুক্ত ছিল না। তাই পার্টির মধ্যে প্রমোদদা, সরোজদা বা সমরদা থাকলেও জ্যোতি বসু কিন্তু জ্যোতিদা হননি। তিনি সকলেরই জ্যোতি বাবু। সাধারণ কর্মীদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর এই ব্যবধান সুরভির কলমের খোঁচায় উবে গেছে যা একেবারেই বাস্তব নয়। এটাও বলা ভাল যে রেলকর্মী ইউনিয়নের সঙ্গে জ্যোতি বসু যুক্ত হলেও আসল কাজ করতেন কমল সরকার, বীরেশ দাশগুপ্ত, নিখিল মৈত্র, (পরে পুলিশের চর অপবাদে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হন) প্রমুখ নেতারা। ক্ষুদ্র কমিউনিস্ট পার্টির সামান্য কিছু পেটি-বুর্জোয়া ও শ্রমিকদের একাংশের মধ্যেই জ্যোতি বসুর রাজনীতির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে তাঁর নাম থাকলেও তিনি উঁচুদরের ট্রেড ইউনিয়নওয়ালা ছিলেন না। সুরভির বই পড়লে উল্টোটা মনে হয়। জ্যোতি বসুর যে ‘ইমেজ’ ধীরে ধীরে পার্টি ও জনমানসে গড়ে উঠেছে যাতে সবচেয়ে বেশি সহায়ক হয়েছে আইনসভার সদস্য হিসাবে তাঁর দক্ষতা। বিরোধী নেতা হিসাবে জ্যোতি বসুই ছিলেন সকলের লক্ষ্যবস্তু। খবরের কাগজও স্বাভাবিক কারণেই উচ্চশিক্ষিত, ভদ্র, রুচিসম্পন্ন ব্যারিস্টার নেতা জ্যোতি বসুকেই খবরের শিরোনামে স্থান দিত। মাঠে ঘাটে বা খেতে খামারে অন্যান্য নেতার মতন ঘোরাঘুরি না করেও শীততাপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে আইন ও রাজনীতির তর্ক বিতর্কে উত্তাপে জ্যোতি বসু জনসাধারণের কাছে বিশেষ পরিচিতি ও মর্যাদা লাভ করেছিলেন। সংসদীয় রাজনীতি ও বাবু রাজনীতিতেই জ্যোতি বসু ছিলেন বেশি স্বচ্ছন্দ। সুতরাং লেখিকা যখন বলেন ‘সংসদীয় বৃত্ত এবং সংসদের বাইরের বৃত্ত—উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর প্রধান ভূমিকা ছিল’ (পৃ: ৬৯) তা সত্যের অপলাপ ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রকৃতি ও কার্যধারা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতারই পরিচায়ক। দলের ওপর জ্যোতি বসুর প্রধান কর্তৃত্ব সে সময় প্রতিষ্ঠিত ছিল না। লেখিকা জ্যোতি বসুর বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীত্বের ‘ইমেজ’ প্রক্ষিপ্ত করেছেন সে কালের জ্যোতি বসুর ওপর। পার্টির নির্দেশ মেনে চলাটাই জ্যোতি বসু প্রধান কর্তব্য জ্ঞান করতেন। আদর্শ বা মার্কসবাদের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কচ্‌কচি করা তিনি কোনও দিনই তেমন পছন্দ করেননি। বরাবরই তিনি ‘প্র্যাগম্যাটিক’ রাজনীতিবিদ বলে পরিচিত। কোনও অর্থেই তাঁকে ‘সৃজনশীল মার্কসবাদী’ (Creative Marxist) বলে অভিহিত করা যায় না। তাই দলের অভ্যন্তরে জ্যোতি বসু বিতর্কিত ব্যক্তিত্বে পরিণত হননি। জ্যোতি বসুর উন্নতির এটিও একটি কারণ। অবিভক্ত বাংলার ‘প্রিমিয়ার’ সুরাবর্দি (সুরভি যাঁকে বরাবর ‘মুখ্যমন্ত্রী’ বলে গেছেন) এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ড. বিধানচন্দ্র রায়ের জ্যোতি বসুর প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ও স্নেহ প্রদর্শনও তাঁর ‘ইমেজ’ বর্ধনে সহায়তা করেছিল। দেশ ভাগের প্রাক্কালে মুসলিম লিগের প্রতি কমিউনিস্ট পার্টির কৌশলগত নরম মনোভাব, মুসলিম লিগের (বাংলায়) ম্যানিফেস্টো রচনায় কমিউনিস্টদের সাহায্য করা এ সব সংসদীয় রাজনীতি ও বিপ্লবের মাঝামাঝি ঘটনাবলী আইন সভার সদস্য জ্যোতি বসুর ধাপে ধাপে উত্থানের সহায়ক হয়েছিল। জ্যোতি বসুকে এই পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে গেলে

কমিউনিস্ট পার্টির নীতি বিশ্লেষণ না করলে চলে না। সুরভি সেই বিশ্লেষণের ধারকাছ দিয়ে যাননি। ১৯৪৮ সালের রণদিভের উগ্রবাম রাজনীতির ফলে কমিউনিস্ট পার্টির যে ক্ষতি হয়েছিল তা সংশোধনকল্পে যে নতুন নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল জ্যোতি বসুকে নেতৃত্বের ধাপে উঠে আসতে তা সাহায্য করেছিল। নির্বাচনে সাফল্য লাভের চেয়ে আমাদের রাজনীতিতে বড়-সাফল্য কোনও কালেই ছিল না; জ্যোতি বসুকে এই নির্বাচন-সাফল্য বার বার জনগণের সামনে নিয়ে এসেছে। এখানে পার্টির ভূমিকাই ছিল প্রধান। লেখিকা পার্টির নীতিনির্ধারণ বা কৌশলের ব্যাখ্যায় না গিয়ে জ্যোতি বসুর রাজনৈতিক জীবন থেকে কি শেখা যায় এই 'চাবি প্রশ্নের' (ইংরাজি key question এর লেখিকার অনুবাদ!) উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। তিনি কিছু পেলেও পাঠকের কোনও উত্তর মেলেনি।

ভবানী সেন, সোমনাথ লাহিড়ীর মতন তাত্ত্বিক নেতাদের পাশে জ্যোতি বসু নিষ্প্রভ। এঁদের সঙ্গে জ্যোতি বসুর সম্পর্ক পার্টির বৃত্তে কেমন ছিল এবং পার্টির অভ্যন্তরে 'গোষ্ঠী' রাজনীতিতে জ্যোতি বসুর কি ভূমিকা ছিল জ্যোতি বসুর যে কোনও জীবনীকারের কাছে তার গুরুত্ব পাবার কথা। কিন্তু বর্তমান জীবনী গ্রন্থটি গোটাটাই সুরভিত দৃষ্টিকোণ থেকে লিখিত। ফলে কটু কোনও বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত তাঁর কাছে প্রত্যাশা করাই বৃথা।

কমিউনিস্ট পার্টি ভাগ হবার আগে জেলে থাকতেই 'জ্যোতির গ্রুপ' ও 'প্রমোদের গ্রুপ' বলে পরিচিত জ্যোতি বসু ও প্রমোদ দাশগুপ্তের যে দুটি গোষ্ঠী ছিল নবগঠিত সি.পি.আই (এম) পার্টিতে পরবর্তী কালে তাদের সম্পর্ক কেমন ছিল অথবা সিপিআই ও সিপি(এম) পার্টি গঠিত হবার পূর্বমুহূর্তে কোন দিকে জ্যোতি বসু যোগ দেবেন তা নিয়ে তাঁর দোদুল্যমানতা কতটা ছিল এ সব প্রশ্নের কোনও আলোচনা গ্রন্থটিতে পাওয়া গেল না। যেন এমন কোনও ঘটনাই জ্যোতি বসুর জীবনে ঘটেনি।

লেখিকার দৃষ্টিতে কমরেডদের প্রতি জ্যোতি বসুর অত্যন্ত 'প্রটেকটিভ' ইমেজ ধরা পড়েছে। এক সময় প্রেসিডেন্সি জেলে অনিল বিশ্বাসকে এম. এ পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন সুপারিনটেন্ডেন্টকে বলে। ব্যাস্? হাতের কাছে অনিল বিশ্বাস ছাড়া আর কোনও 'প্রটেকটেড' কমরেডের দৃষ্টান্ত লেখিকা পেলেন না কেন সেটাই প্রশ্ন। জ্যোতি বসুর সহমর্মীতার গভীরতা প্রমাণ করতে জানাচ্ছেন যতীন চক্রবর্তীর মেয়ের মৃত্যুর পর তাঁকে তিনি সমবেদনা জ্ঞাপন করতে গিয়েছিলেন। জ্যোতি বসুর মতন 'কিংবদন্তী' নায়কের উদারতা ও মহত্ত্ব অনুধাবনে তিনি আর বিশেষ কিছুই পেলেন না।

দেশবাসী জানে যে জ্যোতি বসু বিদেশে যান পশ্চিমবঙ্গে উন্নয়নের স্বার্থে অনাবাসী ভারতীয়দের বিনিয়োগে উদ্বুদ্ধ করতে। সুরভির বই পড়ে জানা গেল 'বিদেশে গেলে বসু এখানে যে স্বাধীনতাটুকু পাননি, সেই স্বাধীনতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন। দোকান বাজার করা, শপিং ব্যাগ বওয়া, রাস্তায় হেঁটে যাওয়া, এমন কী স্ট্রবেরি খেত থেকে স্ট্রবেরি তুলে খাওয়া আর মনের সাধে আইসক্রীম খাওয়ার মতো নির্ভেজাল আনন্দও উপভোগ করেন'।

'বিদেশে থাকার সময় দেশের সমস্যা নিয়ে জর্জরিত থাকাটা বসুর পছন্দ নয়। রোজই কলকাতা থেকে ফোনে খবরাখবর যেত, উনি নানা পরামর্শ দিতেন, শুনে নিতেন, কিন্তু বেশিক্ষণ মাথা ঘামাতে তাঁর খুব একটা ভাল লাগত না' (পৃ: ১২৫)। এই ভাবে লেখিকা 'বিশুদ্ধ রাজনৈতিক জীবনী এবং ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ জীবনকথার মাঝামাঝি' জ্যোতি বসুর যে কাহিনী লিখেছেন তা জ্যোতি বসুর বিরুদ্ধে বিরোধীদের প্রচারকেই স্বীকৃতি দিচ্ছে।

জ্যোতি বসু বার বার বলেছেন মোরারজি দেশাই-এর সরকারের ওপর থেকে পার্টির সমর্থন তুলে নেওয়া ভুল হয়েছিল। এবং সম্প্রতি কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকারে তাঁর নিজের প্রধান মন্ত্রীত্বের পথে পার্টির বিরুদ্ধসিদ্ধান্ত 'ঐতিহাসিক ভ্রান্তি'। লেখিকা কিন্তু জ্যোতি বসুর কাছে এর তাত্ত্বিক দিক নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলেননি। বোধ হয় জ্যোতি বসুর কাছে এই বিষয়ে 'অনুমোদিত' প্রশ্ন করার অধিকার ছিল না। তাই লেখিকা এ বিষয়ে সংবাদপত্রে পরিবেশিত তথ্যের বাইরে যাবার ভরসা করেননি। জীবনীকার হিসাবে এটা লেখিকার দুর্বলতা বা মতামত হিসাবেই বিবেচিত হবে। অনেক প্রশ্নই তোলেননি। যেমন ইংরাজি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সরকারের নীতিতে তিনি নিজে কতটা তৃপ্ত অথবা প্রশাসনে ও পার্টিতে দুর্নীতির প্রশ্নে তাঁর ভূমিকা কতটা সার্থক ইত্যাদি। লেখিকা জ্যোতি বসুর মোটামুটি একটা পছন্দের খাদ্য তালিকাও দিয়েছেন — দেশি ও বিদেশি। এই তালিকায় আশ্চর্যজনকভাবে কোনও সুপেয় পানীয় নেই। স্নেহাংশু আচার্যের মতন দরাজ মনের মানুষের কথা ও জ্যোতি বসুর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিনের সখ্যতা 'ভেতরের মানুষটা'কে বুঝতে সাহায্য করে। এমন সুন্দর একটি বিষয় এড়িয়ে না গেলে জ্যোতি বসুর অন্যতর মনোগ্রাহী চিত্র পাওয়া যেত।

লেখিকা ১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক আইন পরিষদে হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে জ্যোতি বসুর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে বুর্জোয়া নির্বাচনের কারচুপির কথা বলেছেন। কিন্তু তিনি একটু পুরনো কমরেডদের কাছে অনুসন্ধান করলেই জানতে পারতেন যে জ্যোতি বসুর জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সে সময় বুর্জোয়া কারচুপি প্রথার সদব্যবহারই করেছিল। এ প্রসঙ্গে লেখিকার মন্তব্য খুবই হালকা। এ ধরনের হালকা কথাবার্তা বইটির নানা জায়গায় ছড়ানোছিটানো আছে। যেমন ১৯৫৯ সালের খাদ্য আন্দোলন প্রসঙ্গে দায়সারা গোছের দু'চার কথা

বলেই জানাচ্ছেন 'নিহতও হলেন কয়েকজন।' সেই আন্দোলনে যে আশি জন কৃষক নিহত হয়েছিলেন সে তথ্য জীবনীলেখিকা কি সংগ্রহ করার সময় পাননি?

আসলে এদের সম্বন্ধে বা রাজনীতি সম্বন্ধে একটু কম লিখলেও চলবে বলেই তিনি ধরে নিয়েছেন কারণ তিনি লিখছেন এমন একজনের জীবনী যাঁর সম্পর্কে রুসি মোদি বলেছেন: '(জ্যোতি বসু) ভারতের রাজনীতিতে একমাত্র ভদ্রলোক।' সুরভিও তাঁর লেখায় জ্যোতিবাবুকে আগে ভদ্রলোক ও পরে কমিউনিস্ট হিসাবে উপস্থিত করেছেন। এই বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে অনতিঅতীতে একটা বির্তকেরও সৃষ্টি হয়েছিল।

জ্যোতি বসু জীবদ্দশায় 'কিংবদন্তী রাষ্ট্রনায়ক' (পৃ: ২৫২)। এর আসল রহস্যটা লেখিকার মতে নিহিত আছে 'তাঁর বিশেষ কয়েকটি চারিত্রিক গুণের সমন্বয়ে।' একবার বলছেন, 'জ্যোতিবাবু অন্তরে শিশুর মতন সরল (পৃ: ২৫২) আবার বলছেন, তাঁর গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলি অনেক সময় মেলান যায় না।' 'এক কথায় জটিল, বহুস্তরী ব্যক্তিত্ব... কমিউনিস্ট ধ্যানধারণায় স্থির প্রত্যয়ের মানুষ অথচ অদ্ভুত উদার, প্রগতিশীল, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। ...সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এখনও বিশ্বাস অথচ প্রখর বাস্তববুদ্ধি দ্বারা চালিত' (পৃ: ২৫২)। এ সব কথার মানে কি? কমিউনিস্টদের কি বাস্তববুদ্ধি ও উদারতা থাকতে নেই? তবে কি জ্যোতি বসুর বাস্তববুদ্ধি মার্কসবাদ বিচ্যুত ভাবনা দ্বারা পরিচালিত? সমাজতন্ত্রে অটল বিশ্বাসী হলেও যে-সব বুর্জোয়াগুণে জ্যোতি বসু সুষমামণ্ডিত, সুরভিদের মতন লেখিকারা সেই আকর্ষণেই এমন মানুষের জীবনের সৌরভ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। অটলবিহারী বাজপেয়ী বোধ হয় এই কারণেই জ্যোতি বসুকে বলে ছিলেন 'আপনি ভুল পার্টিতে আছেন।'

লেখিকার কমিউনিজম সম্পর্কে সামান্যও ধারণা থাকলে জ্যোতি বসু সম্পর্কে এমন অকপটে এ সব কথা লিখে জবরদস্ত কমিউনিস্ট নেতা হিসাবে তাঁকে প্রতিস্থাপিত করতে কুণ্ঠিত হতেন। লেখিকার মুশকিল হয়েছে এই যে রাজনীতিটাই উনি বোঝেন না। সুতরাং রাজনীতির মানুষের জীবনী রচনা তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। তা না হলে তিনি নিশ্চয় বুঝতে পারতেন যে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের লড়াকু বিরোধী নেতার 'ইমেজ' আর আজকের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর 'ইমেজ' এক নয়। মুখ্যমন্ত্রিত্ব তাঁর পূর্বতন 'ইমেজ'কে অনেকটাই ম্লান করে দিয়েছে। যদিও বর্তমান অবস্থান তাঁকে একটা সার্বিক রাষ্ট্রীয় মান্যতার মহিমা দান করেছে। পশ্চিমবঙ্গের বাইরে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে জ্যোতি বসু যতটা 'মিথ্' আজ পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে সেই 'মিথ' আছেন কিনা সেটা সন্দেহের। যে-ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে (১৯৫৩) আন্দোলন করে মুকুটহীন রাজার সম্মান পেয়েছিলেন সেই ট্রাম ভাড়া তাঁকেই বাড়াতে হয়েছে যখন সত্যিকারের মুকুট পরে-ই তিনি পশ্চিমবঙ্গের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। অসংখ্যবার গুলিচালনার ঘটনা ও বড় বুর্জোয়াদের সঙ্গে আর আগের মতন বৈরি মনোভাব পোষণ না করা এ সব কিছুই জ্যোতি বসুর 'ইমেজের' বিনির্মাণ প্রক্রিয়া অনেকদিন আগেই শুরু করে দিয়েছে। তবু লেখিকা জনগণের কণ্ঠে শুনতে পান: 'যত দিন আছে জ্যোতি, দেশের নাই কোন ক্ষতি।' বলতেই হয় মুগ্ধতা আবিষ্ট চোখে তিনি জ্যোতি বসুর ছবি শুধু উজ্জ্বল সাদা রঙেই এঁকেছেন।

একটা বিষয় অস্বীকার করা যায় না যে জ্যোতি বসু বিশাল ভারতবর্ষের ক্ষুদ্র একটি রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক নেতৃত্বেই বরাবর নিজেকে আবদ্ধ রেখেছেন। তাঁর নিজের সিপিআই বা পরবর্তীকালে সিপিআই(এম) পার্টিতেও তিনি সর্বভারতীয় নেতৃত্বের শিরোপা পরেননি বা লাভ করেননি। তাঁর দীর্ঘ ষাট বছরের রাজনৈতিক জীবনে মাত্র আট নয় বছর হ'ল কেন্দ্রের রাজনৈতিক ডামাডোলের বাজারে তাঁর সর্বভারতীয় উত্থান। সেই দিক দিয়ে বিচার করলে তাঁকে যত বড় করেই দেখানো হোক না কেন তাঁর কর্মক্ষেত্র কখনই সুবিস্তৃত ছিল না। আর তাঁর রাজনৈতিক জীবনীও সেই কারণেই ভারতের অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের বিশেষ করে যাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি আছে তাঁদের জীবনীর সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। জ্যোতি বসুর এই সীমাবদ্ধতা ভুলে গেলে তাঁর মর্যাদাই ক্ষুণ্ণ হবে এবং ইতিহাসের প্রতিও সুবিচার হবে না। সুরভির দায় ইতিহাসের কাছে না থাকলেও অন্তত জ্যোতি বসুর কাছে তো আছেই!

এসব সত্ত্বেও সুরভির কলমে জ্যোতি বসু ঘরোয়া জীবনে খুব সহজ ও স্বচ্ছন্দ। স্ত্রী কমল বসুর জবানীতে তাঁদের বিবাহ, দাম্পত্য-প্রীতি, সংসার চর্যায় রাজনীতির প্রতিবন্ধকতা ও অনিশ্চয়তা ইত্যাদি কাহিনী তুলনায় মনোগ্রাহী। অনেক ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাও জ্যোতি বসু লেখিকার কাছে ব্যক্ত করেছেন যা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন জ্যোতি বসু বলছেন, 'আমি তো পার্টিতে এখন মাইনরিটি' (পৃ: ২৪৪)। বিপ্লবের স্বপ্ন এখনও দেখেন তবে 'কোন পথে সেখানে পৌছনো যাবে তা নিয়ে আমি মনে করি, এখনও বিতর্ক শেষ হয়নি'(পৃ: ২৪৫)। 'আমার তো বন্দী জীবন, নিজের স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই—'। 'আমি তো কমিউনিস্ট, মাঝে মাঝে মনে হয় যেন বন্ধ হয়ে আছি, চারিদিকে পাহারাদার।'

সময় ফুরিয়ে এসেছে। তাই জ্যোতি বসুর বার বার মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের গানের পংক্তি 'যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...'। 'এখন তো ডে-টু ডে একজিস্টেন্স।'

জ্যোতি বসু আরও জানাচ্ছেন: 'অনেক হয়েছে এবার আমি ছেড়ে দিতে চাইছি।'

জীবনকে কখনও বিস্বাদ বৈচিত্র্যহীন সেদিন পর্যন্ত মনে হয়নি। এখন মনে হয়। নির্মম সময়ের প্রতিটি পল নিঃশব্দে ঝরে পড়ছে এই ভাবনা আজকাল তাঁকে উদাস করে, বিষণ্ণও করে (পৃ: ২৫৫)। ষাট বছরের রাজনৈতিক সংগ্রামের পর 'মনের দিক থেকে বসু এখন বিধ্বস্ত, পরিশ্রান্ত।' আজ তাঁর মনে হয় 'পলিটিক্স ইজ্ দ্য লাস্ট রিসর্ট অব্ দ্য স্কাউন্ড্রেলস্', 'পাওয়ার করাপটস্'—এই সব কথাগুলো মিথ্যা ফাঁকা বুলি নয় (পৃ: ২৫৬)। তাই বার বার জানাচ্ছেন 'আমি এখন পিস্‌ফুলি সরে যেতে চাই, এখন নতুনরা দেখুক, আমি মুক্তি চাই'।

তাছাড়া যাদের সঙ্গে রাজনীতি করতে হয় তাদের চিন্তার স্তরেও তিনি নামতে পারেন না। সব কিছু মিলিয়ে তাই সুরভি জানাচ্ছেন: 'এখন জ্যোতি বসু ভাল নেই।' জ্যোতি বসুর এই 'বৈরাগ্য' সম্পর্কে সুরভি মাত্র তিন পৃষ্ঠার একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এখানেই তিনি সহজ সুন্দরভাবে মানুষ জ্যোতি বসুকে চিত্রিত করেছেন। কিন্তু আর অগ্রসর হলেন না কেন বোঝা গেল না। 'মঙ্গল গ্রহের অজানা' তথ্য সত্যিই অনেকের কাছে অস্বস্তিজনক বলেই কি তিনি থেমে গেলেন?

অন্য বহু কমরেডদের সঙ্গে জ্যোতি বসুকে যে ইতিহাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে, সে সম্পর্কে অন্য একটি গ্রন্থের মুখবন্ধে হীরেন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন 'সে ইতিহাস হয়তো কোন কালেই পরিপূর্ণভাবে জানা যাবে না—তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ এত দুরূহ যে কেউ সে প্রয়াসে সফলও হতে পারবে না'। ('জ্যোতি বসু'—সম্পাদক চিরঞ্জীব)। সুরভির কিন্তু ধারণা তিনি সফল হয়েছেন—কারণ স্বয়ং জ্যোতি বসু তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়ে গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখেছেন। 'এই জীবনী আমার রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা, ব্যক্তিজীবন এবং আমাব সময়কার বিশ্বস্ত ও অন্তরঙ্গ ছবি।' কিন্তু সমগ্র গ্রন্থখানি মনোযোগ দিয়ে পড়ার পর সমাজসচেতন পাঠক জ্যোতিবাবুর এই সার্টিফিকেট মানতে পারবেন কি না সে সম্পর্কে সংশয় থেকেই যায়।

পরিশেষে যে কথাটি বলার, জীবনীলেখা শেষ করে সুরভি নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জির যে বিপুল সম্ভার উপহার দিয়েছেন, সেসব গ্রন্থ ব্যবহারের কোনও পরিচয় এই জীবনীতে প্রতিফলিত হয়নি। □

জ্যোতি বসু—অনুমোদিত জীবনী

—সুরভি বন্দ্যোপাধ্যায় / হারপারকলিন্স পাবলিশার্স ইন্ডিয়া, নতুন দিল্লি-২ / ৩০০.০০

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তির স্মারক সংকলন

দিব্যেন্দু হোতা

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তির স্মারক সংকলন হিসাবে প্রকাশিত সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ১৪০১ ও ১৪০২ বর্ষের যুগ্ম সংখ্যাটি সুসম্পাদনা, আন্তর্জাতিক মানের প্রকাশনা, মননশীল ও বুদ্ধিদীপ্ত প্রবন্ধগুলির জন্যে সারস্বত সমাজের নজর কাড়বে। বাংলাভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, লোকজীবন চর্যা—সব মিলিয়ে বাঙালির আত্মানুসন্ধানের ইতিহাসই সাহিত্য পরিষদের ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথ সহ বাংলার বিশিষ্ট দিকপালগণ এই পরিষৎ-এর সদস্য তালিকা অলঙ্কৃত করেছেন। আলোচ্য সংকলনটিতে শতবর্ষের কার্যক্রমের তথ্যানিষ্ঠ আলোচনার সঙ্গে এই সংস্থাটিকে ঘিরে বাঙালির স্বপ্ন, তার রূপায়ণপ্রচেষ্টা এবং ভবিষ্যতের আশাব্যঞ্জক ছবি প্রবন্ধের মধ্যে বিধৃত। পাঠক বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা, পরিষদে সঞ্চিত গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক সম্পদের পরিচয় যেমন পাবেন, তেমনই পরিষৎ-পত্রিকার ঐতিহ্যানুসারী বিভিন্ন বিষয়ের উচ্চমানের প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে বর্তমানে বাঙালি মনীষার সঙ্গেও পরিচিত হতে পারবেন। বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার ১৩০১ সালের ১৭ই বৈশাখ নাম পরিবর্তন করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হয়। 'চিন্তার চালচিত্র: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' (১৩০০–১৩৩০) প্রবন্ধে গৌতম ভদ্র ও দীপা দে জানাচ্ছেন প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করার ছয় মাসের মাথায় উমেশচন্দ্র বটব্যাল বলেছিলেন যে 'বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার' এর বাংলা নামকরণ হওয়া উচিত কেননা 'অপর ভাষায় দেশের লোকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়া বেড়াইতে লজ্জা করে'। তিনি অনেকেরই মনের কথার প্রতিধ্বনি করেছিলেন। রাজনারায়ণ বসু দাবি করলেন বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচারের সব আলোচনা হবে বাংলা ভাষায়, প্রতিবেদনও লেখা হবে বাংলাতে। এই দাবি গৃহীত হয়েছিল। বঙ্গসংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে বাংলা ভাষা না থাকলে সংস্কৃতি চর্চাই তো অর্থহীন হয়ে পড়বে। মনোমোহন বসু, গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখেরা পরিষদের অধিবেশনে গাইবার জন্যে যে-সব গান লিখেছিলেন তাতে ছিল 'মাতৃভাষা' ও পরিষৎরূপী মায়ের জন্যে সন্তানের পূজার আহবান। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিতির ফলে বাঙ্গালী মধ্যবিত্তের যে

চিত্তজাগরণ ঘটে, তার থেকে জন্ম নেয় বাঙ্গালীর আত্মজিজ্ঞাসা ও তজ্জনিত আত্ম আবিষ্কারের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা।' বাঙালি জাতির আত্মানুসন্ধানের প্রচেষ্টা বাংলা ভাষার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্মলগ্ন থেকেই। শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার বিশ্বাস প্রতিষ্ঠাকালের গুরুত্বের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে পরিষৎ যে কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল তা বাঙালির আত্মসচেতনতা ও আত্মজিজ্ঞাসা রেনেসাঁসের চেতনাকে কোনও ভাবে খণ্ডিত করেনি। বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক অনুশীলন ও গবেষণার পাশাপাশি ভারতের অন্যান্য প্রান্তের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি সহানুভূতি ও যোগাযোগ রক্ষা করা পরিষদের কর্মসূচিতে প্রথম থেকেই স্বীকৃতি পেয়েছিল। সাহিত্য সাধনার ক্ষেত্রে এখনকার মতো তখনও গোষ্ঠীবিরোধ ছিল। কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ-এর প্রতিষ্ঠাকালে দলমত নির্বিশেষে সকলে সমবেত হয়েছিলেন। পরিষৎ গঠনের কাজে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ এর সঙ্গে এঁদের সাহিত্যিক ও ধর্মীয় প্রতিপক্ষ চন্দ্রনাথ বসু, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিঃসংকোচে হাত মিলিয়েছিলেন।

সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পরিষদের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই একখানি উচ্চাঙ্গের গবেষণা পত্রিকারূপে পরিকল্পিত হয়েছিল। পরিষদের পঞ্চাশ বার্ষিক কার্যবিবরণীতে আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বক্তব্যে তা স্পষ্ট। 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা অন্যান্য সাময়িক পত্র হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির পত্র হইবে...কবিতা, উপন্যাস ইত্যাদি তরল প্রকৃতির সাহিত্য কোনও কালে ইহাতে স্থান পাইবে না... যে সকল প্রবন্ধে কোনও নূতন আবিষ্কৃত তথ্যের অথবা নূতন তত্ত্বের স্থান নাই তাহা পরিষৎ-পত্রিকায় গৃহীত হয় না। ... ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, প্রচীন সাহিত্য, গ্রাম্য সাহিত্য, সমাজতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে যে সকল নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইবে, অথবা যে কোনও নূতন তত্ত্ব আলোচনা যোগ্য হইবে, তাহা পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।...' (পৃ: ৮৭)।

পত্রিকা তার বিষয় গৌরবে গোড়া থেকেই সে উচ্চাদর্শ ও প্রকাশিত রচনাবলীর মান রক্ষা করে এসেছে। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস এর অভিমত: 'পত্রিকার বাহ্য আকৃতির একান্ত দৈন্য, ঘুড়ির কাগজের মলাট, অপরিচ্ছন্ন মুদ্রণ, মুদ্রিত পত্রিকা প্রচারের অব্যবস্থা—সব কিছু মিলে এটিকে একটি অতি সংকীর্ণ পাঠক গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ রেখেছিল।' পুলিনবিহারী সেন মহাশয় পত্রিকার ভার গ্রহণ করে পত্রিকার গ্লানিমোচনে তৎপর হলেন। পত্রিকার বিষয়গৌরব ও উচ্চমান সর্বাংশে বজায় রাখলেন, সেই সঙ্গে যুক্ত করলেন পরিপূর্ণ অঙ্গসৌষ্ঠব (পৃ: ৯৯)।

পরিষদ কেন্দ্রিক বাঙালির কর্মকাণ্ডের মধ্যে বাঙালি মুসলমানদের অনুপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। শতবর্ষের মধ্যে কর্মকর্তাদের নাম তালিকায় ১৩২৬ বঙ্গাব্দে অন্যতম সহকারী সভাপতির পদে মুনশী আবদুল করিম ও ১৩২৩–২৬ বঙ্গাব্দের মধ্যে সহকারী সম্পাদকের পদে আবদুল গফুর সিদ্দিকি ভিন্ন তৃতীয় মুসলমান নাম খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্য সাধক চরিতমালায় কেবলমাত্র মীর মশারফ হোসেন এবং পরবর্তী কালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ও নজরুল ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

শতবর্ষের লেখক তালিকায় মুসলিম নাম হিন্দু লেখকদের তুলনায় নগণ্য। এতে মনে হতে পারে যে এটি মুখ্যত হিন্দু সাহিত্যিক সমাজেরই প্রতিষ্ঠান। শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস তাঁর প্রবন্ধে এ বিষয়ে সঙ্গত কয়েকটি প্রশ্ন তুলেছেন। বেঙ্গল একাডেমি অব্ লিটারেচার-এর চতুর্থ অধিবেশনে এল্ লিওটার্ড দ্বারা একাডেমির আলোচনা গবেষণার জন্যে যে বিষয়গুলি নির্দিষ্ট হয়েছিল তার মধ্য অন্যতম ছিল: "Hindu literature as portraying society and ethics among the Bengalis, past and present"। শ্রী বিশ্বাসের জিজ্ঞাস্য: বাঙালির সামাজিক ও নৈতিক ঐতিহ্যের সুষ্ঠু ধারাবাহিক অনুশীলনের ক্ষেত্রে সাতশো বছরের বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সংস্কৃতির কী উপাদান হিসাবে কোনও মূল্য নেই? প্রথম থেকেই এই একপেশে কার্যপ্রণালীর নির্দেশ কি উত্তরকালীন পরিষৎ কর্তৃপক্ষের মনে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রক্ষণশীল হিন্দু সংস্কার বদ্ধমূল করবার সহায়ক হয়নি? ঐতিহাসিক কারণবশত গড়ে ওঠা হিন্দু-মুসলমানের মানস প্রকৃতিগত বৈষম্যের পাশাপাশি এটিও কি অপর এক কারণ নয় যার জের আমরা আজ পর্যন্ত বহন করে চলেছি এবং পরিষদের পক্ষে মুসলমান সমাজের পূর্ণ আস্থা অর্জনের পথে যা বাধা স্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে? হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছিলেন ...'মুসলমানেরা যাহাতে সাহিত্য পরিষদের মেম্বর হন, সেটি বড়ই বাঞ্ছনীয়। কারণ গত ৭০০ শত বৎসর ধরিয়া মুসলমান ছাড়িয়া বাংলার কোনো কাজই হইতেছে না" (পৃ: ৯৫)।

পত্রিকার ভূমিকা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ইন্দিরা চৌধুরী সেনগুপ্ত বিশেষ কয়েকটি দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পরিষৎ পত্রিকার প্রথম পর্যায়ে ছিল সাহিত্যের সার্বভৌম সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা। নব পর্যায়ে দেখা যায় সচেতনভাবে এক জাতীয় আত্মপরিচিতি গড়ে তোলার চেষ্টা। এই পর্যায়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার পাশাপাশি ছড়া, প্রবাদবাক্য, ব্রতকথা ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। উচ্চবর্গের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্তরা যেসব সামাজিক পরিবর্তন আনছেন, 'নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের' সাংস্কৃতিক চাহিদাকে তার পাশাপাশি রাখা—উনিশ শতকের বাঙালি জাতীয়তাবাদের একটি প্রক্রিয়া এতে দেখা যায়। এই সামাজিক বর্ণভেদের পটভূমিতে নিম্নবর্গের চেতনা জাগ্রত করার

জন্যে লৌকিক শিল্প-সাহিত্যের আঙ্গিকগুলি অনিবার্য উপাদান হয়ে উঠেছিল (পৃ: ১২৮)। পরিষৎ আর তার পত্রিকা মূলত পুরুষদের একাধিকারের জায়গা হলেও নারীদের কণ্ঠস্বর ভাল করে কান পাতলে শোনা যাবে বলে যে মন্তব্য শ্রীমতী সেনগুপ্ত করেছেন তা তথ্যসহ ব্যাখ্যা করে দিলে পাঠকদের সুবিধা হত।

গৌতম ভদ্র ও দীপা দে লিখিত প্রবন্ধ: চিন্তার চালচিত্র: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ (১৩০০–১৩৩০) এবং অভ্র ঘোষের প্রবন্ধ: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ: ১৩৩০–১৩৬০ — এই দুটি প্রবন্ধে ওই সময়কালের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ে পরিষদের কর্মকাণ্ডের আলোচনা হয়েছে। প্রথম প্রবন্ধে বাংলা ভাষার নির্মিতি, ইতিহাস চেতনা ও লোকপল্লী সংস্কৃতির রূপ নির্ণয় ও চর্চার আলোচনার মধ্যে দিয়ে বঙ্গ বিদ্যাচর্চা ও বাঙালির আত্মপরিচয় বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। পাঠক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে যাবার অনেক উপাদান পাবেন এই লেখাতে। অভ্র ঘোষ নিপুণ ভাবে সময়কে ধরেছেন এবং পরিষদের উত্তরণ ও সমস্যা বিশেষ করে আর্থিক সমস্যার দিকে নজর দিতে বলেছেন। তাঁর সঙ্গে সবাই একমত হবেন।

বিভিন্ন প্রবন্ধে পরিষৎ ও পরিষৎ পত্রিকার ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত, দৃষ্টিভঙ্গি এবং কর্ম প্রচেষ্টার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠককে পড়তেই হবে। শতবর্ষ জয়ন্তীর অধিবেশনে পঠিত প্রতিটি প্রবন্ধই উচ্চমানের এবং এর মধ্যে অনেকগুলি ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে পরিগণিত হবে। প্রবন্ধকারেরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

শিশিরকুমার দাশ তাঁর পত্র-প্রবন্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রসার বিষয়ে গভীর ও মৌলিক চিন্তার ছাপ রেখেছেন। বাংলা ভাষা প্রচলনের উত্তেজনায় রবীন্দ্রনাথ অসমিয়া বা উড়িয়া ভাষার প্রতি যথেষ্ট সুবিচার দেখাতে পারেননি বলে তিনি জানিয়েছেন। কোনও একটি ভাষার আধিপত্য মেনে নেওয়া কারও পক্ষেই শুভ নয়। আজকের ভাষা আধিপত্যের লড়াইয়ের প্রকৃতিকে বুঝে, ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে ভাষা প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রকৃতিকে চিনে বাংলাকে তার স্থান করে নিতে হবে। 'বাংলা আধুনিকতায়নের সঙ্গে পাশ্চাত্যায়নকে একার্থক করে নেবার ফলে আমরা বর্তমানে পাশ্চাত্যমুখিতাকে স্বদেশানুরাগের চেয়ে বেশি উপযোগী বলে মনে করি। তার ফলেই ইংরাজি অভিজ্ঞ (যাঁরা আধুনিকতায়নের পুরোধা) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে উৎসাহি নন। বাংলা সাহিত্যের একমাত্র ভরসা ইংরাজি অনভিজ্ঞ বাঙালি' (পৃ: ৩৭)। — এই মন্তব্যের সঙ্গে অনেকে একমত হবেন না। বিতর্ক হতেই পারে।

'এই বাঙালির সাহিত্যের চৈতন্য এখন হিন্দি দ্বারা অনেকটা আক্রান্ত। ফলে এখন হিন্দি এবং বাংলা, বাংলা এবং ইংরাজি, বাংলা এবং অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা, বাংলা এবং বিশ্বভাষার মধ্যে নতুন সম্পর্ক রচনার প্রয়োজন তীব্র হয়ে উঠেছে। আমাদের ভ্রান্ত অহংবোধে ভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে যদি হিন্দি তথা অন্যান্য ভারতীয় ভাষাগুলির ঐতিহাসিক ভূমিকা বুঝতে ভুল করি তাহলে ক্ষতি হবে বাংলা সাহিত্যেরই। যেমন ইংরাজি ভাষার আজকের multinational চরিত্রের সঙ্গে বাংলার কোন সম্পর্ক সমুচিত হবে তা ঠিক করতে না পারলে হীনমন্যতায় ভোগা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই' (পৃ: ৩৭)। তাঁর এই মন্তব্য বাস্তব অবস্থাটি সঠিক ভাবে বুঝতে সাহায্য করে এবং বাংলা ভাষাভাষী সকলকে সতর্ক করে দেয়। শ্রীদাশকে আন্তরিক অভিনন্দন।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'প্রতিশ্রুতির আরেক জন্মদিনে, প্রবন্ধটি বাংলা ভাষা সাহিত্য ও বাঙালির আত্মানুসন্ধান প্রচেষ্টায় রত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতি আন্তরিক সশ্রদ্ধ নিবেদন। এমন সাবলীল, কবিত্বময়, আন্তরিক প্রবন্ধ খুব কমই নজরে পড়েছে। রামেন্দ্রসুন্দরের আর্তি ছিল: 'সাহিত্য পরিষদকে ব্যাকুল হইতে হইবে'। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের লেখার মধ্যে সাহিত্য পরিষদের জন্য এই 'ব্যাকুলতা' ধরা দেয়।

প্রতিটি প্রবন্ধ পৃথক আলোচনার যোগ্য হলেও এই পরিসরে তা সম্ভব নয়। অগ্রগণ্য অসমিয়া ঔপন্যাসিক বীরেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য নিজের লেখক জীবনের অভিজ্ঞতার পটে সাহিত্যের স্রষ্টা, সৃষ্টি ও পাঠকের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে আধুনিক নন্দনতাত্ত্বিক অবস্থান থেকে লেখা প্রবন্ধে কতকগুলি মৌলিক প্রশ্নের সামনে পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেন। শ্রীশান্তনু গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এক বারের জন্যও অনুদিত প্রবন্ধ বলে মনে করিয়ে দেয়নি। প্রবন্ধের ইংরাজি শিরোনাম কি ছিল জানতে পারলে ভাল হত। শ্রীবিনয়ভূষণ রায়ের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থ সংগ্রহ; অশোক ভট্টাচার্যের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা, রমাকান্ত চক্রবর্তীর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগহ — প্রবন্ধগুলি থেকে পরিষদের অমূল্য সম্পদের হদিশ মেলে যা গবেষকদের নিঃসন্দেহে উৎসাহিত করবে। পরিষদের ঐতিহ্যে বিজ্ঞান বিষয়ের আলোচনা গুরুত্ব পেয়ে এসেছে। সেই ঐতিহ্য অনুসরণ করেই শ্রীরমাতোষ সরকার লিখেছেন, সিন্ধুলিপির পাঠোদ্ধারের সাম্প্রতিক এক প্রচেষ্টা: সেই আলোকে উদ্ভাসিত ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় যে ভাবে লেখক করেছেন — তাতে মাঝে মাঝেই প্রশ্ন ওঠে। সেই প্রশ্ন লেখক নিজেই তুলেছেন এবং জবাব দেবার চেষ্টা করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান ও ইতিহাসের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের এই প্রবন্ধ ভাবনার খোরাক যোগাবে — এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এই স্মারক সংখ্যাটির সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজ আন্তর্জাতিক মানের হয়েছে বলে বর্তমান আলোচক মনে করেন।

মুদ্রণ পারিপাট্য, রুচিপূর্ণ প্রচ্ছদযুক্ত, সুসম্পাদিত এই গ্রন্থটি আশা করি বাংলার প্রতিটি গ্রন্থাগারে শোভা পাবে। সত্যজিৎ চৌধুরী ও পরিষদ কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

পরিষদ নানা সমস্যায় পীড়িত। সম্পাদক ও সভাপতির বক্তব্যে সমবেত প্রচেষ্টায় পরিষদের উত্তরণের আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়েছে। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আর্তিটুকু স্মরণ করি: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের জন্য এক-পরিসর অমরত্ব কি আমরা প্রত্যাশা করতে পারি না? সেজন্য অবশ্যই অনবরত অরণি যোগাতে হবে আরও। সীমাবদ্ধ অমরতাও বুঝি আমাদের কাছে আজ সর্বস্ব দাবি করছে। □

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা পরিষৎ-এর শতবর্ষপূর্তি স্মারক সংখ্যা/ ১৪০১–১৪০২ বর্ষ, যুগ্ম সংখ্যা / জানুয়ারি ১৯৯৭ / সম্পাদক: সত্যজিৎ চৌধুরী / বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ / ৭০.০০

দেখার রকমফের

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চিত্রকলা বলুন, সঙ্গীত বলুন, ভাস্কর্য বলুন, মানুষের নিজেকে প্রকাশ করবার যত রকমের মাধ্যম তার মধ্যে শব্দের এই একটা অনন্যতা যে একমাত্র শব্দই নিজেকে প্রশ্ন করতে পারে, সন্দেহ করতে পারে, এমনকী অস্বীকারও করতে পারে। একমাত্র শব্দ দিয়েই বলা যায়, 'বলতে পারি না, বলা যায় না।'

বলা যায় কিনা এ প্রশ্নটা অমিয়ভূষণ মজুমদার প্রথমেই তুলেছেন। তাঁর একটা গল্প ছিল বলবার। এমনকী 'গল্পটা না বলে উপায় নেই' কারণ তাঁর চেতনায় অন্য একজনের জীবনের ছায়া পড়েছে এবং যতক্ষণ না 'সেটাকে বিশ্লেষণ করে দেখা, তা নিয়ে আলোচনা করা' হচ্ছে ততক্ষণ নিষ্কৃতি নেই।

কিন্তু বিশ্লেষণ এবং আলোচনা হয় কথা দিয়ে। এক একটি শব্দ এক একটি 'খণ্ড প্রত্যয়কে' প্রকাশ করে। সে রকম একটিকে আরেকটির সঙ্গে জুড়ে দেয় যুক্তি। কিন্তু সে-ভাবে কথায় কথা জুড়ে কি মানুষ গড়া যায়? মানুষের যথার্থ কাহিনীটি বলা যায়?

এই সন্দেহটি প্রকাশ করেই অমিয়ভূষণ তাঁর কাহিনী আরম্ভ করেছেন। কাহিনীটি পাঠ করার পর পাঠকের মনে একটা প্রশ্ন যে না জাগতে পারে তা নয়। পাঠক ভাবতে পারেন, ভাষা দিয়ে, শব্দ দিয়ে কী বলা যায়, কতদূর বলা যায় এবং কী বলা যায় না, এই গোলকধাঁধার মধ্যে না ঢুকে এবং অনেক কিছু না বলাই থেকে গেল, এরকম একটা ভাব আগাগোড়া বজায় না রেখে, গল্পটা যদি সোজাসুজি মামুলি রীতিতে বলে যাওয়া হ'ত, তা হলে লোকসান কী ছিল? এর একটাই উত্তর সম্ভব, তা হলে সেটা অন্য গল্প হত, অন্য কারও গল্প হত। যে ছায়াটা চেতনায় পড়েছে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলত না।

একটা কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে রাখা দরকার। কাহিনীটি যদিও নায়িকার জবানীতে লেখা হয়নি, আমরা যা কিছু দেখছি, শুনছি সবই নায়িকার চোখ কান দিয়ে, কাহিনীতে আক্রান্ত যে চেতনাটি সেটি নায়িকারই চেতনা, এবং সেই আক্রমণের ফলে নায়িকার চেতনায় কতকটা যে বিবশতার মতো একটা অবস্থা নেমে এল, সেই বিবশতা যেন সারা কাহিনীটিকেই আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেই বিবশতা, সেই আচ্ছন্নতাই এ-কাহিনীর প্রধান উপজীব্য। তাই এত অব্যক্ত বেদনা, এমন ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি।

এও মনে রাখতে হবে, গল্পের বেশির ভাগই আমাদের কাছে আসছে একাকী নায়িকার অতীত স্মৃতিচারণের আকারে, এ-রকম ক্ষেত্রে গল্প নিয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে সোজাসুজি এগিয়ে যাওয়া হয়ে ওঠে না। আমরা একা বসে যখন নিজের অতীতের কথা নিজেকে বলি, সব কথা অবিচ্ছিন্ন ধারায় বলে যাই না দুটো কারণে। প্রথমত তার দরকার করে না, দ্বিতীয়ত বড় ব্যথার জায়গাগুলো আমরা এড়িয়ে যেতে চাই, যদি বা ছুঁতে হয়, খুব আলতো হাতে ছুঁই।

এ গল্প যার, সেই বিমি, বিমলা, বিমলপ্রভা নির্বাস। বাস্তুচ্যুত। বাইরেও তাই ভিতরেও তাই। যুদ্ধের সময়ে বর্মা থেকে তাড়া খেয়ে বজ্রযোগিনীতে, তারপর দাঙ্গার সময়ে সেখান থেকে তাড়া খেয়ে হলুদ মোহন ক্যাম্প নামক উদ্বাস্তু শিবিরে, তারপর তারই কাছাকাছি উদ্বাস্তু উপনিবেশে। এই তো গেল তার বাইরে বাস্তুচ্যুতির ইতিহাস। এর মধ্যে আবার এক অমানুষিক আক্রমণে তার নিজের ভিতরকার নিজের আশ্রয়টুকুও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। ভিতরে-বাইরে তার আর দাঁড়াবার কোনও জায়গা রইল না। বাসস্থান ভেঙে যাওয়া মানেই মানুষের ভেঙে যাওয়া। গোটা মানুষের কল্পনাটা তখন খানিকটা দূরে সরে যায়। তাই স্বৈরিণী লতাকে দেখে বিমি ভাবে, 'এমন মেয়েকে কল্পনা করা যায় যে শরীর আর মনকে পৃথক করে ফেলেছে। শরীরের যাই হোক, মন গৃহমুখী। টাইপিস্ট আঙুল দিয়ে টাইপ করে টাকা কামাই করলে যদি দোষ না হয় — আঙুলও দেহই।"

আর শুধু বিমিই বা কেন? তার আশপাশে যাদের দেখি, হলুদমোহন ক্যাম্পের উদ্বাস্তু কলোনির, তাদের সকলেই নির্বাস, শিকড় শুদ্ধ উপড়ে আনা, সে-শিকড় আর মাটি পায়নি। মরণচাঁদকে দেখে মনে হয় একদা সে নিজের আত্মীয় পরিজনদের

মধ্যে বটগাছের মতো দাঁড়িয়ে ছিল, মোহিতবাবুকে উপড়ে আনা হয়েছে এমন একটা জগৎ থেকে যেখানে তাঁর ভিতরকার মানুষটির বাইরের ঘাত-প্রতিঘাত থেকে বাঁচবার মতো একটা আড়াল ছিল, এখন সে বে-আব্রু। তেমনই সৌম্য। সেও নির্বাসিত, এই রূঢ় জীবনসংগ্রামের জগতে।

এবং ভুবনবাবু, আর অনেককিছুর মতো বিমির চেতনার মধ্যে দিয়ে দেখা তার ছবিটাও যেন ঝিলমিল করছে। তাই তাকে নিয়ে বিমলার পুনরায় বাঁধা ঘর যেন শেষ পর্যন্ত ঝিলমিলই করতে থাকল।

অমিয়ভূষণ এমন শক্তমুঠিতে তাঁর কাহিনীটিকে, সে কাহিনীর মানুষজনকে তাদের জগৎসংসারকে ধরবার চেষ্টা করেননি যাতে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আসল বস্তুটি বেরিয়ে যায়। প্রতি পদে পদে তাঁর ভয়, বোধহয় ঠিক কথাটা বলা হল না, বোধহয় যা না বলা থেকে গেল সেইটেই আসল কথা ছিল। তাঁর ভাষাও যেন সেই ইতস্তত ভাব থেকে একটু কুণ্ঠিত, একটু অতিরিক্ত আত্মসচেতন। তবু তারই মধ্যে এই কাহিনী, মনে হয় যেন, এমন কোনও একটা সত্যের খানিকটা কাছাকাছি আমাদের নিয়ে এল যার বেশি কাছে যাওয়াই যায় না।

প্রফুল্ল রায়ের 'সম্পর্ক'-তে জগৎসংসারকে দেখা হয়েছে আরেক দৃষ্টিতে। এখানে সবই খুব স্পষ্ট, খুব পরিষ্কার। কোনও চরিত্র সম্পর্কে, তাদের motivation সম্পর্কে, তার মধ্যে কে কতটা ভাল কে কতটা মন্দ সে সম্পর্কে এবং সমাজের চোখে যে মন্দ সেই যে আসলে ভাল এবং সমাজের চোখে যে ভাল সেই যে আসলে মন্দ সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ তিনি রাখেননি। ইন্দ্রনাথ মস্ত বড়লোক, অতিশয় অভিজাত তাঁর ছেলেমেয়েরা সব অতিশয় শিক্ষিত এবং সফল এবং বলা বাহুল্য, তাঁরা সবাই বিদেশে থাকেন। পক্ষান্তরে মালতী হলেন এখনকার খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে যৌনকর্মী। এই মালতী ওই ইন্দ্রনাথের এক কন্যাকে নিজের জীবন বিপন্ন করে গুণ্ডাদের যৌনদুষ্কর্মের হাত থেকে বাঁচালেন। এর পরের ঘটনাবলী এবং তার অতিশয় তৃপ্তিদায়ক উপসংহার সম্পর্কে পাঠকের কৌতূহল জাগলে বইখানি কিনে পড়ে দেখতে পারেন। দামও বেশি নয়, পড়তেও মন্দ লাগে না। □

নির্বাস — অমিয়ভূষণ মজুমদার / দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩ / ৪০.০০
সম্পর্ক — প্রফুল্ল রায় / দে'জ পাবলিশিং,
কলকাতা-৭৩ / ৪০.০০

সাত মণ তেলই পুড়ল রাধা নাচল না

অশোকেন্দু সেনগুপ্ত

প্রবীন সাহিত্যিক অমলেন্দু চক্রবর্তীর আলোচ্য উপন্যাসের নাম রাধিকা সুন্দরী। ভূমিকা পাঠে জানা যায়, 'রাধিকা সুন্দরী একটি বড় গল্প হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ... ১৯৭৮ সালে ... পরবর্তী সময়ে উপন্যাস ভাবনায় এবং সম্প্রসারণে এর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে এলোমেলোভাবে প্রকাশিত হয় আরও কয়েকটি পত্রিকার শারদ-সংখ্যায় — বারোমাস (১৯৮৬), বসুমতী (১৯৯০, ১৯৯২), সংবাদ প্রতিদিন (১৯৯৩, ১৯৯৪)।'

সাহিত্য শুধু নয়, শিল্পের সব শাখাতেই সাধক ও মহৎ শিল্পী একটা ছবিই আঁকতে চান, একটা রাগেরই রূপ ফোটাতে চান বা একটি জীবন রচনা করতে চান। আলোচ্য উপন্যাসে লেখকের একটি চরিত্রের সাহিত্যরূপ দেবার প্রয়াসও যেন সেই শিল্পধারা মেনেই। একই গল্প এভাবে ফিরে ফিরে লেখার প্রয়াস অভিনব, যদিও নজিরবিহীন নয়। যে গ্রন্থটি হাতে পেয়েছি তা উপন্যাসের প্রথম খণ্ড। অর্থাৎ, লেখক এখনও ওই একটি চরিত্র এঁকে চলেছেন, পরবর্তী খণ্ড বা খণ্ডগুলিতে যার পূর্ণরূপ প্রকাশ পাবে, আশা করা যায়।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কী বা লক্ষণ কী তা নিয়ে তাত্ত্বিকদের যতই মাথাব্যথা থাক পাঠকের কী আসে যায়! বর্তমান আলোচকও সে তর্ক এড়িয়ে যেতে চায়। কিন্তু, একটা কথা বেশ জোর দিয়ে বলা যায় যে, পাঠক সব দেশে, সব কালে সাহিত্যের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। সে উদ্দেশ্য হল — রসসৃষ্টি। রসসৃষ্টির রহস্য জানে না পাঠক, জানে প্রকৃত লেখক। পাঠকের রুচি, শিক্ষা, সংস্কার কখনও কোনও কোনও রচনার প্রকৃত মূল্য নিরূপণে ব্যর্থ হয়। আজ যা অপছন্দ তা কাল মাথায় তুলে নিতে পারে কেউ। অতি সামান্য কিছু লেখা সর্বকালে সমাদৃত হয়। সব লেখকই তো তেমন লেখা লিখতে চায়, পারে ক'জন?

আলোচ্য উপন্যাসের মূল চরিত্র রাধা। গ্রামের মেয়ে রাধা কাজের মেয়ে হয়ে এল 'সাহেব বাড়িতে'। তার বয়স তখন আট-নয়। সাহেব বাড়িতে থাকে কর্তা, গিন্নি, তাদের দুই মেয়ে ও এক ছেলে, আর কাজের লোকেরা। রাধা তখন কী বা কাজ জানে, তার যেমন পোষাক তেমন চেহারা, নিরক্ষর।

গ্রামের বাড়িতে তার আছে দুখিনী মা আর ছোটভাই পালান। আর আছে তার আদরের 'সোনামণি'— একটি বাছুর। গ্রাম ছেড়ে সে আসতে চায়নি। আসতে বাধ্য হয়েছে, কারণ দারিদ্র। গিন্নি-মা তার ছোট মেয়ের সমবয়সী রাধাকে প্রথম দর্শনে অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও রেখে দিলেন করুণাবশে। দিনে দিনে মেয়েটা সব কাজ শিখে ফেলে। কাজের মেয়ে হয়ে ওঠে ঘরের মেয়ে। রাধা ছাড়া সাহেব বাড়ি চলে না এক মুহূর্ত। শুধু মানুষ নয়, এ-বাড়ির গাছপালা আর পোষা কুকুর, ডোবারম্যান, বাঘাও রাধা-নির্ভর। বাড়ির সর্বত্র প্রাচুর্যের উপকরণ ছড়ানো, সুখের আয়োজন। রাধা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে আবার আধুনিক জীবনের স্বাদও উপভোগ করে। মূল শিকড় গ্রাম-জীবনের শিক্ষা ও সংস্কৃতি অস্বীকার করে এগোতে চায় রাধা। তার গ্রামের মানুষ অশিক্ষিত, রুচিহীন, গোঁড়া, কুচুটে, পরশ্রীকাতর, কূপমণ্ডুক — সামন্ততান্ত্রিক বেড়ি তাদের পায়ে। রাধার বেশভূষা, চালচলন, শহুরে ভাষা গ্রামজীবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। রাধা তা গ্রাহ্য করে না। তার মাকে সেই বিরূপতার ধাক্কা সামলাতে হয়।

সাহেব-বাড়ির ছেলেমেয়ে সর্বদা ইংরেজিতে কথা বলে, যাবতীয় প্রমোদ-মাধ্যম নিয়ে মত্ত। তাদের শিক্ষা-রুচি-পোষাক-আহার — সবেতেই হঠাৎ-হওয়া বড়লোকের চিহ্ন। তারাও মূলবিচ্ছিন্ন। ঘরে ও বাইরে যাবতীয় আমোদ-উল্লাসে রাধা থাকে তাদের পাশে, থাকতে হয়, থাকতে ভালবাসে। প্রত্যেকের নানা ফরমায়েস খাটতে খাটতেই তাদের সুখ-উচ্ছ্বাসের রাধা হয় সঙ্গী, সাক্ষি। বাড়ির অন্য কাজের লোকের ওপর রাধা কর্তৃত্ব ফলায়, তার অপছন্দ হলে তাদের কেউ এ বাড়িতে টিঁকতে পারে না।

স্বাভাবিক নিয়মে রাধা বেড়ে ওঠে, বালিকা হয় নারী। নারী হয়ে ওঠে পুরুষ-কামনার ভোগ্যবস্তু। ছেলেবেলার খেলার সঙ্গী 'দাদাবাবু' একদিন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। সংস্কার বাধা দেয় যদি, তো সুখ সঞ্চালিত হলে শরীর ঘনিষ্ঠ হতেও চায়। পাপবোধের প্রবল ধাক্কাও লাগে।

তখন আসে রাধার মা তাকে ফিরিয়ে নিতে। মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। নিজের 'হয়ে-ওঠা' বাড়ি ছেড়ে যেতে পা ওঠে না। তবু যেতে হয়।

'রাধিকা সুন্দরী' উপন্যাস গ্রামের মেয়ে রাধার 'কিছু একটা' 'হয়ে-ওঠা'-র উপাখ্যান। একটি চরিত্রের রূপ দিতে এসে পড়েছে অনেক চরিত্র, তাদের সময় ও সমাজ। অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, রূপকথা, মনস্তত্ত্ব — নানা আলোক উৎস থেকে নানা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো এসে পড়েছে উপন্যাসের পটে। উপন্যাস রচনা সহজ কর্ম নয় কারণ — শুধু তো আলো নয়, আলোর সঙ্গে মেশাতে হয় অন্তর্লোকের ছায়া। পাঠকের মনে আলো আর ছায়া ছবি আঁকে। আলোচ্য উপন্যাসেও আলোর সঙ্গে ছায়া মিশেছে। কিন্তু পাঠকের মনের পটে আলো-ছায়া কোনও ছবি ফোটাতে পারে কি না, পারলেও সে ছবির স্থান স্থায়ী হবে কি না সে বিচারের চূড়ান্ত রায় দেবে সময়। আমরা শুধু কিছু লক্ষণের সাময়িক বিচারে প্রবৃত্ত হতে পারি।

আলোচ্য উপন্যাসের ভাষা বৈচিত্র্যপূর্ণ। উদাহরণ —

(১) দেশ বিভাগজনিত রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের পর পূজ্যপাদ পিতৃদেব... মহাশয় কীভাবে এক অতিপ্রাকৃত ঝড়ঝঞ্ঝাকে প্রতিহত করে স্ত্রীপুত্রকন্যাসহ সমগ্র পরিবারকে রক্ষা করেছেন—এতদ সংক্রান্ত অতীতচিন্তাও তাঁর বর্তমান জীবনবিন্যাসে এক অনায়াস চিত্তবিভ্রম (পৃঃ ৮৬)।

(২) অতঃপর টাকাকড়িবাড়িগাড়িফ্যানফোনফ্রিজকুলার ব্যাঙ্কলকারসোনাদানাটিভি-ভি.সি.আর.দাসদাসী ডোবারম্যান-সহ সালঙ্কার গার্হস্থ্যাশ্রমে বিবিধ ইলেকট্রনিক অত্যাধুনিক ২৩ জন বা আসবাবপত্র এবং স্বামীর বিশ্রামের জন্য নিজের অবসর, নিজের অবসরে ছাদে ঠাকুরঘর, ঠাকুরের আশীর্বাদে ছেলেমেয়ের জন্য ইংলিশ-মিডিয়াম স্কুল ইত্যাদি ইত্যাদি সমুদয় বৈভব সৃষ্টির পর কিরণময়ীর ভরাট সংসারে একদিন একটি অতি ক্ষুদ্র শূন্যতা দৃষ্ট হলো (পৃঃ ৯০)।

(৩) আমাদের খুলনার দেশের-বাড়িতে সে-যে কী ঠাণ্ডা রোজ ভোরবেলা। কুয়াশায় ঘরবাড়ি গাছপালা দেখা যেত না কিচ্ছু। সেই হাড়কাঁপানির শীতে পুরো মাঘ মাস, রোজ সুয্যি ওঠার আগে ভোরবেলা মা ঘুম থেকে তুলে নিয়ে যেতেন পুকুরঘাটে। পা ফেলতে পারতাম না মাটিতে। ... পায়ে জুতো পরারও চল ছিল না তখন (পৃঃ ১৪৪)।

বাক্যবিন্যাস বদলে লেখক বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বৈচিত্র্য কী পাঠকমনে রসসঞ্চারে সাহায্য করে? সম্ভবত করে না। পাঠের গতি ব্যাহত হয়। মনে রাখতে হবে যে উপন্যাসটির দৈর্ঘ্য ৪২৮ পাতা। সার্থক গদ্যে প্রতিটি বাক্য এমনকী প্রতিটি শব্দের প্রয়োগ অনিবার্য হওয়া কাম্য। কিছুটা এগিয়ে পিছিয়ে গল্প বলার চেষ্টা করেছেন লেখক এবং এই ভঙ্গিতে অতিকথন ও পুনরুক্তি যোগ হওয়ায় গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে সন্দেহ নেই।

কলেবর বৃদ্ধির অন্যতম এক কারণ — ডিটেলসের প্রতি লেখকের আনুগত্য। বাংলা উপন্যাসে ডিটেলসের অভাব ছিল এবং আছে। পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা যাকে বলে লেখক এই উপন্যাসে তার কিছু নমুনা রেখেছেন। সাহেববাড়ির রং-এর কথাই তিন পাতা! সাহেববাড়ির ঘ্রাণ, ধ্বনি কিছুই তো বাদ পড়েনি। রাধা তার দাদাবাবু-মা-দিদিমণিদের সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছে। সেই সিনেমার গল্পও পড়তে হয়েছে আমাদের। সিনড্রেলার গল্পও। এমন বর্ণনায় নিঃসন্দেহে চিত্রনাট্যকাররা বড়ই উপকৃত হবেন।

কিন্তু পাঠকের তৃপ্তি হবে তো? অবশ্য স্বীকার্য যে, এমন বর্ণনার ভাল দিকও আছে। আলো পড়ে সর্বত্র। তাই তো শিশু থেকে নারী হয়ে ওঠা রাধার প্রথম লজ্জার নিখুঁত বিবরণ পাই আমরা। কিন্তু, আগেই বলেছি, শুধু আলো নয়, ছায়াও চাই। ছায়াও আছে। যখন গ্রামে ফেরে রাধা গ্রামজীবনে ঢেউ ওঠে। তার চালচলন, টেলিফোন শাওয়ার গ্যাসের উনুন আমেরিকান ডায়মণ্ড ম্যাক্সি ইত্যাদি শহর-জীবনের হরেক সুখ-উপকরণের কথা শুনে দেখে চমকে ওঠে গ্রাম্য মানুষ; কেউ কাছে টানে, কেউ দূরে ঠেলে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ছবি আঁকা হয়। কিন্তু মন ভরে না। তার কারণ ছবিটা অসম্পূর্ণ।

আলোচ্য উপন্যাসের শেষ অংশে পাই সাহেব-বাড়ি থেকে রাধার বিদায়-দৃশ্য।

"কয়েক পা এগোনোর পর রাধার গতিভঙ্গ হলো। পেছনের আঁচলে টান পড়তেই, আচমকা, ঘাড় ফিরিয়ে তাকানোর সঙ্গে সঙ্গে বুকের ওপর হিংস্র থাবা, প্রবল গর্জন। ... সামনের দিকে দুটো পা তুলে দিয়ে টানটান শিরদাঁড়ায় যেভাবে থাবলে ধরেছে নারীবক্ষের কোমল লজ্জা, তীক্ষ্ম নখের আঁচড়ে ছিঁড়ে যেতে পারে হালকা সিনথেটিক শাড়ির আবরণ বা ব্লাউজ বা আরও গভীর স্তরে ব্রেসিয়ারের বাঁধন। ...

শান্ত স্বর কিরণময়ীর — 'এখন এ-বেচারির কী হবে বল দেখি (পৃঃ ৪২৭)?"

বেচারা পাঠকের স্মরণে থাকতে পারে শকুন্তলার পতিগৃহ যাত্রার দৃশ্য। পূর্বসূরিদের প্রভাব সাহিত্যে অবাঞ্ছিত নয়, বরং তা স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কিন্তু তার অক্ষম অনুকরণ বাঞ্ছনীয় নয়। এই অংশে ব্লাউজ-ব্রেসিয়ারের উল্লেখও রুচিহীন নয় কি?

'রাধিকা-সুন্দরী' আলোচনা করতে বসে একটি গল্প স্মরণে এল। এ-গল্প প্রখ্যাত ভাস্কর চিন্তামণি করের 'স্মৃতিচিহ্নিত' থেকে পাওয়া।

"আতলিয়েতে শুক্রবার একটি মহাদিন। এই দিন আসেন প্রফেসর ভেলরিক, সকলের কাজ দেখে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে। ...

'রঙ তো বেশ, কিন্তু তোমার মূর্তি দাঁড়িয়েছে বেসামাল।' নিলেন একটি ছুরি। তার তীক্ষ্ম ফলা কেটে চলল মূর্তির মাঝ দিয়ে — যেখানে হওয়া উচিৎ ছিল সঙ্গতির মধ্যরেখা। কাঁধটি মাপের অধিক হওয়ায় তার হাতের ছুরি কেটে ফেলল কাঁধ আর হাত। এইভাবে যখন তাঁর বক্তব্য হলো শেষ — পড়ে রইল মূর্তির ছিন্ন ভগ্নাবশেষের স্তূপ ...

মূর্তিকে ভেঙ্গে মাটির স্তূপে পরিণত করে বলতেন তিনি, 'ফের শুরু করো। এর পরে ঠিকমতো গড়তে পারবে।'

কিন্তু হায়! বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখক তো শিক্ষার্থী নন, বর্তমান আলোচকও প্রফেসর ভেলরিক নয়। আবার, পুরস্কার প্রাপ্ত বলেই হয়ত পাঠকের প্রত্যাশাও বেশি, লেখকেরও সে প্রত্যাশা পূরণের দায় বাড়ে। উপন্যাসটি পড়া শেষ হলে মনে হয় সাত মণ তেলই পুড়ল, রাধা নাচল না। □

রাধিকা সুন্দরী (প্রথম খণ্ড) — অমলেন্দু চক্রবর্তী / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ১৩০.০০

উনিশ শতকীয় বাংলা কবিতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

তপনমোহন চট্টোপাধ্যায় একটি কৃশতনু গ্রন্থ লিখেছিলেন 'বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা'। সেখানে চর্যাপদ, জয়দেব ও বৈষ্ণবপদাবলী সাবলীলতায় আলোচিত হয়েছিল। সেই গ্রন্থটির আলোচিত বিষয় আমাদের পুনর্বার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মিতায়তনে রণেন্দ্রনাথ দেব তাঁর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধের সংকলন গ্রন্থের প্রথম রচনাটির প্রথম অধ্যায়ে। 'আধুনিক বাংলা গীতিকাব্য' প্রবন্ধটি সযত্নরচিত। যদিও তাঁর আলোচ্য বিষয় উনিশ শতকীয় বাংলা গীতিকবিতা তবু প্রারম্ভিকায় চর্যাপদ, জয়দেব ও বৈষ্ণবপদাবলীর প্রসঙ্গ নিবেদন অবশ্যই যুক্তিযুক্ত। সন্ধেবেলার প্রদীপ জ্বালানোর আগে সকালবেলার সলতে পাকানোর মতোই। মধ্যযুগীয় 'রিক্ততার মরুদেশ' পার হয়ে সত্য অর্থে বাংলা গীতিকাব্য রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল কর্ষণে 'ফলে শস্যে শ্যামলতায়' উচ্ছ্বসিত — এমনটাই লেখকের প্রতিপাদ্য। উনিশ শতকের বিবর্তন পর্বে প্রাক-রবীন্দ্র বাংলা গীতিকবিতা মধুসূদন, ঈশ্বর গুপ্ত, নিধুবাবু, বিহারীলাল বা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখের চর্চায় কেমনভাবে রূপান্তরিত হচ্ছিল তা প্রভূত উদাহরণসহযোগে বিবৃত করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরও আলোচনায় অনুপস্থিত থাকেননি। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের উষালগ্নে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, সঞ্জীবচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রাণচঞ্চল গদ্যরীতি' কীভাবে কবিকুলকে প্রণোদিত করেছিল তাও অনুক্ত থাকেনি। এই পূর্বোল্লেখ রবীন্দ্রনাথের পরিশীলিত সৃজনকর্মের প্রেক্ষাপট হিসাবে আবশ্যক ছিলই। এঁদের রচনায় 'রবীন্দ্রকাব্যের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের উৎপত্তির কোনও পূর্বাভাস' পাওয়া না গেলেও এই ঐতিহাসিকতা তো উপেক্ষণীয় নয়। আধুনিক বাংলা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই এক নিঃসঙ্গ নায়ক।

তাঁর কাব্যে 'যে অসীম কল্পনাবিস্তার, ভাষার রাজসিক মহিমা, সঙ্গীতের প্রস্বাপনী মোহকারিতা' সত্যিই তো ইতিপূর্বে আমরা বাংলা সাহিত্যে পাইনি।

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক বিকাশপর্বে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বিহারীলাল চক্রবর্তীর ভূমিকা কতখানি তারও সঠিক মূল্যায়ন করেছেন রণেন্দ্রনাথ দেব অন্য একটি প্রবন্ধে। যথার্থ সহৃদয় আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁদের দুর্বলতার অভিঘাতগুলিও চিহ্নিত করেছেন। আপেক্ষিকভাবে বিহারীলালকে অধিক গুরুত্ব নিবেদন করে তিনি বলেছেন: 'মধুসূদনের অনুকারীবৃন্দের কৃত্রিম ভাষা থেকে কবিতাকে উদ্ধার করে বিহারীলাল একে মৌখিক বাকরীতির অনুগত করে দিলেন।'

মধুসূদনের অনুকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র। এঁদের নিয়ে দুটি প্রবন্ধ যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। 'কবি হেমচন্দ্র' শীর্ষক আলোচনাটিতে শ্লেষাত্মক হালকাচালের কবিতায় হেমচন্দ্র কতখানি নিপুণ ছিলেন তা আমরা জানতে পেরে লাভবান হই। প্রায় অনালোকিত এই কবিকৃতি-পরিচয় 'বৃত্রসংহার'-এর কবিকে অন্যভাবে দেখতে সাহায্য করবে। 'ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার মত সূচিমুখ তীক্ষ্মতা ও অর্থগূঢ়তা' হেমচন্দ্রের রচনায় যে ছিল তাও জানা হয়ে যায়। হেমচন্দ্রের এই অন্য পরিচয়ের পটভূমিতে 'হুতোম প্যাঁচা'র অগৌণ ভূমিকা রণেন্দ্রনাথ দেব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। প্রবন্ধটির শেষাংশে হেমচন্দ্র যে ভারতচন্দ্র কর্তৃকও প্রবলভাবে প্রভাবিত তাও উদাহরণ সহযোগে সম্যক বিশ্লেষিত।

'নবীনচন্দ্রের কাব্য ও গদ্যসৃষ্টি' প্রবন্ধটিতে এই সমকাল প্রখ্যাত কবির উপরে মধুসূদনের দীর্ঘপ্রসারিত ছায়া প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে প্রথমেই। পরে 'কুরুক্ষেত্র রৈবতক প্রভাস' কেন মহাকাব্য না হয়ে 'ঘরোয়া সুখদুঃখের কলধ্বনিতে পূর্ণ আখ্যানকাব্য' মাত্র হয়ে গেল তা যেমন বলা হয়েছে তেমনই একথাও প্রবন্ধকার উচ্চারণ করেছেন: 'আখ্যানকাব্য রূপেও 'ত্রয়ী' অসম্পূর্ণ, অতৃপ্তিদায়ক'। নবীনচন্দ্র একদা রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে বলেছিলেন: 'তিনি নিঃসন্দেহে বঙ্গে সর্বপ্রধান গীতিকবি। শুনিয়াছি, তাঁহার বিশ্বাস, বঙ্গভাষায় গীতিকাব্য ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। উহা সত্য হইলে তাঁহার ও বঙ্গভাষার উভয়ের দুর্ভাগ্য।' অথচ কোনও কোনও সমালোচক তাঁকে স্বভাবরোমান্টিক গীতিকবি হিসাবেও দেখেছেন যদিও 'কালের জোয়ারে ভেসে তিনি স্বভাবের প্রতিকূল মহাকাব্য লিখতে গিয়েছিলেন'। রণেন্দ্রনাথ দেব বলেছেন 'সত্যকার গীতিকাব্য তিনি লিখতে পারেননি, 'অবকাশরঞ্জিনী' তার দৃষ্টান্ত। কিন্তু গীতিকবির চোখ তাঁর ছিল, 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাসের' ভাষায় অলঙ্কারে তার ইঙ্গিত পাই। কিছু সুন্দর উপমা ও চিত্র এই দুর্গম কাব্যারণ্যের শাখায় হালকা অর্কিডের মতো হাওয়ায় দুলছে: এতৎসত্ত্বেও 'নবীনচন্দ্রের কাব্যে কবিত্বের কোনও সুনির্দিষ্ট ভাস্বর অবয়ব নেই' এমন কথা বলেই স্বস্তি পেয়েছেন যেন প্রবন্ধকার। বরং গদ্যশিল্পী হিসাবে নবীনচন্দ্রকে তিনি উচ্চতর আসন দিতে পেরেছেন 'বাংলা গদ্য ততদিনে যতটা শক্তি ও নমনীয়তা অর্জন করেছিল তার সবটুকু 'আমার জীবনে' সংহত হয়েছে।' লেখা বাহুল্য, 'আমার জীবন' নবীনচন্দ্রের আত্মচরিত।

দুই উপেক্ষিত কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ও অক্ষয়কুমার বড়ালকে নিয়ে রচিত প্রবন্ধটিতে রণেন্দ্রনাথ দেব চিন্তানিষ্ঠ সমাজসচেতন সুরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা অক্ষয়কুমার যে অধিকতর শিল্পনির্ভর কবি তা বিনা দ্বিধায় সঙ্গতভাবেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। তবু অক্ষয়কুমার যে 'রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বব্যাপী প্রভাবের প্রথম উল্লেখযোগ্য বলি' একথাও রচনাটির অন্তিম বাক্যে বলেছেন।

সমকালে অসামান্য পাঠকপ্রিয় নজরুল ইসলাম ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। অকালে খণ্ডিত এই দুই কবির কাব্যজীবন। এঁদের নিয়ে আলোচনাটিতে রণেন্দ্রনাথ দেব প্রায়-নিষ্করুণ এই বাক্যও লিখেছেন 'খণ্ডিত হলেও অবশ্য তাঁদের কবি জীবনে নূতনতর কোনও শক্তিস্ফূরণের আশা ছিল না।' সেই সঙ্গে তিনি এটুকু কথনও অবশ্য যুক্ত করেছেন 'যতটুকু দেবার তাঁরা অকৃপণ বর্ষণে দিয়ে গেছেন'। মূলত তিনি অনুসন্ধান করতে চেয়েছেন 'তাঁদের প্রতিভার কোন্ মৌল অশক্তি তাঁদের কাব্যের সীমাবদ্ধতার জন্যে দায়ী'। এই দুই কবির কবিতার চরিত্রের পার্থক্য নির্দেশ করতেও তিনি বিস্মৃত হননি।

মাত্র দুটি কাব্য 'সনেট পঞ্চাশৎ' ও 'পদচারণ' প্রণেতা প্রমথ চৌধুরীকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন প্রবন্ধকার রণেন্দ্রনাথ কারণ 'যে ঊষরশুষ্ক মাটিতে আধুনিক কবিতা ভূমিষ্ঠ হয়েছে প্রমথ চৌধুরীর কবিতায় তার রুক্ষ বালুকাকীর্ণ ভূ-প্রকৃতি ফুটে উঠেছিল'। তিনি ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় সমাজের আদর্শস্খলনকে চিত্রিত করেছেন — তরল আবেগধর্মিতাকে এবং স্থূল নীতিগর্বকে নস্যাৎ করেছেন। তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি ও যুক্তিনিষ্ঠা ছিল অতুলনীয়। সেই সঙ্গে প্রকাশভঙ্গির গাঢ়তায় ও 'গ্রেসিয়ারতুল্য সংহতি'তে তিনি কয়েকটি নির্ভুল গীতিকবিতারও জন্ম দিয়েছেন। নির্মম নিখুঁত নির্মাণের জন্যে প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট পঞ্চাশৎ' রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল সত্য কিন্তু তাঁর কাব্যরীতির সুতীক্ষ্মতা কবিসম্রাটের সম্পূর্ণ সমর্থনও লাভ করেনি।

প্রথমেই পরশুরামের একটি কবিতা উদ্ধার করে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত-এর দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোধর্মের নিকট সাযুজ্য আবিষ্কার করতে চেয়েছেন রণেন্দ্রনাথ পরবর্তী রচনাটিতে। 'মরীচিকা', 'মরুশিখা' ও 'মরুমায়া'র ব্যতিক্রমী কবি যতীন্দ্রনাথ বাংলা কবিতায় নিঃসন্দেহে এক বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তক কিন্তু তাঁর কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছায়াপাত অলক্ষ্যগোচর নয়। তবু 'দৃষ্টির নির্মোহ স্পষ্টতা ও শ্লেষের মর্মভেদী অব্যর্থতা' পরশুরামের কথা

বারেবারে মনে করিয়ে দেয়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য যতীন্দ্রনাথের রচনায় 'গীতিকাব্যের কুহক রাগিনী' আমরা শুনেছি।

এই আটটি প্রবন্ধে গীতিকাব্যের প্রসঙ্গ কোনও কোনও কারণে এসেছে এবং এ জন্যেই লেখক বিষয়সূচি প্রণয়নকালে গ্রন্থটির প্রথমাংশের সীমা এঁকে দিয়েছেন নবম প্রবন্ধটির আগে। পরের প্রবন্ধের মধ্যে কোনও ঐক্যসূত্র নেই। গ্রন্থটির দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়েছে চণ্ডীমঙ্গল রচনাটি দিয়ে। রণেন্দ্রনাথ দেব বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যকে ধর্মপ্রেরণা ও কবিত্বশক্তির সুপরিণত প্রতিমূর্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর একান্ত পক্ষপাত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রতি যেহেতু এটি কোনও মতেই সাম্প্রদায়িক সাহিত্য নয়। সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠীগত উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে কাহিনী রসপ্রধান হয়ে উঠতে বহুদিন সময় লেগেছে। ক্রমশ বাস্তবতাবোধ এসে অলৌকিকতাকে সরিয়ে দৈনন্দিন জীবনচিত্র রচনায় সাহায্য করেছে। বিশেষত চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে আমরা এই ঘটনাটি কিছু বেশি পরিমাণে লক্ষ করি। এই প্রবন্ধটিতে গোপিনাথ দাসকৃত খুদু রুকুনীওষার গল্পটি সুলভমুদ্রিত পাঁচালি থেকে লেখক বিবৃত করেছেন। এই পাঁচালিটি কটক থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। ধনপতি সওদাগরের মূল কাহিনী এটিতে পাওয়া যায়। এটি বাংলাদেশ থেকে ওড়িশায় যদি যেত তাহলে অন্তত কয়েকটি বাঙালি চরিত্র পাওয়া যেত। চণ্ডীমঙ্গলের অন্য উপাদান কালকেতুর কাহিনীও বাংলাদেশের বাইরে থেকে এসেছিল। কবিত্বরস এবং কাহিনীর গতি ও শক্তির উপর ভিত্তি করে বাঙালির 'লোককান্ত' কাব্য হয়ে উঠেছে, তাই রণেন্দ্রনাথ বোঝাতে চেয়েছেন।

এইপর্বে পরের প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে মধুসূদনের পত্রাবলি। মধুসূদনের প্রকৃতি বোঝবার জন্যে তাঁর কবিজীবনের বিবর্তনকে উপলব্ধি করার জন্যে এই চিঠিগুলি প্রায় দর্পণের কাজ করবে যে কোনও পাঠকের কাছে। তাঁর বন্ধুবাৎসল্য, পঠিত গ্রন্থাদির উল্লেখ, তাঁর চরিতার্থ অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষার প্রতিলিপি এই চিঠিগুলি। তাঁর বিচিত্র জীবনের টানাপোড়েন, অন্তরের হাহাধ্বনি, তাঁর অস্মিতাবোধ অকপটভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলাভাষার প্রতি তাঁর অবহেলাও তিনি নম্রভাবে ব্যক্ত করেছেন। তাঁর পঠনপাঠন রীতি, তাঁর বিভিন্ন ভাষা অধ্যয়ন সবই তিনি অসংশয়ে প্রকাশ করেছেন চিঠিপত্রে। মূলত 'মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার তিনি স্বয়ং' —এমন কথা বলে রণেন্দ্রনাথ দেব প্রবন্ধটির ইতি টেনেছেন।

দীনবন্ধু মিত্র 'সৃষ্ট মানুষগুলি আমাদের কাঁধে হাত রাখে, অনায়াসে মনের ডালা খুলে দেখায়, কপট প্রতিবেশীকে অনার্যভঙ্গিতে বিদ্রূপ করে। অস্বাচ্ছন্দ্যও জাগায় কিছুটা। তবে, জীবনের মতোই, তাঁর নাটকও সবটা সুশ্রী নির্মল নয়'। দীনবন্ধুর নাটককে অনেকেই সমাজচেতনার নাটক হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। রণেন্দ্রনাথ দেব এই অস্পষ্ট উচ্চারণকে স্পষ্ট করেছেন এই ভাবে 'দীনবন্ধুর অগাধ মানবপ্রীতি ও দেশপ্রীতি মিশে গিয়েছে শিল্পপ্রীতির মধ্যে'। যে কোনও পাঠকই জানেন এই বাংলার সামাজিক ইতিহাসের অনেক অমূল্য তথ্য তাঁর নাটকের ভেতর থেকেই উঠে আসতে পারে। এমন সঙ্গত কথাও রণেন্দ্রনাথ দেব নিবেদন করেছেন। পরিশেষে তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন যে সুদৃঢ় বাস্তববোধ ও সমাজজ্ঞতা সহ বাংলা নাটকের যে ভিত্তি তিনি তৈরি করেছিলেন তার উপরে সৌধ নির্মাণের যোগ্য উত্তরসূরি স্থপতি পরবর্তীকালে আসেননি।

'উনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন লেখক ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে রণেন্দ্রনাথ দেব অনুসন্ধান করেছেন কি কবিতায় কি গদ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনতি পূর্ববর্তীদের মধ্যে কারও কারও দ্বারা কীভাবে উপকৃত। গ্রন্থের প্রথমাংশে নানা প্রবন্ধে যা তিনি কখনও কখনও অন্যসূত্রে উল্লেখ করেছেন তারই সুসংহত একত্রীকরণ ঘটেছে এটিতে। কবিতায় বিহারীলালের কাছে ঋণ স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই স্বীকার করেছেন। 'শব্দের প্রয়োগকুশলতা কিংবা ধ্বনির নবীন তাৎপর্য' ছাড়াও পুরাণকথার পুনর্জন্মের রীতি রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন—এমন কথা প্রবন্ধকার বলতে চেয়েছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'রৈবতক' কাব্যখণ্ডে নানা অংশে ছড়িয়ে থাকা গীতিধর্মী কবিতাংশ উদ্ধার করে তিনি একথাও বলেছেন 'উদ্ধৃতিগুলি শুধু গীতিধর্মব্যঞ্জক নয়। বাকরীতি ছাড়া এদের উপমাসন্ধান ও চিন্তাভঙ্গিতে পর্যন্ত রবীন্দ্রযুগের আসন্ন আবির্ভাব সূচিত হচ্ছে।' গদ্যের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র এবং কিছুটা নবীনচন্দ্রের ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের রচনারীতি অন্তত প্রাথমিকপর্বে রবীন্দ্রনাথকে প্রাণিত যে করেছিল তার প্রমাণাদি হাজির করেছেন প্রবন্ধকার।

গ্রন্থের শেষ প্রবন্ধটির নাম 'দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কৌতুকনাট্য'। দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত পাঁচটি হাস্যরসাত্মক নাটকের নাতিদীর্ঘ আলোচনা করে লেখক দেখিয়েছেন 'বিরহ' নাটকটি শ্রেষ্ঠ। অনেকের ধারণা মতোই প্রবন্ধকারও বিশ্বাস করেন দ্বিজেন্দ্রকৃত প্রহসনগুলি আপেক্ষিকভাবে পৌরাণিক, ঐতিহাসিক কিংবা গার্হস্থ্য সমস্যামূলক নাটকের চেয়ে ভাল। 'পুনর্জন্ম' প্রহসনটিরও প্রশংসা করেছেন তিনি যেহেতু এর 'গঠন সৌন্দর্য অনিন্দনীয়'। তবে অসঙ্গতির দিকগুলিকেও তিনি বিস্মৃত হন নি। এই প্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানেরও আলোচনা রয়েছে প্রহসনপ্রাসঙ্গিক বিশ্লেষণে।

বাংলা সাহিত্যের বিশেষত কবিতাশাখার উনিশ শতকীয় আলোচনাগ্রন্থ হিসাবে অনেকের কাছে এটি সংগ্রহযোগ্য। চুম্বকে অনেক বিষয় বুঝতে সহায়তা করবে এটি। তবে এটুকু অবশ্যই বলা উচিত যে প্রবেশার্থীদের কাছে এটি যতটা গ্রহণীয় ততটা পরিণতদের কাছে নয়। অনেক জ্ঞাত বিষয় ও প্রসঙ্গ আলোচিত

হয়েছে। তবে লেখকের কিছু কিছু তীক্ষ্ম মন্তব্য বিতর্কও উস্কে দিয়েছে। এটুকু নিশ্চিত প্রাপ্তি।

অজস্র উদ্ধৃতি উল্লেখসূত্রহীন। নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জিও সংযুক্ত হয়নি। আর কিছু কিছু উক্তি আরেকটু আঁটসাঁটো হলে চমৎকার হত। যেমন 'বাংলা ভাষায় মহাকাব্যের একমাত্র নিদর্শন 'মেঘনাদবধকাব্য' (পৃ. ১০) না লিখে যদি 'একমাত্র যথার্থ নিদর্শন' লেখা হত তাহলে যে কোনও তার্কিকের মুখবন্ধ করা যেত। এমন আরও কিছু ফাঁক থেকে গেছে যা স্বল্পায়াসে ভরাট করা সম্ভব ছিল। প্রবন্ধকার নিজে কবি বলে সম্ভবত ভাষায় কবিতার টান লেগেছে যা পাঠশ্রম কমিয়ে দিয়েছে। পড়তে পড়তে কবিতার অনুষঙ্গও খুঁজে পাবেন কেউ কেউ।

পরিশেষে, আরেকটু বলার কথা হল একই উদ্ধৃতি একাধিক প্রবন্ধে ব্যবহার করার কারণে অধিকপ্রাপ্তি প্রত্যাশী পাঠক ক্ষুণ্ণ হতে পারেন। প্রবন্ধগ্রন্থটির ছাপা সুন্দর এবং প্রায় মুদ্রণপ্রমাদশূন্য। □

আধুনিক বাংলা গীতিকাব্য ও অন্যান্য প্রবন্ধ
—রণেন্দ্রনাথ দেব / স্বাধ্যায়, এ-৮/৭৯ কল্যাণী (এ ব্লক), নদিয়া / ৪০.০০

কবিতায় শিকড়ের টান

অসীম রেজ

'আধুনিকতা'র সংজ্ঞা যদি কেবলই নগরকেন্দ্রিকতা, নগরজীবনের তীব্র টানাপোড়েন, প্রতিযোগিতা, উত্তেজনা, টেনশন, বিজ্ঞাপনসর্বস্ব মানসিকতা, রাজনীতির চর্বিতচর্বণের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার পথ বহু কবি শিল্পী সাহিত্যিকের অজানা রয়ে যায়। কিন্তু 'আধুনিকতা'কে যদি আমরা একটি নির্দিষ্ট কালসীমার ভিতর বিশেষ কয়েকটি লক্ষণ বলে চিহ্নিত করি, যা কিনা একটি বিশেষ ব্যক্তি বা সমাজের বাইরে গোটা মানবজাতিকে প্রভাবিত করে ও আমাদের অজান্তে জীবনধারাকে ক্রমান্বয়ে পাল্টাতে থাকে। তাহলে হয়তবা এ পথের সন্ধান পেতে অসুবিধা হয় না।

বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে আমাদের অসীম কল্পনা ও স্বপ্নকে, সবকিছু বোঝাতে চেয়েছে যুক্তি ও তথ্যের বিশ্লেষণে। ঈশ্বরের মৃত্যু সংবাদ অনেক আগেই ঘোষিত হয়েছে এবং স্বর্গোদ্যান যখন শূন্য, তখনই অস্তিত্বের সংকট হয়েছে প্রবল। বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি গিয়েছে টলে। আর তখনই প্রয়োজন হয়েছে আর এক নতুন বিশ্বাস খুঁজে পাওয়ার যাকে আঁকড়ে আমরা ওই সংকট থেকে মুক্তি পেতে পারি। লৌকিক বা আদিম বিশ্বাসের সূত্র ধরে শুরু হয়েছে উৎসে ফেরার তাগিদ, শৈশব পুনরুদ্ধারের কাজ, সহজাত সারল্যে ফেরার তীব্র বাসনা; যা কিছু স্বতোৎসারিত ও স্বতঃস্ফূর্ত যেন তার কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। আধুনিক কবি শিল্পীরা যেন বারবার ফিরে তাকান শিকড়ের দিকে। তাঁর সৃষ্টির রসদ সংগ্রহ করেন অবচেতনের অতলান্ত থেকে। আধুনিকতার যাত্রা এ অর্থে সরলীকরণের দিকে যাত্রা। ঈশ্বরবিহীন এক নতুন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধান। বরং পশ্চিমি কবিদের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে বাংলা কাব্যের অন্ত্যজ লিরিকধর্মী 'মিস্টিক' আউল বাউল রূপটি আমরা ফিরে পেতে পারি। আধুনিক বাংলা কবিতায় এরূপের অনুসন্ধান জীবনানন্দ থেকে শুরু, বিষ্ণু দে থেকে শঙ্খ ঘোষ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। আলোচ্য কবি কবিরুল ইসলামের কাব্যসমগ্র হাতে নিয়ে প্রথমেই এ কথাগুলি মনে আসে। কবিরুলের কবিতা আমরা ইতঃস্তত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পড়েছি। তাঁর প্রকাশিত বইগুলি : 'কুশল সংলাপ' (১৯৫৭), 'তুমি রোদ্দুরের দিকে' (১৯৭১), 'বিবাহ বার্ষিকী' (১৯৭৭), 'বিকল্প বাতাস' (১৯৭৮) ও 'বিদায় কোন্নগর' বহুল পরিচিত না হওয়ায় আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। তাই হয়ত কবিরুল তাঁর সমগ্র কবিতাগুলি নিয়ে আবার একবার আমাদের দ্বারস্থ হন। সমসাময়িকতার আলোয় নিজেকে পুনরায় যাচাই করতে চান; হয়তবা বাংলা কাব্যে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানটি খুঁজে পাওয়ার আশায়। প্রতিটি কবিতার তারিখ অনুযায়ী গ্রন্থের শেষ লেখাটির রচনা সেপ্টেম্বর ১৯৮১। বর্তমান গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে জুলাই, ১৯৯৬। দীর্ঘ পনেরো বছরে লেখা কোনও কবিতাকে তিনি এই কাব্যসংগ্রহে স্থান দেওয়ার কথা কেন বিবেচনা করেননি?

যে কোনও কবিকে চিনতে গেলে তাঁর চারপাশের সামাজিক অবস্থানটি ও ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ইতিহাস, তাঁর সাফল্য ও ব্যর্থতা, সুখ ও দুঃখের দিনপঞ্জি জানা প্রয়োজন। কবিরুলের বিষয়ে আমরা কয়েকটি তথ্য তাঁর গ্রন্থ থেকে উদ্ধার করতে পারি। যেমন তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক, মফঃস্বলবাসী (সিউড়ি), শান্তিনিকেতনের আবহাওয়ার খুব কাছাকাছি, রবীন্দ্রভক্ত, মাঝে মাঝে কলকাতায় ঢুকে পড়েন, তাঁকে পাওয়া যায় বইমেলায় বা আড্ডায়। আর একটু বিশদ জানার জন্যে জীবনপঞ্জি রয়েছে গ্রন্থের শেষে। তাঁর কবিতা বোঝার জন্যে বইয়ের প্রথমে শিবনারায়ণ রায়ের ভূমিকা ও শেষে কেতকী কুশারী ডাইসনের একটি দীর্ঘ সমালোচনা অতিরিক্ত সংযোজন হিসাবে রয়েছে এবং একটি গ্রন্থপরিচয়। এত কিছুর বদলে তিনি যদি কেবল আমাদের জানাতেন তাঁর আত্মপ্রকাশের

কাহিনীটি, কাব্যগ্রন্থগুলি কোথায়, কখন, কোন পরিস্থিতিতে লেখা তাহলে তাঁকে বুঝতে আমাদের আরও সুবিধা হত।

সিউড়িবাসী হওয়ার জন্যে 'বাউলের দেশ' হিসাবে চিহ্নিত বীরভূমের জলমাটি, আলোবাতাস, এক শান্ত, স্নিগ্ধ প্রাকৃতিক পরিবেশ, সরল গ্রাম্য চেহারাটি তাঁর কবিতায় মিশেছে। তাঁর প্রতিটি কাব্যগ্রন্থে এই সম্পদটি ঘুরে ফিরে এসেছে: 'তবুও দু'হাত আকাশে ইতস্তত / সরু বসন্তে হুতাশী বাউল হাওয়া/ তারই ছোঁয়াছুঁয়ি—তারই ছোঁয়াছুঁয়ি/ লজ্জাবতীর রহস্য সজ্জার' (রোজকার ছড়া) ; 'আমাকে কাঁদায় বাউল হাওয়ার চিতা/ ব্যথার আরতি দুর্বহ যে,/ মনে জানি ঠিক এই অতৃপ্তি বৃথা/ যদিও কিছুতে খুসি নও তুমি সহজে' (তুমি জানো) ; 'জয়দেব কেন্দুলির আধুনিক আউল বাউল যা পারে না/ আশানন্দের খাতা সুভাষিত। ঐ তো অদূরে/ অজয়ে অজেয় শীত দিনান্তে এবারও স্পষ্ট ডুব গেলো আরো এক/ শীতের শিকড়ে' (শীত ১৯৭৬–৭৭) অথবা 'বিবিধ শব্দের কণ্ঠ: পাখীর নদীর/ এবং হাওয়ায় হাতে পাতার সুস্বর/ একটি কোরাসে বিদ্ধ শব্দ সমাহার' (আমি কবিতার মধ্যে) ; 'চুপচাপ কথা বলে কয়েকটি গাছ/ কয়েকটি গাছের গন্ধ শব্দহীন ঝরে,/ এবং রৌদ্রের কণ্ঠে আশ্চর্য আওয়াজ/ বুকের ভিতর ওঠে, পড়ে। (গাছের গন্ধ) এবং এমন অজস্র উদাহরণ টেনে আনা যেতে পারে।

এমন দৃষ্টান্তের পরেও প্রকৃতিপ্রেমিক বলে একটি অতি সহজ সরল ব্যাখ্যায় তাঁকে আমরা দূরে সরিয়ে রাখতে পারি না। জটিলতা বাড়ে যখন দেখি 'ফোক মোটিফ'গুলি ধীরে ধীরে তাঁর চিত্তের আকাশ জুড়ে বিস্তৃত হয়, কবিতায় ধরা পড়ে অসংখ্য ইমেজারি। আলো আঁধারের মাঝে একটি সূর্য সত্তার পূর্ণ প্রকাশ হয়ে বারবার দৃশ্যমান হয় তাঁর কবিতায়—'জন্ম মুহূর্তেই/যাত্রারম্ভ সূর্যাস্তের আলোর আকাশে', 'দ্যাখো সূর্যকে রোজ দ্যাখো /সকালে দুপুরে সাঁঝে /রাত্তিরেও মনের ভিতর', 'প্রত্যেকেই নিজ নিজ সূর্য-সন্নিধানে যেতে চায়,' 'স্বাধিকারে পৌঁছে যাবো সূর্যের বাসরে,' 'অথচ প্রত্যেকদিন আমার আকাশে / তোমার অনন্ত সূর্যোদয়', এমন অসংখ্যবার এর উল্লেখ আছে। প্রথমদিকের কবিতায় যে সূর্য জীবনচক্র ও ভালবাসার গোপনকথা বহন করেছে ধীরে ধীরে পরবর্তী কবিতাগুলিতে তা রূপান্তরিত হয়েছে নদী, নারী ও ঘরের প্রতীকে। ভালবাসার অনিশ্চয়তা তাঁকে ঘিরে ধরেছে ছায়ার মতো। যেমন, 'আমি সেই নিত্যবাড়ির সন্ধানে আছি /আমি বাড়ির ভিতরে বাড়ি /ঘরের ভিতরে ঘর চাই /খুঁজে দেবে ?', 'রক্তের নিয়মে আমরা একই বৃত্তে বাঁধা পড়ে আছি /চেনামুখ একই বৃক্ষ পরিচিত ছায়া / আমাদের অন্তর্গত সুবাতাস নদী /এবং সমুদ্র চারিদিকে', 'ছায়ার সান্নিধ্যে ঘুরে আমি বহুকাল /পৃথিবীর সূর্যেরে দেখি না / যেহেতু ছায়ার সঙ্গে ঘর ক'রে ক'রে /আলো হাওয়া জলের দর্পণে / নিজেকে দেখি না।'

এই ছায়া আবার তাঁর অবচেতনের রূপ। তাঁকে সর্বদা আড়াল করেছে। রোমান্টিক এই কবির মিস্টিক অনুভূতির প্রকাশ এরই সূত্র। ধীরে ধীরে এই ছায়া সরে গিয়ে হয়েছে আরশি বা আয়না, দরজা ও জানলা। নিজেকে বারবার দেখার বাসনা এরই সঙ্গে মিশেছে। যেমন,—'চোখের মতো জানালা', 'দরজা সব খোলা থাক্ এবং জানলা/ আলো আসবে, হাওয়া আসবে, কুশল শুধাবে', 'ভোরের জানলা খুলে আমি পূর্ববৎ/ তাকিয়েছি স্মৃতির ভুবনে', 'আমার বুকের মধ্যে যেন খুব কাছে/ আয়নার আড়াল ভাঙ্গে সশব্দে চৌচির', 'ভিতরে ঢোকার জন্যে / হাজার দুয়ার খুলে ধরো', কিংবা 'আয়নার পারদ ক্রমশই উঠে যায়/ তুমি তো আমার আয়না ছিলে/ হাতের চিরুনি তাই অপ্রস্তুত খুলে পড়ে...' ইত্যাদি। শেষের দিকের কবিতায় শিকড়-বাকড়, আঁচল, চাবি, কাঁচের চুড়ি বা নূপুরের মতো টুকিটাকি অজস্র ফোকমোটিফে চিত্রিত হয়েছে মনের অস্থিরতা, বিষাদ ও একাকীত্ব।

গোটা কাব্যসমগ্রে কবিরুল এক সংশয় ও দ্বন্দ্বের মধ্যে থেকেছেন। একবার অন্ধকারে আশ্রয় খুঁজেছেন ; আবার আলোয় বেরিয়ে আসার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়েছেন। লিখেছেন, 'আমি সেই মন্ত্র চাই—/চাই সেই অরণ্য আঁধার/ যে আঁধারে বীজ ঝরে, মন্ত্রোচ্চারণে/ খুলে যায় জন্মের জানালা/ দূর সূর্যে নিকট শিকড়ে' অথবা 'আমার সমস্ত কিছু জুড়ে/ তোমার নিঃশব্দ সংকীর্তন/ সেই সূর্যো, শস্যের দুপুরে/ প্রতিদিন আত্মনিবেদন।' চিত্তের এই অস্থিরতা আধুনিক জীবনের এক অনিশ্চয়তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আধুনিকতার অনুষঙ্গ এসেছে শেষের দিকের কবিতায়। এর সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি। রাস্তা খুঁজেছেন নতুন করে। এই পথের শেষ কোথায় তিনি জানেন না—'এই বেলা সব গুটিয়ে ফেলো তাঁবু / জানিনে, হায়, পথের কোথায় শেষ/ আমার আছে কেবলই প্রস্তুতি / আমার আছে অনন্ত আহ্বান' (বাজনা)। রবীন্দ্রভাবনায় পুষ্ট এই কবির বলার ভঙ্গিটি ক্রমশ সূক্ষ্ম ও পরিণত হয়েছে 'বিকল্প বাতাস' কাব্যগ্রন্থ থেকে। ছোট ছোট কবিতাগুলিতেই যেন প্রকৃত তাঁকে চেনা যায়। এরই মধ্যে দু'একটি ভোলা যায় না—'হাজার বছর ধরে যে হেঁটেছে / তার সন্ধ্যার আঁচলে, পড়ে সাতটি গিঁট/ চাবিগুলি/ পায়ের মলের মতো / সন্ধ্যা ছেড়ে বেজে চলে/ রাত্রির হৃদয়ের (যে হেঁটেছে) ; 'আমার ঘরের মধ্যে যেটুকু উঠান/ উঠানের মধ্যে যে বাগান/ তুমি তার সবটুকু জুড়ে / রোদ্দুরে রোদ্দুরে/ তোমারই সমান' (বাগান) ; 'নতুন বাড়ির আলো বাতাস/ আকাশ/ বড় লাগে/ নতুন বাড়ির দিন রজনী/ সজনী/ ছোট লাগে' (সজনী ছোট লাগে)। □

কাব্যসমগ্র — কবিরুল ইসলাম /
কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা-২৬/ ৬০.০০

নানা স্বাদের কবিতা

রণেন্দ্রনাথ দেব

এক সঙ্গে অনেকগুলি কবিতার বই হাতে পেলে আনন্দ হয়। কবিতা পাঠের আনন্দ আর কিছুর সঙ্গে তুলনীয় নয়। নতুন কবিদের রচনা পড়তে আমাদের বিশেষ আগ্রহ। কিন্তু সেই প্রত্যাশা সবসময় পূরণ হয় না, এটা দুঃখের কথা।

গোপীনাথ দে প্রবীণ লেখক, তাঁর আরও তিনটি কবিতার বই ও একটি গল্পের বই আছে। অন্য বইয়ের কথা জানি না। এই বইয়ে কবি যা বলতে চান তা খুব স্পষ্ট। কবিতাগুলির নামকরণ দেখে বিষয়বস্তু অনুমান করা যাবে—মে দিবস তুমি এসো, কাল সন্ধ্যায় (মে দিবসের প্রাক্কালে), মানববন্ধন, স্পেন বিপ্লবের গান (ক্লাইভ ব্রানসন)। কবির বক্তব্যও দ্বিধাহীন—

চড়া রোদ আর কড়া স্বপ্নের দিন/বিশ্ব জুড়ে ডানা মেলে আজ স্পর্ধিত্ মে-দিন। (কড়া স্বপ্নের দিন) দক্ষিণ আফ্রিকার হাত/ছুঁয়ে আছে নামিবিয়া-অ্যাঙ্গোলাকে/অ্যাঙ্গোলার মুঠি জাম্বিয়া-মোজাম্বিকের করতলে/নিকারাগুয়াও বন্ধন-প্রত্যাশী আমার ভারতবর্ষের। (মানববন্ধন) কী বিচিত্র আস্থার সংকট/এসপ্ল্যানেডের কমরেড লেনিন বরাভয় চাইছে ভারতের শ্রমিকের কাছে! (কাল সন্ধ্যায়)

সম্ভবত এসব পংক্তিকে কেউ কেউ কবিতা মনে করেন। কিন্তু নীচের চরণগুলিতে কবি কী বলতে চান এবং কোন ছন্দে, তা ঠিক বোধগম্য হল না—ঈথারের দ্রুত তরঙ্গ বেয়ে ভূমা/জন্ম নেবে লক্ষ প্রাণের গর্ভে/ বিস্ফোরণ হবে কাব্যের উপমা/ বিপ্লব আসে বিপ্লবী সন্দর্ভে॥ (চেতনায় পলাশ ফোটার দিন)

একটি কবিতা কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নামে নিবেদিত। কবি বেঁচে থাকলে তাঁর প্রতিক্রিয়া উপভোগ্য হত সন্দেহ নেই। এর মধ্যে একটু হাঁফ ছাড়বার অবকাশ পাওয়া গেল 'একদা কটি চরিত্রের সন্ধানে' কবিতাটি পড়ে।

গোবিন্দ গোস্বামী এক বছরের মধ্যে দুটি কবিতার বই বার করেছেন। তিনি উৎসাহী এবং উদ্যমশীল, এতে কিছু আশা হয়। প্রথম বইটিতে 'পোশাক বদল' 'অভ্যর্থনা' 'দাঁড়িয়ে আছি' 'স্বরচিত দুঃখ' এবং দ্বিতীয় বইটিতে 'অদ্ভুত মেলা' 'ময়না তদন্ত' 'গেঞ্জি গামছার গল্প' উল্লেখনীয়। দ্বিতীয় কাব্যের 'এক অন্য চতুর্দশপদী' কবিতাটির গড়ন বেশ অভিনব। কোনও কোনও কবিতায় তির্যক ব্যঙ্গ উপভোগ্য—উচ্ছিষ্ট রক্তের লোভে চতুর্দিকে মুখোসিত মহাপুরুষের ঘেউ ঘেউ (মৃগয়া)

আমি ক্রুদ্ধ কবি নই স্বঘোষিত ধূর্ত মহিমায় (রক্তাক্ত চারণের আত্মকথা)

হয়ত একদিন এ রীতিতে তাঁর পূর্ণ অধিকার জন্মাবে।

ছন্দোবদ্ধ রচনাতেও কবির দক্ষতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কিন্তু ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি কেন আরও পরিশ্রমী ও সতর্ক হন না (যেমন 'শর্ত' কবিতাটিতে) সেইটেই আমাদের জিজ্ঞাস্য। প্রথম বইয়ের চেয়ে দ্বিতীয় বইয়ের মুদ্রণ পারিপাট্য চোখে পড়বার মতো। পরের বইয়ে তাঁর কবিতার আরও পরিণতি আসবে আশা করি।

'রাত ভাঙার গান' বিয়াল্লিশটি ছোট ছোট কবিতার সংকলন। কবিতাগুলি যেন ডায়েরির পৃষ্ঠা কিংবা স্থিরচিত্র। বিষয় সামান্য, কবির সুরও অনুচ্চ। কিন্তু এক ধরণের শান্ত সৌন্দর্য ও বিষণ্ণতা আছে। কবিতাগুলি ফুলের তোড়ার মতো সমগ্রতায় সুন্দর, আলাদাভাবে কোনওটি বিশিষ্ট, তবু উল্লেখ করা যায় 'অভীপ্সা', 'আমি' 'ফসিল' 'পাড়ি ২' ও 'আগুন'।

বইটির প্রচ্ছদ, ছাপা, বাঁধাই ও কাগজ মনোহর ও সুরুচিপূর্ণ, একথা না বললে অন্যায় হবে। পাঠকদের উপভোগের জন্য 'রবিবার' কবিতাটি সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি—আজ রবিবার।/বিনির স্কুল যাওয়া নেই। সমস্ত ঘর জুড়ে হুল্লোড়। আজ রবিবার।/অফিসের তাড়া নেই। প্রেসার কুকারের বাঁশি বাজবে না। আজ রবিবার।/বিকেলের ফ্লাইটে ঝর্ণা ফিরবে, বহুদিন পর। আজ রবিবার।/সন্ধে ঘনীভূত হচ্ছে-হুল্লোড় হবে আজ। আজ রবিবার।/অসময়ে জরুরী টেলিগ্রাম এলো...

মূর্তিভাঙার যুগে মনীষী ও মহাপুরুষদের নিয়ে কোনও কাব্য লেখা হয় না। (মহাপুরুষ কেউ আছেন কী ?) 'নামরূপা' একটি ব্যতিক্রমধর্মী কাব্য। শক্তিপ্রসাদ রায় শর্মা যে-মহামানবদের শ্রদ্ধা জানাতে এ কাব্য লিখেছেন তাঁরা হলেন—বুদ্ধদেব, শেক্‌স্‌পীয়র, শেলি, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, লেনিন, দ্বিজেন্দ্রলাল, শরৎচন্দ্র, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, শিশিরকুমার, এলিয়ট, কে নেই তাঁর এই তালিকায়! মোহিতলাল মজুমদার, কালিদাস রায়, সুনীতিকুমার, কবি কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ, সুভাষচন্দ্র, তারাশঙ্কর, নজরুল, জীবনানন্দ, বনফুল, সুকুমার সেন, আশাপূর্ণা দেবী, জ্যোৎস্নানাথ মল্লিক, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, রণজিৎ কুমার সেন ও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়।

শক্তিপ্রসাদ রায় শর্মা প্রতিষ্ঠিত কবি, কিন্তু এই কাব্যে তাঁর শিক্ষক সত্তা কবি সত্তার উপর জয়ী হয়েছে। তবু আশা করব তরুণেরা এ কাব্য পড়বে। যাঁদের তিনি প্রণাম জানিয়েছেন তাঁরা সবারই নমস্য।

'তার সপ্তক' কাব্যটির প্রথম অংশে কয়েকটি ছোট কবিতা; দ্বিতীয়াংশের নাম 'অনাস্বর'-এতে আছে দীর্ঘতর চারটি কবিতা — 'আজ শতবর্ষ পরে', 'মনে পড়ে', 'অনা ঈশপের গল্প', ও 'পাঞ্চালি'।

প্রথম অংশের কবিতাগুলি কিছু স্মৃতিবিজড়িত কিছু জীবনের খণ্ডচিত্র, চকিতে দেখা দৃশ্য। কবি বলছেন, 'নামতে নামতে সময় যখন জীবনের তলানি ছুঁয়েছে মনে হচ্ছে বহু দিনের পুরনো শুকনো কুয়োয় সোনায় বাঁধানো জীবনের ফেলে দেওয়া ভুলগুলি খুঁজছি তখনই লেখা কবিতাগুলো।' এদের মধ্যে চোখে পড়বার মত কবিতা — 'ফুল গাছ', 'পাগল পুরাণ', 'এক দুই তিন', 'সেই গাছ', 'নিরুত্তর' ও 'নিত্যযাত্রী'।

'অনাস্বর' অংশের কবিতাগুলি দীর্ঘ ও কাহিনীধর্মী। 'পাঞ্চালি' পুরোপুরি একটি কাহিনী। পরিবেশনে রবীন্দ্রনাথের একটি দুটি কবিতার সঙ্গে মিল থাকলেও কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট। আধুনিক যুগের সমস্যা নিয়ে লেখা। কবিতাটি মনে দাগ কাটে কবিতার চরিত্রগুলি সব কাল্পনিক হলেও! যে কবি লিখেছেন —

> কলকাতা থেকে কন্যাকুমারী/ এ বাড়ি ও বাড়ি দরজা ধাক্কাই/বলি কবিতা নামে এক বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা/থাকেন এ বাড়িতে?/আগে থাকতেন এখন উঠে গেছেন এই বলে সবাই মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেয়'

তাঁর কাছে কিছু প্রত্যাশা আছে আমাদের।

চেতনায় পলাশ ফোটার দিন — গোপীনাথ দে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৭৩ / ১২.০০

মুক্তচেতনার পদাবলী — গোবিন্দ গোস্বামী/ বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯ /১৫.০০

অরণ্যে আলোর পাখি — গোবিন্দ গোস্বামী/ বিশ্বজ্ঞান, কলকাতা-৯ / ১৫.০০

রাত ভাঙার গান — গৌতম গঙ্গোপাধ্যায়/ লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র, কলকাতা-৯ /১২.০০

নামরূপা — শক্তি প্রসাদ রায় শর্মা/ লেখক সমাবেশ, কলকাতা-১৪ /২০.০০

তার সপ্তক — অরূপ ভট্টাচার্য/ উত্তরাশা প্রকাশনী, কলকাতা-৬২ /২০.০০

আজাদ হিন্দ ফৌজ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

বেণু গুহঠাকুরতা

'আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও গণবিক্ষোভ' বইটিকে লেখক চারটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন। (১) আজাদ হিন্দ ফৌজ গড়ে ওঠার কাহিনী, (২) আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও সরকারি সিদ্ধান্তের নেপথ্য ইতিহাস, (৩) সামরিক আদালতের বিচারপর্ব ও সংশ্লিষ্ট পক্ষের সওয়াল জবাব, (৪) আদালতের রায় ও গণবিক্ষোভ, সঙ্গে আছে একটি পরিশিষ্ট: Address of counsel for defence by Bhaulabhai Desai.

প্রথমেই লেখক তাঁর এই বই লেখবার প্রেরণা হিসাবে জানিয়েছেন যে, 'সুভাষচন্দ্রের জন্ম-শতবর্ষে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজাদ হিন্দ ফৌজকে নিয়ে এই ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছি। আজাদ হিন্দ ফৌজের বিচার ও বন্দীদের মুক্তির দাবীতে যে বিপুল গণআন্দোলন হয়েছিল সেই বিষয়ে বাংলায় লেখা নির্ভরযোগ্য বই-এর সংখ্যা খুব বেশি নয়। সরকারের গোপন নথি সমূহ দেখার ব্যাপারে নানারকম বাধা নিষেধের দরুন বই লেখার জন্য প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক উপাদানগুলিও সহজলভ্য হয়নি। তবুও আমি যতটা পেরেছি বিলাতের ইন্ডিয়া অফিস সংগ্রহশালার নথি ও অন্যান্য আকর গ্রন্থসমূহের উপাদান, সমসাময়িক সংবাদপত্র ব্যবহার করে বইটকে ঐতিহাসিক বিচারে নির্ভরযোগ্য করে লেখার চেষ্টা করেছি।

লেখক বহু পরিশ্রম করে বহু তথ্যের সমাবেশ করা সত্ত্বেও বইটি একনিশ্বাসে পড়ে ফেলবার মতো মনমাতানো হয়নি। এর অন্যতম কারণ বোধ হয় লেখক তাঁর বক্তব্যকে পরিচ্ছেদ অনুযায়ী সাজাতে পারেননি। যেমন আজাদ হিন্দ ফৌজ ও তার গড়ে ওঠার কাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মনোভাব। কোর্ট মার্শালের সময় এড্‌ভোকেট জেনারেল স্যার এন.পি.ইঞ্জিনীয়ার-এর বক্তব্য, আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারত অভিযানের আংশিক বিবরণ, কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের বক্তব্য। সর্বোপরি আজাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্য যেমন 'আসলে ৪২-এর কংগ্রেস এবং ৪৪-এর সুভাষচন্দ্র উভয়ই ভুল করেছিলেন যুদ্ধে মিত্রশক্তি হারতেই থাকবে এই দুর্দমনীয় আশায় উভয়েই অদৃষ্টের সঙ্গে জুয়ো খেলেছিলেন।

কিন্তু অদৃষ্ট তাঁদের কারুর প্রতি প্রসন্ন হননি। আগস্ট আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল, ব্যর্থ হয়েছিল আই.এন.এ-র ভারতাভিযান' (পৃ: ৪৯)। অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হওয়ায় ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের ডাকা আগস্ট আন্দোলন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ভারতাভিযান ব্যর্থ হয়েছিল এমন সিদ্ধান্ত কি ইতিহাসসম্মত?

একই ভাবে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও সরকারি সিদ্ধান্তের নেপথ্য ইতিহাস' বর্ণনাতে নানান কথা চলে এসেছে যেমন কংগ্রেস আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনে সামিল হয়েছিল কারণ: 'কোর্ট মার্শালে সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষিত হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসের নেহেরু, প্যাটেল, পন্থ প্রমুখ সর্বভারতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাই আই.এন.এ-র সমর্থনে সর্বত্র জোর প্রচারে আত্মনিয়োগ করেছিলেন' লেখকের মতে এর কারণ ছিল, 'আসন্ন নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে কংগ্রেস আই.এন.এ-র পাশে দাঁড়িয়ে দলের অনুকূলে আজাদ হিন্দ ফৌজের জনপ্রিয়তাকে নির্বাচনে জেতার জন্য কাজে লাগাতে চেয়েছিল'। লেখকের এই ধরনের অদ্ভুত সিদ্ধান্তে আসবার কারণ বোধহয় তিনি জাতীয় নেতাদের বক্তব্যের চাইতে ব্রিটিশ সরকারি বক্তব্যকেই সবচাইতে বিশ্বাসযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন ফলে সরকারি বক্তব্য "Much of what these leaders had said could be regarded a electioneering exuberence" (পৃ: ৫৩) হয়ে উঠেছে তাঁর কাছে বেদবাক্য।

এদেশের ঐতিহাসিকদের অনেকের মধ্যেই লেখার ক্ষেত্রে তথ্যের চাইতে ভাবাবেগের প্রাধান্য দেখা যায় — যদি তা হয় জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সৃষ্ট কোনও গণ আন্দোলনের ইতিহাস। শ্রীরায়চৌধুরীও এর হাত থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন নি। ১৯৪৫-এর ২১শে নভেম্বর ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। কারণ এই দিনটিই ছিল যুদ্ধোত্তর গণঅভ্যুত্থানের সঙ্কেতবাহী। সে দিনটিতে কারুর ধারণাই ছিল না যে দেশ হয়ে আছে অগ্নিগর্ভ। একমাত্র বুঝেছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যারা তখন এদেশ থেকে পাততাড়ি গোটাবার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছিল যদিও সেই প্রস্তুতির কথা সেদিন নীচের তলার মানুষদের কাছে ছিল অজানা।

লেখক এই আন্দোলন বর্ণনার ক্ষেত্রে যে সমস্ত তথ্য পরিবেশন করেছেন তা আপাতবিরোধে ভরপুর। যেমন 'আন্দোলনের প্রথম দিনেই (অর্থাৎ বুধবার, ২১শে নভেম্বর তারিখে) আজাদ হিন্দ ফৌজ দিবস পালনের জন্য ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে বিরাট ছাত্র সমাবেশ হয়েছিল তা ছত্রভঙ্গ করে দেওয়ার জন্য পুলিশ সমবেত জনতার উপর বলপ্রয়োগ করে এবং এর ফলে একজন নিহত ও ৬০ জন আহত হয়েছিলেন' (পৃ: ১২৩, ১২৪)। এই বর্ণনা থেকে এমন ধারণা হতে পারে যে পুলিশ ওয়েলিংটন স্কোয়ারের সমাবেশ সেখানেই ভেঙে দেবার জন্য বল প্রয়োগ করেছিল ফলে একজন নিহত এবং ৬০ জন আহত হয়েছিলেন কিন্তু প্রকৃত ঘটনা তো তা ছিল না। একটু পরেই আবার তিনি লিখেছেন 'মিছিলটি ডালহৌসী স্কোয়ারের কাছে উপস্থিত হলে পুলিশ যখন এর গতিরোধ করে তখন মিছিলকারীরা অনোন্যপায় হয়ে রাস্তাতেই বসে পড়ে' (পৃ: ১২৪)। এ তথ্যটিও সঠিক নয়, কারণ পুলিশ ছাত্র মিছিলকে ডালহৌসির ধারে কাছে যেতে দেয়নি। আবার একই সঙ্গে তিনি লিখেছেন 'এমন সময় ঠিক এই মুহূর্তে বিদ্যুতের বেগে ছুটে এলো অশ্বারোহী জাঠ পুলিশ। মতি শীল স্ট্রীট থেকে ছুটে এলো ধর্মতলা দিয়ে ওপারে ম্যাডান স্ট্রীটের দিকে জনতাকে দুভাগ করে।... তখনই গুলি ছুটলো' (পৃ: ১২৪)। উপরের তিনটি বর্ণনা থেকে প্রকৃত ঘটনা কি ঘটেছিল তা বুঝতে পারা খুবই কষ্টকর।

একথা সত্যি সেদিন আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের মুক্তির দাবিতে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ছাত্ররা সমবেত হয়েছিল। কিন্তু সেই সভাকে কোনও ক্রমেই বিশাল সমাবেশ বলে বর্ণনা করা যায় না। কারণ সেখানে খুব বেশি হলে পাঁচ/সাত শত ছাত্র উপস্থিত ছিল। বেলা তিনটে-সাড়ে তিনটের সময় যখন ছাত্ররা ওয়েলিংটন ত্যাগ করে মিছিল নিয়ে ধর্মতলা ধরে অগ্রসর হয় তখন তাতে কোনওক্রমেই তিন-চারশ'র বেশি ছাত্র ছিল না। এই মিছিল পুলিশ আটকে দিয়েছিল নিউ সিনেমা এবং টিপুর মসজিদের মাঝামাঝি জায়গায়। ছাত্ররা এখানেই বসে পড়েছিল এবং আগামী ২৪ ঘন্টা সেখানে বসে থেকেই পুলিশের লাঠি গুলি অশ্বারোহী পুলিশের আক্রমণ সব কিছুরই মোকাবিলা করেছিল।

সন্ধের সময় গুলি চলার ঘটনা ঘটে এবং মুহূর্তে তা আন্দোলনের চেহারাকে পাল্টে দেয়। হাজার হাজার ছাত্র প্রকৃতপক্ষে এসেছিল ২২ নভেম্বর সকাল থেকে, তবে তাকে লক্ষ লক্ষ বলা বা ২২শে নভেম্বরের ওয়েলিংটনে দশ হাজার-বিশ হাজার-পঞ্চাশ হাজার বলা বোধ হয় ঠিক হবে না কারণ কোনও মতেই তা সেই পর্যায়ে পৌঁছয়নি। কারণ সভা জমে ওঠার আগেই তা ভেঙে গিয়েছিল। যখন শ্রীশরৎ বসু সভায় বক্তৃতা করতে উঠেছিলেন। ছাত্ররা তাঁর কাছে গতকাল তাঁর অনুপস্থিতির কৈফিয়ৎ তলব করে অত্যন্ত উগ্রভাষায় এবং মূর্তিতে এবং সেই সময় আওয়াজ ওঠে গুলি গুলি। শ্রীবসু তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ করে চলে যান। আর ছাত্ররা ছুটতে থাকে ধর্মতলার দিকে, এই সময় যে-গুলি চলে তাতেই সম্ভবত আবদুস সালাম শহীদ হয়েছিলেন। অথচ শ্রীরায়চৌধুরীর দীর্ঘ বর্ণনাতে আবদুস সালামের নামটাই অনুপস্থিত। সেদিন কিন্তু কলকাতার ছাত্র

আন্দোলন এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করত রামেশ্বর আর আবদুস সালামের নাম।

একই ভাবে ১১ই ফেব্রুয়ারি রশিদ আলি দিবসকে কেন্দ্র করে যে বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে তার অনেকটাই প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে মেলে না। প্রথমত একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে যেহেতু রশিদ আলি মুসলিম লীগের সহায়তায় মামলা লড়েছিলেন, তাই কংগ্রেসি ছাত্র সংগঠন এই আন্দোলনে সামিল হয়নি। তাছাড়া ২১ শে নভেম্বরের আন্দোলনকে সব ধরনের কংগ্রেস নেতারাই প্ররোচকদের ফাঁদে ছাত্ররা পা দিয়েছে ঘোষণা করেছিলেন। এই দিনের ছাত্র ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল মুসলিম ছাত্র লীগ এবং কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশন; ধর্মঘট করে ওয়েলিংটনে জমায়েত হওয়ার কথাই ঘোষণা করা হয়েছিল। কোনও মিছিল বা ১৪৪ ধারা ভাঙবার কোনও পরিকল্পনা কারুরই ছিল না। কিন্তু ঘটনা ঘটে যায় অন্যভাবে। বেলা এগারটা নাগাদ খবর পাওয়া যায় যে (যতদূর মনে আছে) পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্র ফেডারেশন কর্মী শায়েদুল্লার নেতৃত্বে একটি মিছিল হাওড়া থেকে আসার পথে জেনারেল পোস্ট অফিসের সামনে পুলিশ ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং শায়েদুল্লাকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনাটিই সমস্ত আগাম চিন্তাকে পাল্টে দেয়। মুসলিম ছাত্র লীগের নেতারা ডালহউসি যাওয়ার জন্য জেদ ধরে এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা তার বিরোধিতা করে। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় মিছিল দেশবন্ধু পার্কে গিয়ে শেষ হবে। কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত হয়নি, ছাত্র লীগ কর্মীরা হঠাৎই কলেজ স্ট্রীট থেকে কলুটোলাতে ঢুকে পড়ে এবং ছাত্র ফেডারেশনের নেতারা তাদের নিরস্ত করতে ব্যর্থ হন। মিছিল নানা ঘুরপথে তদানীন্তন রয়্যাল এক্সচেঞ্জের সামনে পুলিশের সামনাসামনি হয়। কলকাতার ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসে এর আগে বা পরে এমন অদ্ভুত পথ ধরে ডালহউসি অভিযানের কোনও নজির নেই এবং এর আসল কারণ উপরে বর্ণিত হয়েছে। এইখানেই পুলিশ ব্যারিকেড ভেঙে ছাত্ররা এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে ফলে সংঘর্ষ বেধে ওঠে। ঘটনা ঘটার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কলকাতায় আগুন জ্বলে ওঠে। কাজেই লেখক বর্ণিত 'ওয়েলিংটন স্কোয়ার থেকে ছাত্রদের একটি দীর্ঘ মিছিল ধর্মতলা স্ট্রীট পরিহার করে (কারণ পুলিশ আগে থেকেই ওই রাস্তা ঘিরে রেখেছিল)' কথাগুলি সঠিক নয় কারণ সেদিন ওই অঞ্চলে ১৪৪ ধারা ছিল না এবং পুলিশ ওই অঞ্চল ঘিরে রাখেনি।

এ সমস্ত ঘটনার বর্ণনা এই আলোচকের নিজস্ব অভিজ্ঞতা থেকেই দেয়া হয়েছে কারণ এই ছাত্র আন্দোলনে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন ছাত্র ফেডারেশন এবং কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হিসাবে।

সবশেষে কয়েকটি কথা বলা দরকার। শ্রীরায়চৌধুরীর লেখায় এবং আন্দোলনের বিশ্লেষণে কমিউনিস্ট পার্টির তদানীন্তন চিন্তার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। জানি না তিনি তাদের সমর্থক কিনা, প্রথমত জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের যথা গান্ধী-নেহরু-প্যাটেল এরা যে কমিউনিস্টদের মতোই সুভাষচন্দ্রের বিরোধী ছিলেন একথা অনেকবারই বলার চেষ্টা হয়েছে এবং পরবর্তীকালে এরা আজাদ হিন্দ ফৌজের মুক্তি আন্দোলনকে নেহাৎই নির্বাচনী কৌশল হিসাবে ব্যবহার করেছেন একথাও পাঠকদের জানানো হয়েছে। আরও জানানো হয়েছে যুদ্ধোত্তর এই গণঅভ্যুত্থানে কমিউনিস্টরাই ছিল একমাত্র দল যারা এই আন্দোলনকে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে পরিচালিত করতে উৎসাহী ছিল। বাকি সবাই ছিল আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে ক্ষমতার ভাগ বাঁটোয়ারাতে উৎসাহী তাই তাঁর 'বিস্ময়ের বিপন্নতা বোধ কেটে যায় যখন মনে আসে যে কংগ্রেসের পক্ষে আগস্ট আন্দোলনকে মদত দেওয়া সম্ভব হয়েছিল এই কারণে যে ঐ আন্দোলনের সঙ্গে কমিউনিস্টদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আর ১৯৪৫–৪৬ এর আন্দোলনের তীব্রতা সৃষ্টিতে কমিউনিস্টদের অবদানই ছিল সবচাইতে বেশি' (পৃঃ ১৫২)। অপরদিকে 'দেশের স্বাধীনতা লাভের সম্ভাবনা যতই উজ্জ্বল হয়ে আসছিল ততই নিজেদের বুর্জোয়া শ্রেণীস্বার্থ এবং দেশের ব্যবসায়ী সমাজের স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাগিদে কংগ্রেস এইসব আন্দোলনকে কখনই লাগাম ছাড়া রকমের তীব্র হয়ে উঠতে দিতে পারেনি।' ইত্যাদি ইত্যাদি (পৃঃ ১৫২)।

লেখক এখানে ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অনুধাবনে একটু একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন এবং মূল সুরটিকেই ধরতে ব্যর্থ হয়েছেন। একথা ভুলে গেলে চলে কি করে যে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস ছিল সবরকমের স্বাধীনতাপ্রেমীদের মিলনক্ষেত্র। একদিকে এতে যেমন সামিল হয়েছিল বুর্জোয়া নেতৃত্বে জাতীয় গণতান্ত্রিক অথবা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক ধারা তেমনই এতে সামিল হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক ধারা যা বয়ে নিয়ে এসেছিল তদানীন্তন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী ও সাম্যবাদীরা। এছাড়াও এতে সামিল হয়েছিল জাতীয় বিপ্লবী ধারা যাদের নেতৃত্বে ছিলেন এককালের 'টেরোরিস্টরা'।

বিদেশের সাহায্য নিয়ে অস্ত্র আমদানি করে সশস্ত্র সংগ্রাম মারফৎ দেশকে স্বাধীন করা অথবা বিদেশে স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে, বিদেশের সাহায্যে দেশের মুক্তির চিন্তা নেতাজি সুভাষচন্দ্র প্রথম করেননি। তাঁর আগে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, বরকতউল্লা, গদর বিপ্লবীরা, মানবেন্দ্রনাথ-রাসবিহারী-বাঘাযতীনরা সে প্রচেষ্টা করেছেন। নেতাজির হাতে এই মানসিকতাই চরম বিকাশ লাভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে, যার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই আজাদ হিন্দ ফৌজকে। তিনি সফল হতে পারেননি কারণ তদানীন্তন বিশ্বে বিভিন্ন শক্তি-সমাবেশের যোগফল তাঁর অনুকূলে ছিল না।

ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনকে এই তিনটি ধারাই সমৃদ্ধ করেছে এবং এর মূলধারা অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ধারার নেতারা এই সমস্ত ধারাকে সঙ্গে নিয়েই এদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন। এঁরা সুভাষচন্দ্রের কোনও বিশেষ নীতি হয়ত বিরোধিতা করেছেন কিন্তু কখনওই তাঁর স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেননি।

তেমনই সুভাষচন্দ্রও জাতীয় নেতাদের সঙ্গে তাঁর যত মতবিরোধ থাক এদেরকে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করেননি। তাই আজাদ হিন্দ বাহিনীতে আমরা দেখতে পাই জাতীয় নেতাদের নামে ব্রিগেড গঠন — যেমন গান্ধী ব্রিগেড, নেহেরু ব্রিগেড, আজাদ ব্রিগেড। আজাদ হিন্দ বাহিনী গঠন তাই ছিল ভারতবর্ষের জাতীয় আন্দোলনের একটি বিশেষ চিন্তাধারার সার্থক প্রতিফলন। নিঃসন্দেহে তা জাতীয় আন্দোলনের মূলধারাকেই শক্তিশালী করেছিল এবং এখানেই ছিল আজাদ হিন্দ ফৌজ ও নেতাজি সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টার সার্থকতা।

আর আমাদের জাতীয় নেতারাও সুভাষচন্দ্রের এই প্রচেষ্টাকে কখনওই নসাৎ করার চেষ্টা করেননি বরং এর গুরুত্বকে স্বীকার করেছেন। গান্ধীজি সুভাষচন্দ্রের প্রচেষ্টা সম্পর্কে বলেছিলেন 'অন্যের পক্ষে যে কাজ করিতে কয়েক যুগ লাগিয়া যাইত, বসু তা কয়েক বছরের মধ্যে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।' গান্ধীর মতে অস্ত্রের ব্যবহার দুঃখজনক ছিল বটে, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে সুভাষের কীর্তি ও অবদান সীমাহীন ছিল (নেতাজী সুভাষের মুক্তি সংগ্রাম : বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় : পশ্চিমবঙ্গ, নেতাজী সংখ্যা : তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পৃঃ ৭৯)

শ্রীরায়চৌধুরী আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর মূল্যায়নে মোটেই নৈর্ব্যক্তিক হতে পারেননি।

পরিশেষে মূলত বাংলাভাষী পাঠকদের সুবিধার জন্য তিরাশি পৃষ্ঠাব্যাপী ভুলাভাই দেশাইয়ের ইংরেজি সওয়াল কেন সংযোজিত হল বোঝা গেল না যদিও তা হয়ত ইংরেজি জানা অনিসন্ধিৎসু পাঠকের তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে। □

আজাদ হিন্দ ফৌজের কোর্ট মার্শাল ও গণবিক্ষোভ — লাডলীমোহন রায়চৌধুরী / দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩ / ৬০.০০

নারী সুফিদের নিয়ে অজানা তথ্য

আবদুর রউফ

জন এ সুভান নামে জনৈক ধর্মশাস্ত্রবিশারদ ১৯৩৮ সালে SUFISM : ITS SAINTS AND SHRINES নামে একটি বই লেখেন। এই বইয়ে বিশেষ করে ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের সুফি সাধকদের ব্যাপক পরিচয় দেওয়া হয়। এই উপমহাদেশে সুফিদের চারটি সিলসিলা বা সম্প্রদায় বিশেষ পরিচিত। চিস্তি, কাদিরি, সারওয়ার্দি এবং নক্সবন্দী। উল্লেখিত বইয়ে চিস্তি সম্প্রদায়ের ১৮৮ জন, সারওয়ার্দি সম্প্রদায়ের ৭২ জন, কাদিরি সম্প্রদায়ের ১১৬ জন এবং নক্সবন্দী সম্প্রদায়ের ৬৪ জন সুফি সাধকের উল্লেখ আছে। এইসব সাধকরা সবাই পুরুষ।

SUFISM IN INDIA নামে ক্ষুদ্র সংকলনটিতে লেখক, কমনওয়েলথ স্কলার, অধ্যাপক অমিত দে দেখিয়েছেন মধ্যযুগে এই উপমহাদেশের সুফি সাধকরা কেবলমাত্র পুরুষ ছিলেন না। সেই সময় নারী সুফি সাধকদের গুরুত্বও বিন্দুমাত্র কম ছিল না। ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত এই তরুণ গবেষক মধ্যযুগের মূল ফারসি নথিপত্র ঘেঁটে এইসব মহিলা সুফি সাধকদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। এই একই সংকলনে তিনি যখন বাংলার সুফিদের কথা বলেছেন, সেক্ষেত্রেও কিছু কিছু অজানা তথ্যের সন্ধান দেওয়া ছাড়াও তাঁর গবেষণায় গুরুত্ব পেয়েছে কোনও কোনও নারী সুফি সাধকের ভূমিকা। ফারসি ভাষায় দখল থাকায় এই তরুণ গবেষক মধ্যযুগের মূল নথিপত্র ঘেঁটে সুফিসাধনা সহ অন্যান্য বিষয়েও এরকম আরও অনেক অজানা তথ্য উদ্ঘাটনে সক্ষম হবেন। অন্তত এই ক্ষুদ্র সংকলনটি পড়ে সেই প্রত্যাশাই জেগে ওঠে। □

SUFISM IN INDIA — AMIT DEY /
Ratna Prakshan, Calcutta-75/ Rs. 40.00

উচ্চশিক্ষার হাল এবং অধ্যাপকদের দায়িত্ব

অতীন্দ্রমোহন গুণ

এ-শতকের প্রথমার্ধে এবং দ্বিতীয়ার্ধেও প্রথম কয়েক বছর এ-দেশের শিক্ষাব্যবস্থা কেমন ছিল তার একটা ধারণা পেতে হলে দু-তিনটি স্মৃতিচারণামূলক গ্রন্থ পাঠ করা যেতে পারে। এমন একটি বই অধ্যাপক সুবোধ সেনগুপ্তের 'তে নো দিবসাঃ গতাঃ', আর একটি অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের 'তরী হাতে তীর', তৃতীয় একটি অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের 'আট দশক'। যে-কোনওটি পড়লেই বোঝা যাবে ওই সময়ে কলেজ-বিশ্ববিদাশলয়ে শিক্ষকের কাজ পাওয়া সহজ ছিল না। পেলেও সে কাজে প্রচুর অর্থাগম হত এমন নয়। দেশ স্বাধীন হওয়ার ন' বছর পর যখন কলেজে পড়াতে ঢুকলাম তখনও এক প্রবীণা আত্মীয়া আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি কলেজে মাস্টারির চাকরি নিচ্ছ, কিন্তু কলেজ-শিক্ষকরা তো উপোস করে থাকে!' ওই বইগুলি পড়লে কিন্তু বোঝা যায় অধ্যাপকদের স্বল্প আয় ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ডামাডোল সত্ত্বেও সে-সময়ে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশ শান্ত পরিবেশে বিদ্যাদান ও বিদ্যার্জন হত, অধ্যাপক ও ছাত্র উভয়পক্ষই নিজ নিজ কর্তব্য নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করতেন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পঠন-পাঠনের মান সংরক্ষণে দু-পক্ষই ব্রতী হতেন। কিছু ছাত্রছাত্রী কাজে ফাঁকি দিত ঠিকই, শিক্ষকদের মধ্যেও নিশ্চয় কিছু থাকতেন যাঁকে ঠিক সুযোগ্য বলা যেত না, আর দু'চারজন ফাঁকিবাজ মাস্টারমশাইও নিশ্চয় পাওয়া যেত। কিন্তু সমগ্র শিক্ষকসমাজের জন্য কোনও আচরণবিধি প্রণয়নের কথা সে-সময়ে কেউ কল্পনা করতেন না—না সরকার, না বিশ্ববিদ্যালয়।

বর্তমান সময়ে অবস্থার বিস্তর পরিবর্তন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দাক্ষিণ্যে এখন অধ্যাপকদের মাইনে-পত্র বেড়েছে, শীঘ্রই আরও বাড়তে চলেছে, সরকারের বা অনেক বেসরকারি সংস্থার উঁচু পদের অফিসারদের আয়ের সঙ্গে অধ্যাপকদের আয় অনেকাংশে তুলনীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া আগে যেখানে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ পদ থাকত নিম্নতম স্তরের অর্থাৎ লেকচারারের পদ, এখন সে-জায়গায় অনেক রীডার বা প্রফেসরের পদ প্রবর্তিত হয়েছে। সেমিনার-সিম্পোসিয়ামে অংশ নেওয়া, বিদেশ ভ্রমণ ইত্যাদিও অনেক সহজতর হয়েছে।

এসব সত্ত্বেও কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম যে ভালভাবে চলছে না, বরং আগের তুলনায় অবস্থার অবনতি ঘটেছে, তা নিয়ে সরকার ও মঞ্জুরি কমিশন উভয়ের দিক থেকেই উদ্বেগ লক্ষিত হচ্ছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঠিক মতো ক্লাস হয় না, পাঠ্যসূচির অনেকটাই অসমাপ্ত থেকে যায়, ছাত্রছাত্রীরা অধিকমাত্রায় গৃহশিক্ষকের উপর নির্ভরশীল, পরীক্ষাগ্রহণে গলদ থাকে, পরীক্ষার ফল বেরোতে অযথা বিলম্ব হয় ইত্যাদি নিয়ে সরকার ও মঞ্জুরি কমিশন উভয়ই চিন্তিত।

অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

উচ্চশিক্ষার এই অবস্থার জন্য অধ্যাপকদেরই বিশেষ করে দায়ী করা হয়েছে। যেসব অভিযোগ শিক্ষকদের বিরুদ্ধে উঠেছে তার চারটিকে মুখ্য অভিযোগ বলা যায়। এগুলি হল: (এক) শিক্ষকরা নিয়মিত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন না এবং ক্লাস নেন না; (দুই) তাঁরা অত্যধিক 'ছুটির দিন' (Off day) ভোগ করেন; (তিন) পরীক্ষার খাতার মূল্যায়নে তাঁরা অনীহা দেখান; এবং (চার) বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের কাজে ফাঁকি দিয়ে তাঁরা বাইরে কোচিং ক্লাসে অতিরিক্ত অর্থোপার্জনে ব্যস্ত থাকেন।

অভিযোগগুলি অবশ্য সারা দেশ জুড়েই অধ্যাপক সমাজের বিরুদ্ধে উঠেছে। কিন্তু আমরা এখানে পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ও উচ্চতর শিক্ষাসংসদ-এর

আলোচনায় যেসব কথা বলা হয়েছে বিশেষ করে সেটাই মনে রাখব।

• পশ্চিমবঙ্গের কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী, তাদের অভিভাবকরা এবং অন্য যাঁরা এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন অভিযোগগুলি অনেকাংশেই যথার্থ। সাম্প্রতিক কয়েক দশক ধরে অধ্যাপকদের মাইনে-পত্তর অনেকখানি বেড়েছে, চাকরির সুবিধা-সুযোগ বেড়েছে। কিন্তু অনেক কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়েই নিয়মিত ক্লাস নেওয়া হয় না। দেখা যাবে এ-ব্যাপারে শিক্ষকসমাজ ও ছাত্রসমাজ একে অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে চান। ছাত্রছাত্রীর বলবে, ক্লাস করতে এসে তারা দেখতে পায় শিক্ষক মশাই অনুপস্থিত, উপস্থিত থাকলেও দেরি করে ক্লাসে ঢুকবেন এবং দায়সারাভাবে পড়ানোর কাজটি সাঙ্গ করবেন। এ-কারণেই না কি তারা ক্লাস করার ব্যাপারে উৎসাহ বোধ করে না। শিক্ষকরা বলবেন, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাসে আসে না; যখন তাদের ক্লাসে থাকার কথা সে-সময়টা তারা কলেজের মাঠে, কমন রুমে বা ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দেবে। ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না। এসব কারণে নাকি তাঁরা অধ্যাপনার কাজে যথেষ্ট উৎসাহ পান না।

অধ্যাপকরা বড় বেশি 'অফ-ডে' নেন এ-কথাটা বলতে ঠিক কী বোঝানো হয় জানি না। রুটিনে যে 'অফ-ডে' দেখানো থাকে তা কর্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারেই রাখা হয়। ব্যবস্থাটা চালু আছে এই জন্য যে ওই দিনটিতে বা দিনগুলিতে শিক্ষক মশাই গ্রন্থাগারে গিয়ে বা বাড়িতে বসে নিজের পড়াশুনো করবেন। কেউ গবেষণায় আগ্রহী হলে ওই দিনে তিনি গবেষণা-পরিচালকের সঙ্গে বসে গবেষণার জটিলতর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে পারেন। এমন ব্যবস্থার প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু কোনও শিক্ষক ব্যবস্থার অপব্যবহার করলে তা নিঃসন্দেহে পরিতাপের বিষয়। ওই দিনটিতে তিনি বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেবেন, কিছু অতিরিক্ত অর্থোপার্জন করবেন এসব অবশ্যই অভিপ্রেত নয়।

পরীক্ষার খাতার মূল্যায়ন যে খুব প্রীতিকর কাজ নয় তা স্বীকার করতেই হবে। অল্প কিছু উত্তরপত্রে বুদ্ধির ও অধীতবিদ্যা সম্যকভাবে অধিগত হওয়ার লক্ষণ পাওয়া যায়। অন্য সব উত্তরপত্রে দেখা যাবে একই ধরনের উত্তর, যার অনেকটাই না বুঝে মুখস্থ করে উদ্গীরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও পূর্বতন শিক্ষকরা উত্তরপত্রের সঠিক মূল্যায়ন একটি অবশ্যপালনীয় কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সে-দায়িত্ব পালন করতেন। এখন সব কিছুই ঢিলেঢালা; তাই অধ্যাপকরাও মনে করছেন এ-দায়িত্ব (বা পরীক্ষার হলে নজরদারির দায়িত্ব) থেকে রেহাই পেলেই ভাল হয়। (তাঁরা বোধ হয় মার্কিনি ব্যবস্থামাফিক 'টীচিং অ্যাসিস্ট্যান্ট' থাকার কথা মনে রাখেন; এমন সহকারী পেলে একটা অস্বস্তিকর দায়িত্ব কাঁধ থেকে নামানো যায়!)

কোচিং ক্লাস বা টিউটোরিয়াল হোম নিয়ে যে রমরমা ব্যবসা এখন চালু আছে তার জন্য অধ্যাপকদের দোষ দেওয়া যায়, কারণ এ-ব্যবসা মুখ্যত তাঁরাই টিকিয়ে রেখেছেন এবং এ-থেকে আর্থিক আয়ের মোটা অংশটাই তাঁরা লাভ করে থাকেন। কিন্তু এজন্য ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকরাও অনেকাংশে দায়ি। ছাত্রছাত্রীদের দিক থেকে প্রাইভেট কোচিঙের একটা চাহিদা আছে বলেই শিক্ষকরা এ থেকে বেশ দু-পয়সা কামাতে পারেন। তারা যদি হঠাৎ এক সময় সিদ্ধান্ত নেয় যে এখন থেকে তারা প্রাইভেট কোচিংয়ের সাহায্য নেবেনা, অধ্যাপকদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে যাতে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসগুলি ঠিক মতো নেওয়া হয় এবং নির্দেশিত পাঠ্যসূচির সমস্ত বিষয় পড়িয়ে দেওয়া হয়, তা হলে রমরমা ব্যবসা দু'-দিনে বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা এটা করতে চায় না, মনে হয় অভিভাবকরাও চান বর্তমান ব্যবস্থাই চলতে থাকুক। সাধারণ অভিভাবকের একমাত্র লক্ষ্য তাঁর নিজ সন্তানটি অন্যদের উপর টেক্কা দিয়ে ভাল ফল করুক এবং ভাল ফলের সুবাদে একটা ভাল মাইনের চাকরি জোগাড় করুক বা ইংল্যাণ্ড-আমেরিকায় উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ পাক। মনে রাখা দরকার আজকাল মধ্যবিত্ত মানুষদের হাতে বেশ দু-পয়সা এসেছে। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মাত্র ১৫–১৬ টাকা মাসিক মাইনেতে ছেলেমেয়েকে পড়ানো যায় এ ব্যবস্থায় তাঁদের মন ভরে না; তাঁদের জীবনমানের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সন্তানের শিক্ষার জন্য হাজার-বারোশ' টাকা খরচ করা তাঁদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। এই টাকাটা তাঁরা ঢালেন গৃহশিক্ষকের পকেটে। কর্তৃপক্ষও বড় ভর্তুকিতে উচ্চশিক্ষার ব্যয়বহুল ব্যবস্থা চালু রেখেছেন; যদিও ভর্তুকির সুযোগ যারা লাভ করছে তাদের অধিকাংশই এটা পাওয়ার যোগ্য নয়!

ইউ জি সি কমিটি ও পঃ বঃ উচ্চশিক্ষা সংসদের সুপারিশ

সারা দেশে এখন প্রায় ২৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, আর অনুমোদিত কলেজের সংখ্যা প্রায় ৮,০০০। কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যায়ের বিভাগগুলিতে কাজ করছেন প্রায় তিন লক্ষ মানুষ। উচ্চশিক্ষার এ-প্রসার সত্ত্বেও তার গুণমান নিয়ে মঞ্জুরি কমিশন চিন্তিত।

কমিশন ১৯৯৪ সালের সেপ্টেম্বরে উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন দিক পর্যালোচনার জন্য ড. আর. পি. রস্তগীর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করেছিলেন। ১৯৯৭-এর মে মাসে কমিটি তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছেন। তাঁরা একদিকে শিক্ষকদের চাকরির

শর্তাদি আরও আকর্ষণীয় করার সুপারিশ রেখেছেন, অন্যদিকে সমাজের কাছে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতার কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন এবং বলেছেন তাদের কাজকর্মে নিষ্ঠাপরায়ণতা বাড়বে এটাও প্রত্যাশিত।

কমিটি চেয়েছেন প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বছরে অন্তত ১৮০ দিন ক্লাস হোক। বর্তমানে কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগগুলি ও কলেজগুলিতে অনেকক্ষেত্রেই মাত্র ৯০ থেকে ১০০ দিন ক্লাস হয়ে থাকে। ১৯৮৪ সালের শিক্ষা কমিশন যে-নির্দেশিকা তৈরি করেছিলেন তার মধ্যে বলা হয়েছে নিয়মিত চাকরিতে যে শিক্ষকরা রয়েছেন তাঁদের প্রত্যেককে সপ্তাহে অন্তত ৪০ ঘণ্টা প্রতিষ্ঠানের কাজ করতে হবে। বর্তমান কমিটিও চান ওই নির্দেশিকা অনুসৃত হোক। এই ৪০ ঘণ্টা সময় বিভিন্ন খাতে নিম্নের মতো করে বণ্টনের কথা তাঁরা বলেছেন:

শিক্ষকদের কর্তব্য	বিশ্ববিদ্যালয়ে	কলেজে
ক্লাস নেওয়া	১০ ঘণ্টা	১৬ ঘণ্টা
পরীক্ষাসংক্রান্ত কাজ	১ ঘণ্টা	২ ঘণ্টা
টিউটোরিয়াল	৪ ঘণ্টা	৪ ঘণ্টা
অধ্যাপনার জন্য প্রস্তুতি	১০ ঘণ্টা	১০ ঘণ্টা
গবেষণা	১০ ঘণ্টা	—
পাঠক্রম বহির্ভূত কাজের তত্ত্বাবধান	—	৪ ঘণ্টা
নিজস্ব অধ্যয়ন	৫ ঘণ্টা	—
মোট	৪০ ঘণ্টা	৪০ ঘণ্টা

সমাজের কাছে শিক্ষকদের দায়বদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন রাখার উদ্দেশ্যে কমিটি দু'ধরনের মূল্যায়নের প্রস্তাব করেছেন। প্রথমত, শিক্ষক বর্ষ শেষে নিজের কাজের মূল্যায়ন করবেন। এজন্যে একটি মূল্যায়নপত্র তাঁকে পূরণ করে দিতে হবে। স্থির হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে এই পত্রগুলি বিভাগীয় প্রধান মারফত প্রথমে উপাচার্যের কাছে যাবে, পরে সিণ্ডিকেট বা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের কাছে পেশ করা হবে। বেসরকারি কলেজের বেলায় এগুলি পেশ করা হবে পরিচালন সমিতির কাছে, আর সরকারি কলেজের ক্ষেত্রে শিক্ষা-অধিকর্তার কাছে। দ্বিতীয়ত, ছাত্ররাও শিক্ষকের কর্মদক্ষতা ও নিষ্ঠার মূল্যায়ন করবে অনেকটা মার্কিনি ধাঁচে। তাদের এজন্য যে প্রশ্নগুচ্ছ দেওয়া হবে তার উদ্দেশ্য তাদের জ্ঞানের বিচার নয়। বরং তাদের জিজ্ঞেস করা হবে শিক্ষক যে-বিষয় পড়িয়েছেন তা আকর্ষণীয় করতে পেরেছেন কি না, তাঁর পাঠনধারা তারা অনুসরণ করতে পেরেছে কি না, কোনও অংশে অসুবিধা বোধ করলে সে সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে তিনি হাসিমুখে তার উত্তর দিয়েছেন কি না, বাড়ির কাজ ও পরীক্ষার উত্তরপত্র দেখার সময় তাঁর কাছ থেকে সুবিচার পাওয়া গেছে কি না ইত্যাদি। এ ব্যবস্থা চালু হলে শিক্ষাব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন আনা হবে, কারণ বর্তমান সময়ে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন একেবারেই অনুপস্থিত আর স্ব-মূল্যায়নের পরিবর্তে শিক্ষক সম্বন্ধে একটি গোপন প্রতিবেদন পেশ করা হয় বছরের শেষে। এ ব্যবস্থাও শুধু সরকারি কলেজেই চালু আছে এবং সাধারণত বিভাগীয় প্রধান প্রতিবেদন তৈরি করে দেন।

সন্দেহ নেই যে-মূল্যায়নের কথা বলা হয়েছে তা শিক্ষকের পদোন্নতি বা উচ্চতর বেতনক্রমের প্রশ্নে কাজে লাগানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চশিক্ষা সংসদ যেমন প্রস্তাব করেছেন তা ইউ জি সি কমিটির প্রস্তাবেরই অনুরূপ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যেই এ-প্রস্তাবগুলি কার্যত গ্রহণ করেছেন। শিক্ষকদের জন্য একটি আচরণ বিধি প্রণয়নের কথাও প্রস্তাবে রয়েছে।

শিক্ষকের স্বাধীনতা ও আমাদের দৃষ্টিকোণ

আমি শিক্ষকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী এবং এও বিশ্বাস করি যে "that government is the best which governs least". অফিসের কর্মচারিদের মতো শিক্ষকদের দশটা-পাঁচটা কাজ দেখাতে হবে, প্রতি পদে কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের জবাবদিহি করতে হবে এমনটি নিশ্চয় কাম্য নয়। শিক্ষক স্বতঃস্ফূর্তভাবে পড়াবেন, সহকর্মীদের সঙ্গে মতের আদান-প্রদান করবেন এটাই অভীপ্সিত। বার্ট্রান্ড রাসেলের একটি উক্তি এখানে স্মর্তব্য: 'কোনও শিল্পী বা দার্শনিক বা সাহিত্যিকের মতোই একজন শিক্ষক তাঁর কর্তব্য তখনই সম্যকরূপে সমাধা করতে পারবেন যখন তিনি অনুভব করতে পারবেন যে অন্তরের এক সৃজনশীল প্রেরণায় তিনি পরিচালিত, বাইরের কোনও কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রভাবিত বা শৃঙ্খলিত নন।'" শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে ঠিক কীভাবে পড়াবেন, ঠিক কী কী বিষয়াংশে বেশি জোর দেবেন, কোনও ছাত্রছাত্রী শ্রেণীকক্ষে অসদাচরণ করলে কীভাবে তার মোকাবেলা করবেন—এসব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা তাঁকে দিতেই হবে।

এ-কারণেই সরকার বা কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের জন্য আচরণবিধি তৈরি করবেন, সে-আচরণবিধি যথাযথভাবে মানা হল কি না তার খবরদারি করবেন এমনটি অনেকের মতো আমার কাছেও খুব পছন্দ নয়।

কিন্তু দেশের উচ্চশিক্ষাব্যবস্থার ক্রমাবনতি লক্ষ করে নাগরিক হিসাবে আমি শঙ্কা বোধ করি। এবং যেহেতু আমিও একজন শিক্ষক, এ-অবনতি রোধ করার জন্য আমার পক্ষে যতটা প্রয়াস করা সম্ভব তা করতে চাই। শিক্ষকসমাজের ওপর যেহেতু

জাতিগঠনের দায়িত্ব বর্তায়, তাই তাঁদের নামে যেটুকু কালিমা লেগেছে তা মোচন করতে তাঁদের প্রয়াসী হওয়া সঙ্গত এটাও বিশ্বাস করি। কারণ, শিক্ষকের স্বাধীনতা বলতে আমি বুঝি মূলত চিন্তার স্বাধীনতা, যে-কোনও বিষয়কে নিজের মতো করে বিচার করার স্বাধীনতা এবং পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে আপন মতামত ছাত্রছাত্রীদের কাছে উপস্থাপিত করার স্বাধীনতা। আমার কাছে শিক্ষকের স্বাধীনতা মানে খেয়ালখুশি মতো কলেজে আসা, খেয়ালখুশি মতো ক্লাসে ঢোকা বা খেয়ালখুশি মতো পরীক্ষার খাতায় চোখ বুলিয়ে নিয়ে নম্বর বসানো নয়।

আমি জানি এখনও অনেক অধ্যাপক আছেন তাঁরা অধ্যাপনাকে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছেন, অতীব সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন। আচরণবিধি চালু করা হলে তাঁদের প্রতি অবিচার হবে সন্দেহ নেই। কিন্তু দেশের শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে যাঁদের পরিচিতি আছে তাঁরা সকলেই স্বীকার করবেন যে এ-ব্যবস্থার সামগ্রিক চিত্রটি মোটেই আশাপ্রদ নয়। উচ্চশিক্ষার পেছনে রাষ্ট্রের বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয়ের পরও দেখা যায় অনেক কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠিকমতো ক্লাস বসে না, জমকালো পাঠ্যসূচি থাকলেও তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না, পরীক্ষায় ছাত্রছাত্রীদের সাধারণ ফল খারাপ হলেও 'গ্রেস মার্কস' দিয়ে উত্তীর্ণের হারকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে দেখানো হয়। শিক্ষকরা প্রাইভেট কোচিং করে বা গবেষণা-সেমিনার-সিম্পোসিয়ামের নাম করে দিনের পর দিন ক্যাম্পাসের বাইরে কাটান। যে-গবেষণাকর্মের উপরে পিএইচ.ডি. দেওয়া হয় তার অধিকাংশই যে ডিগ্রি পাওয়ার উপযুক্ত নয় সে-অভিযোগও নানা সময়ে উত্থাপিত হয়েছে। শিক্ষকপদে নির্বাচনের সময়ে নিজেদের (অর্থাৎ একই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী বা একই অঞ্চলের) প্রার্থীকে ঢুকিয়ে নেওয়ার প্রবল চেষ্টা হয়, যদিও নিয়মানুসারে প্রয়োজনীয় যোগ্যতা যার আছে এমন ভারতীয় মাত্রই সে-পদের জন্য প্রার্থী হতে পারেন।

এসব কারণে জনমানসে গোষ্ঠী হিসাবে শিক্ষক সমাজের ভাবমূর্তি বেশ খানিকটা কালিমালিপ্ত হয়েছে। সাধারণ মানুষের এমন ধারণা হয়েছে যে এঁরা শুধু মাইনে বাড়াবার আন্দোলনে উৎসাহী, কোনও সুশৃঙ্খল ধারায় তাঁদের স্কন্ধে ন্যস্ত কর্তব্য পালনে তেমন আগ্রহী নন। ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করার উদ্দেশ্যেই সকল শিক্ষকের পক্ষে আচরণ-বিধি মেনে নেওয়া সঙ্গত বলে মনে করি।

প্রথমত, অন্য কোনও চাকরির মতো এখানেও এটা প্রয়োজন যে শিক্ষক প্রতিদিন না হোক, তাঁর যেদিন ক্লাস থাকবে সেদিন যথাসময়ে কলেজে আসবেন, যে-সব ক্লাস তাঁর নেওয়ার কথা সেগুলি সযত্নে নেবেন, পাঠ্য বিষয় অনুধাবনে ছাত্রছাত্রীদের যেসব অসুবিধা হবে তা নিরসনে সচেষ্ট হবেন। কলেজে এলে উপস্থিতি-পঞ্জিতে (attendance register) সই করে দেবেন। ক্লাস নেওয়া হয়ে গেলেও বিভাগে থেকে ছাত্রছাত্রীরা যে-বিষয়গুলি দুরূহ মনে করছে তা নিয়ে আলোচনার জন্য খানিকটা সময় তাদের দেবেন। তাছাড়া কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্য কিছু কাজ থাকে—যেমন পরীক্ষার সময় নজরদারির কাজ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠা দিবস পালন বা নতুন বর্ষে ছাত্রভর্তির সময় কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার কাজ, ছাত্র যুনিয়নের নির্বাচন পরিচালনার কাজ ইত্যাদি। এসব কাজও তাঁরা সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন এটা প্রত্যাশিত।

'অফ-ডে' সপ্তাহে একদিনের বেশি অবশ্যই থাকা উচিত নয়। 'অফ-ডে' কীভাবে কাটানো হবে তা নির্দেশ করে কোনও আদেশ জারি করা হলে তা ব্যক্তিগত বিষয়ে হস্তক্ষেপের পর্যায়ে চলে যায়। কিন্তু তা হলেও আমি মনে করি যে এমন একটা আদেশ থাকলে অনেক শিক্ষক বর্তমানে যে কর্মস্থলে এসে চুটিয়ে আড্ডা মারেন, বাজার দর নিয়ে আলোচনায় বা শেয়ার মার্কেটে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নেওয়ার পরিকল্পনায় মেতে ওঠেন, বা দেশের রাজনীতির গতিপ্রকৃতি নিয়ে উত্তেজিত বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন এসব অনেকটা বন্ধ হতে পারে।

পরীক্ষার কাজ কলেজ কর্তৃপক্ষ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে কোনও শিক্ষককে যতটা করতে বলা হবে—তা প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, উত্তরপত্র পরীক্ষা এ সবই হতে পারে—তা তিনি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করবেন এটাও অভিপ্রেত। তবে দেখা উচিত তাঁকে যেন অত্যধিক সংখ্যায় উত্তরপত্র দেওয়া না হয়। শিক্ষকের কাঁধে অত্যধিক সংখ্যায় উত্তরপত্র চাপিয়ে দিলে তাঁর প্রতি অন্যায় করা হয়। বস্তুত, এভাবে ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়ন যথাযথ না হওয়াই সম্ভব—'গড় নম্বর' প্রতি খাতায় দিলে যে-ছাত্রের বেশি নম্বর পাওয়ার কথা তার প্রতি অবিচার হয়, আর যে-ছাত্র অতি সাধারণ তাকে হয়ত অনেক বেশি নম্বর দেওয়া হয়।

প্রাইভেট কোচিং বন্ধ করার কথা মঞ্জুরি কমিশন বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা সংসদও বলেছেন। বন্ধ করতে হলে দোষি শিক্ষকদের শাস্তিদানের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেক শিক্ষককে যদি সপ্তাহে ৪০ ঘণ্টার কাজ কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখাতে হয়, তবে প্রাইভেট পড়ানোর মানসিকতা এবং শক্তি দু-ই চলে যাবে! একই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের দেয় টাকা অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। ১৯৪০ সালকে ভিত্তিবর্ষ ধরে ১৯৯৭-এর মূল্যসূচক যদি ২৫০০ হয়ে থাকে, তবে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খরচ আগের মতো থেকে যাবে এমন প্রত্যাশা করার অর্থ হয় না। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের পড়ার মাসিক মাইনে ১৫–১৬ টাকার পরিবর্তে শ'চারেক টাকা হওয়া সঙ্গত। সঙ্গত বিশেষ করে এ-কারণে যে এমন ভর্তুকির সুযোগ ভোগ করছে সমাজের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল একটি অংশ, যেখানে অভিভাবক সহজেই

মাসিক শ'চারেক টাকা—এমনকী হাজার দু-হাজার টাকা একটি পুত্র বা কন্যার পড়ার পেছনে ব্যয় করতে পারেন। বস্তুত, অভিভাবকরা সাধারণত যে-পরিমাণ টাকা গৃহশিক্ষক বা টিউটোরিয়াল হোমের পেছনে খরচ করেন তার সবটাই কলেজের উচিত ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে ট্যুইশন ফী হিসাবে আদায় করা। এমন করলে ছাত্রছাত্রীরা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনাকে গুরুত্ব দিতে শিখবে, প্রয়োজন হলে ফাঁকিবাজ শিক্ষকের উপর চাপ সৃষ্টি করতেও পারবে!

কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

আমি চাইব এসব বিধি প্রতিটি কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে চালু হোক এবং শিক্ষকরা বিধিগুলি মেনে চলুন। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্য যে দু'টি গোষ্ঠী থাকে তাদেরও আমাদের হিসাবে আনা দরকার। ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত তাদের বিদ্যালয়ে আসবে, এসে কমন রুম বা ক্যান্টিনে সময় না কাটিয়ে ক্লাসে মন দিয়ে অধ্যাপকের কথা শুনবে, অধ্যাপক বাড়িতে করার জন্য যেসব কাজ নির্দেশ করে দেবেন তা সমাপ্ত করে যথাসময়ে তাঁর কাছে পেশ করবে, পঠনকালে যেসব অংশ দুরূহ ঠেকবে অধ্যাপকের সঙ্গে আলোচনায় বসে তা বুঝে নেবে। আবার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে অশিক্ষক কর্মীরা কাজ করেন তাঁরা শিক্ষকদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন, অধ্যাপনার কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবেন এ সবও কাঙ্ক্ষিত।

সবচেয়ে বড় কথা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলার পরিবেশ, সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হলে কর্তৃপক্ষের জন্যও একটা আচরণবিধি থাকা দরকার। এ-বিধি লিখিত বিধি হওয়ার প্রয়োজন নেই, কিন্তু কর্তৃপক্ষকে যথাসম্ভব তা মেনে চলতে হবে। অন্য রাজ্যের কথা আমরা ভালভাবে জানি না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় বর্তমানে যে দুরবস্থা চলেছে তার দায়ের অনেকখানিই কর্তৃপক্ষের স্কন্ধে আরোপ করা যায়। এমনিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক-ছাত্র-কর্মীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার কথা নয়, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নতুন শাসকরা ক্ষমতায় বসে বিশেষ ধরনের (অর্থাৎ তাঁদের পছন্দ করা) রাজনীতিতে লিপ্ত হতে এ তিন গোষ্ঠীকেই উৎসাহ দিয়েছেন। সত্তরের দশকের শেষে এবং পুরো আশির দশক জুড়ে এমনটিই চলছিল। প্রকৃত সুবেদী, নিষ্ঠাবান শিক্ষকরা প্রায় প্রতিটি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। কারণ, যে-শিক্ষকরা কর্তৃপক্ষের পছন্দের রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে চেয়েছেন তাঁদের নানাভাবে লাঞ্ছনার ব্যবস্থা হয়েছিল। শিক্ষক নিয়োগে, তাঁদের পদোন্নতিতে, তাঁদের বদলির ব্যাপারে শিক্ষা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বার্থ দেখা হয়নি, ব্যক্তির নিজস্ব শিক্ষাগত যোগ্যতা বা কর্মদক্ষতা দেখা হয়নি। বস্তুত, যে উচ্চতর শিক্ষা সংসদ আজ শিক্ষক সমাজকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন, তার সদস্যদের দিকে তাকালেও এ-কথাটাই স্পষ্ট হয়ে উঠবে। উপাচার্য নির্বাচনে, কলেজ-অধ্যক্ষ নির্বাচনে, কর্ম সচিব বা পরীক্ষা-নিয়ামক বা রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা নিয়োগে স্বকীয় গুণবত্তার চাইতে শাসকদলের কাছে গ্রহণযোগ্যতাই বড় বিবেচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত, কলেজে কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে খোঁজ নিলে দেখা যাবে শাসকগোষ্ঠীর প্রীতিভাজন শিক্ষকরাই ক্লাস ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপারে, ক্লাস না নিয়ে মাস-শেষে মাইনে নেওয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী। তাঁরা ধরে নিয়েছেন শাসক গোষ্ঠীর কাছাকাছি থাকাটাই বড় কথা, তা করলে ক্লাস নেওয়ার দায়িত্ব পালন না করলেও চলবে। এখন বলা হচ্ছে, অধ্যাপকরা পরীক্ষার খাতা দেখতে চাইছেন না। কিন্তু কিছুদিন আগেও বোর্ড অব স্টাডিজ-এর সদস্য হতে হলে, এমনকী পরীক্ষক বা মডারেটর হতে হলে দলীয় সমর্থক হওয়া অত্যাবশ্যক ছিল। তা হলে উচ্চতর শিক্ষা সংসদের অভিযোগের এটাই অর্থ হয় না যে দলীয় সমর্থকরাই রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে পথে বসিয়েছেন?

এ-কারণেই বলছিলাম যে কর্তৃপক্ষ যদি সত্যি উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক, সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে চান, তবে তাঁদের কিছু আচরণবিধি মেনে চলতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত কমিটি-কমিশন বা অনুরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী সংস্থায় যোগ্যতম শিক্ষকদেরই সদস্য হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। আর এ-যোগ্যতার মাপকাঠি হবে পঠন-পাঠনে উৎকর্ষ ও নিষ্ঠা, দলীয় আনুগত্য নয়। নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলির প্রশ্নে দলবাজি পরিহার করে প্রকৃত যোগ্য প্রার্থীকেই সুযোগ দিতে হবে। অযোগ্য, নিষ্ঠাহীন শিক্ষকদের মাথায় তোলা হলে বর্তমান নৈরাজ্য চলতেই থাকবে।

যদি চাওয়া হয় যে শিক্ষকরা প্রতিদিন বা অন্তত পাঁচদিন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির থাকবেন, তবে ক্যাম্পাসের সন্নিকটে তাঁদের গৃহসংস্থান দরকার। কৃষ্ণনগর কলেজে যিনি পড়াবেন তাঁকে যদি কলকাতা থেকে ট্রেনে যাতায়াত করতে হয় তবে কলেজে তাঁর সপ্তাহে পাঁচদিন উপস্থিতি নিশ্চয় আশা করা যায় না। যদি চাওয়া হয় যে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষকরা ক্লাস নেওয়া ছাড়াও অন্য কাজের জন্য বেশ কয়েক ঘণ্টা সেখানে থাকবেন, তবে বিদ্যালয়ের মধ্যে তাঁদের সবার বসার জায়গা দিতে হবে। বেশির ভাগ কলেজেই কিন্তু দেখা যাবে ক্লাসরুমেরই যথেষ্ট অভাব আছে; সেখানে সব শিক্ষকের জন্য বসার জায়গা থাকার কথাই ওঠে না। একই ভাবে, যদি চাওয়া হয় যে বাইরে কোচিং দেওয়া-নেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ হোক,

তবে বিদ্যালয়ের মধ্যেই টিউটোরিয়াল ক্লাস নেওয়ার মতো যথেষ্ট সংখ্যায় ছোট ছোট ঘর (Cubicle) থাকতে হবে।

ছাত্রছাত্রীদের অযথা রাজনীতিতে টেনে না এনে, ভবিষ্যৎ দলীয় কর্মী হিসাবে তাদের প্রশিক্ষণ না দিয়ে তাদের যা আসল কাজ সেই অধ্যয়নের কাজে বেশি করে যত্নবান হতে বলা দরকার। নিষ্ঠাবান কিন্তু অন্য রাজনৈতিক মতের শিক্ষকদের বা রাজনীতি-বিমুখ শিক্ষকদের নাজেহাল করার কাজে তাদের লাগালে উল্টো ফল হবে।

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অশিক্ষক কর্মীরা অনেকে যে ধরে নিয়েছেন তাঁরাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সর্বেসর্বা, শিক্ষকরা তাঁদের তোয়াজ করে চলবেন, না চললে প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম তাঁরা অচল করে দেবেন—এ-অবস্থার অবসান ঘটাতে হবে। শিক্ষকরা সম্ভ্রম নিয়ে, মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারেন এমন পরিবেশই অভিপ্রেত। কর্তৃপক্ষ (বা শাসক গোষ্ঠী) কিন্তু অনেক সময়ে স্বাধীনচেতা কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠ শিক্ষকদের দলে ভেড়াতে গিয়ে শিক্ষাকর্মীদের সাহায্য নিয়েছেন। উপেক্ষা-অপমানের বাতাবরণে কাজ করতে হলে শিক্ষকদের কাছ থেকে অধ্যাপনায় উৎকর্ষ আশা করা যায় না।

কিছু মামুলি সুপারিশ

রস্তগী কমিটি যে বলেছেন কলেজ শিক্ষকদের ক্ষেত্রে ১৬ ঘণ্টা (বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের ১০ ঘণ্টার পরিবর্তে) ক্লাস নিতে হবে, গবেষণা বা নিজস্ব পঠনের প্রয়োজন নেই এ-থেকে কিন্তু তাঁদের ধারণায় কলেজ-শিক্ষকদের স্থান যে খুব উঁচু নয় তা বোঝা গেল। কলেজ শিক্ষকদের পদোন্নতির সময়ে, তাঁদের নিয়োগের সময়ে গবেষণায় পারদর্শিতা বিচার করা হয়, তাই এ প্রস্তাবটির খানিকটা পরিবর্তন সমীচীন।

শিক্ষকদের কর্মদক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার মূল্যায়ন ছাত্রছাত্রীরা করবে এটা বেশ কিছু শিক্ষকের মনঃপূত নয়। কিন্তু মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখতেই হবে, আর ছাত্রছাত্রীরাই মূল্যায়নের কাজটি সবচেয়ে ভালভাবে করতে পারে। তারা বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করেনি, তাই যথাযথ মূল্যায়নে অক্ষম এমন কথা বলে লাভ নেই। কারণ প্রস্তাবে বলা হয়েছে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর সব ছাত্রছাত্রী মূল্যায়নে অংশ নিলেও স্নাতকপূর্ব স্তরে কলেজের শেষ (তৃতীয়) বর্ষের ছাত্রছাত্রীরাই এ-কাজটি করবে। দ্বিতীয় কথা, তার ধীমত্তা-নির্বিশেষে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীর পক্ষে এটা বোঝার ক্ষমতা নিশ্চয় রয়েছে যে সে শিক্ষকের পাঠদান অনুসরণ করতে পারছে কি পারছে না অথবা অধ্যাপক নিষ্ঠাবান, না নিষ্ঠাহীন। তাছাড়া, যদি বলা হয় যে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময়ে রাজনৈতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হওয়ার ফলে তাদের মূল্যায়ন বস্তুনিষ্ঠ না-ও হতে পারে, তবে সে-কথাটার উপরও বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কারণ, মূল্যায়নের অন্য তিনটি স্তরও রয়েছে—স্বমূল্যায়ন, সহকর্মীদের মূল্যায়ন এবং কর্তৃপক্ষের মূল্যায়ন। কোনও এক স্তরের মূল্যায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হলে অন্য স্তরে সে-ত্রুটি সংশোধিত হওয়ার সুযোগ থাকবেই।

সবশেষে কিন্তু একটা কথা না বলে পারছি না। পূর্বকালে এত সব কমিটি-কমিশন ইত্যাদি না থাকলেও লেখাপড়াটা অনেক ভালভাবে হত। আমার তাই ধারণা উচ্চতর শিক্ষা নিয়ে যত বেশি হইচই হবে, ভড়ং যতই বাড়বে, আসল কাজে ততই বেশি ঢিলে পড়বে। কয়েকটি মামুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থার অধোগতি রোধ করা যেতে পারে:

(এক) সাধারণ মূল্যসূচকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ছাত্রছাত্রীদের ট্যুইশন ফি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সর্বত্র অনেকখানি বাড়িয়ে দেওয়া হোক।

(দুই) বিভিন্ন মহলে যে ক্লাস না-নেওয়া এবং ক্লাস না-করাকে আধুনিকতার লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়েছে এটার নিরসন প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে উপস্থিতির কড়াকড়ি ছাত্র-শিক্ষক উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করতে হবে। উভয়ের জন্যই সেমিনার-সিম্পোসিয়ামের সংখ্যা যথাসম্ভব কমিয়ে দেওয়া হোক। সংখ্যা অল্প রেখে বরং তাদের উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখা হোক।

(তিন) ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বন্ধ করা যাবে না, কিন্তু শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সক্রিয় রাজনীতিতে আগমন বন্ধ হোক। তাঁদের রাজনৈতিক মত থাকতে পারে, সে-মত তাঁরা প্রকাশও করতে পারেন, কিন্তু কোনও দলীয় সংগঠনের সদস্য হওয়া, দলীয় প্রার্থী হয়ে সংসদ, বিধানসভা, পৌরসভা বা পঞ্চায়েতের নির্বাচনে দাঁড়ানো নিষিদ্ধ হোক।

(চার) অধ্যাপক নিয়োগের সময়ে প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন দেখা হবে, তেমনই দেখা হোক ক্লাসে ঢুকে ছাত্রছাত্রীদের সামনে বিষয়বস্তু সুবোধ্যভাবে এবং আকর্ষণীয় করে উপস্থাপনার ক্ষমতা প্রার্থীর আছে কি না। পদোন্নতির প্রশ্নেও গবেষণায় কৃতিত্বকে গুরুত্ব দেওয়া হোক, কিন্তু ব্যাখ্যান (exposition)-এ পারদর্শিতাকে লঘু করে দেখলে চলবে না।

(পাঁচ) শুধু চাকরির দৈর্ঘ্য অনুসারে শিক্ষকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা বন্ধ হোক। আর নিষ্ঠাহীন বা অযোগ্য শিক্ষকদের কিছুটা দণ্ডদানের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। □

প্রসঙ্গ : 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়'

নজরুল ইসলাম

আপনার পত্রিকায় (পৌষ ১৪০৩) প্রকাশিত আমার বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচক মহাশয় দাবি করেছেন যে, 'চতুরঙ্গের ভাদ্র সংখ্যায় আমার বিশেষ সমালোচনা-নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। এটি স্রেফ ড. নজরুল ইসলামের 'হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ভাল করার উপায়' পুস্তকের সমালোচনা ছিল না। সমালোচনা নিবন্ধ (রিভিউ আর্টিক্‌ল) বলার অর্থই হচ্ছে পুস্তকের সমালোচনা এবং তদুপরি প্রসঙ্গসূত্রে সমালোচকের নিজস্ব নিবন্ধ।'

আমার প্রশ্ন, 'স্রেফ পুস্তকের সমালোচনা' না হয়ে সমালোচনা নিবন্ধ হলেই কি তাতে ভুল পরিসংখ্যান, বিকৃত তথ্য এবং অন্যান্য সিদ্ধান্তসমূহ পুরে দেওয়ার অধিকার জন্মে? আমি একটা উদাহরণ তুলে দিচ্ছি।

আপনার পত্রিকায় (ভাদ্র, ১৪০৩) সমালোচক মহাশয়ের যে 'সমালোচনা নিবন্ধ' প্রকাশিত হয়েছিল তাতে তিনি আমার 'আলোচনা' সম্পর্কে যে-কয়টি প্রশ্ন তুলেছিলেন তার ৫ নং প্রশ্ন ছিল 'কেরলে খ্রিস্টীয় সম্প্রদায় তো সেখানকার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ। হিন্দু উচ্চবর্ণের লোকেরা তো খ্রিস্টানদেরও 'যবন' বলত ম্লেচ্ছ বলার ধরনেই। তা সত্ত্বেও খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদ গড়ে ওঠেনি কেন এবং আজ সেখানে এই প্রকার অভিধা বিলীন হয়ে গেছে কীভাবে?' যে তথ্যকে সত্য বলে ধরে নিয়ে তিনি এই প্রশ্ন করেছেন তা এতটাই অসত্য যে, বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু তাঁর দেওয়া পরিষ্কার পরিসংখ্যানটার কথা বলছি। তিনি লিখেছেন, 'কেরলে খ্রিষ্টীয় সম্প্রদায় তো সেখানকার লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ।' তিনি কোথায় থেকে এ পরিসংখ্যান পেলেন? কেরালায় লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ ৩৩.৩৩% খ্রিষ্টান কোনওদিনই ছিল না, এখনও নেই। আমাদের দেশে সর্বশেষ লোকগণনা হয়েছে ১৯৯১ সালে। ১৯৯১ সালের আদমশুমারি অনুসারে কেরালার মোট লোকসংখ্যা ২,৯০,৯৮,৫১৮। তার মধ্যে খ্রিষ্টানদের সংখ্যা ৫৬,২১,৫১০। অর্থাৎ কেরালায় খ্রিষ্টানরা মোট লোকসংখ্যার ১৯.৩২% অর্থাৎ এক-পঞ্চমাংশেরও কম। আমার 'আলোচনা' সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার জন্য কেরালার এক-পঞ্চমাংশেরও কম (১৯.৩২%) খ্রিষ্টানদের তিনি কি করে এক-তৃতীয়াংশ (৩৩.৩৩%) করলেন, সে প্রশ্ন তাঁকে করলে তাঁর মনে হতেই পারে 'এসব অবান্তর বক্তৃতা'।

হ্যাঁ, আমার যে-লিখিত বক্তব্য আপনার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল তাকে তিনি 'বক্তৃতা' বলেই উল্লেখ করেছেন। আমি জানতাম, মৌখিকভাবে রাখা বক্তব্যকে, বিশেষ করে সমবেত জনমণ্ডলীর সামনে দেওয়া ভাষণকে বক্তৃতা বলে। লিখিত বা ছাপা বক্তব্যকে বক্তৃতা বলে তা এই প্রথম সমালোচক মহাশয়ের কাছে জানলাম। আমার আশা ছিল, বাংলা ভাষায় 'বক্তৃতা' বলতে কি বোঝায় তা সমালোচক মহাশয় জানেন!

তাঁর 'সমালোচনা নিবন্ধে' সমালোচক মহাশয়ের দু' নং প্রশ্ন ছিল, 'হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা তো ছিল প্রধানত তথাকথিত শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে তাহলে শূদ্রবর্ণের মধ্যে এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ এল না কেন?' আপনার পত্রিকার পৌষ ১৪০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত আমার বক্তব্যে আমি শূদ্রদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলি উল্লেখ করেছিলাম। তারপর তিনি এবারে দাবি করেছেন, 'শূদ্রদের মধ্যে আলায়েনেশান ছিল কিন্তু সেপারেশন ছিল না। শূদ্রবর্ণের মধ্যে কেউ বলেননি যে, এদেশে একসঙ্গে বসবাস করা অসম্ভব, শূদ্রবর্ণের জন্য পৃথক হোমল্যান্ড চাই।' এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি জানতে চান, শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসাকিতা থাকলেও শূদ্রদের মধ্যে 'সেপারেশান' 'চরিত্রের' বিচ্ছিন্নতাবাদ এল না কেন?

সমালোচক মহাশয়ের দাবি 'তিনি (অর্থাৎ আমি) সমালোচনাটি ভালভাবে পড়েও দেখেননি।' এর থেকে এ অনুমান করা নিশ্চয় অন্যায় হবে না যে, সমালোচক মহাশয় আমার গ্রন্থটি ভালভাবে পড়ে দেখে নেওয়ার পরই তাঁর 'সমালোচনা নিবন্ধ' লিখেছেন! তাই তাঁর কাছে আমার কয়েকটি প্রশ্ন :

১. একথা কি মাননীয় সমালোচক মহাশয় মেনে নিতে রাজি আছেন যে, আমার গ্রন্থে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য যে ৪৮ টি কারণের উল্লেখ করেছি অভিজাত শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উন্নাসিক মনোভাব সেগুলির অন্যতমমাত্র?

২. তা হলে, হঠাৎ করে সমালোচক মহাশয়ের মনে হল কেন যে, হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা যেহেতু শূদ্রদের বিরুদ্ধে ছিল, শূদ্রদের মধ্যেও 'এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ' আনতেই হবে?

৩. আমার 'আলোচনা'য় কি 'উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা'কে 'এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদে'র কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে?

৪. হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হওয়ার জন্য আমি যে ৪৮ টি কারণের উল্লেখ করেছি সমালোচক মহাশয় কি ইতিমধ্যেই প্রমাণ করে দিয়েছেন যে উচ্চবর্ণ-শূদ্রবর্ণের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সে কারণগুলি সমানভাবে প্রযোজ্য?

৫. না হলে, তিনি আশা করেন কি করে যে, উভয়ের মধ্যেই একই 'চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ' আসতে হবে?

আমার 'আলোচনা'য় বলা হল বাংলায় হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক খারাপ হওয়ার অন্যতম কারণ অভিজাত শ্রেণীর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের উন্নাসিক মনোভাব। সমালোচক মহাশয় যে 'আলোচনা' ভাল ভাবে পড়ে লিখলেন, 'তাঁর আলোচনা সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে: (২) হিন্দু উচ্চবর্ণের উন্নাসিকতা তো ছিল শূদ্রবর্ণের বিরুদ্ধে, তাহলে শূদ্রবর্ণের মধ্যে এ চরিত্রের বিচ্ছিন্নতাবাদ এল না কেন?' এবারে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন এ চরিত্রের বলতে তিনি বুঝিয়েছেন 'সেপারেশান', 'সেপারেট হোমল্যাণ্ডে'র দাবি।

মাননীয় সমালোচক মহাশয়ের অজানা থাকার কথা নয় যে, পৃথক আবাসভূমির দাবি শুধু শূদ্রবর্ণের লোকদের মধ্যে নয়, উচ্চবর্ণের লোকদের মধ্যেও ছিল। ১৯৪৭ সালে 'বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতি, সভ্যতা, ভাষা ও ঐতিহ্য' রক্ষা করার জন্য হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের হিন্দু নেতাদের নেতৃত্বে পৃথক আবাসভূমির জন্য আন্দোলন তো বহুল আলোচিত বিষয়। বাংলাকে ভাগ করে হিন্দুদের জন্য একটি পৃথক প্রদেশ গঠন করার জন্য হিন্দু মহাসভা এবং কংগ্রেসের দ্বারা ৭৬ টি সভা করা হয়েছিল। যে-গ্রন্থ ভালভাবে পড়ার পর তিনি তাঁর 'সমালোচনা নিবন্ধ' লিখেছেন সে-গ্রন্থেও এর বর্ণনা আছে। পরিশিষ্টে এ ব্যাপারে সর্দার প্যাটেলের কাছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং বি সি সিনহার চিঠিও দেওয়া হয়েছে। সমালোচক মহাশয় নিশ্চয় সেগুলি পড়েছেন। শ্যামাপ্রসাদ লিখেছেন, 'পাকিস্তান হোক আর নাই হোক, আমরা বাংলার বর্তমান সীমানার মধ্যে দুটি প্রদেশ গঠন করার দাবী করছি।' কেন? তার উত্তরও তিনি চিঠিতেই দিয়েছেন, 'ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনায় যেরকম ভাবা হয়েছে সেরকম একটা শিথিল কেন্দ্রীয় সরকার স্থাপিত হলে বাংলায় আমাদের কোনরকম নিরাপত্তা থাকবে না।' এগুলি কি পৃথক আবাসভূমির দাবি নয়?

বঙ্কিমচন্দ্র সাম্প্রদায়িক নন, এটা প্রমাণ করার জন্য সমালোচক মহাশয় রেজাউল করিম এবং মীজানুর হোসেনের মতো কয়েক জনের নাম লিখেছেন। কিন্তু তিনি 'খোলা মনে' অনুসন্ধান করলে বঙ্কিমচন্দ্রকে সাম্প্রদায়িক বলেছেন এরকম কয়েক শ ব্যক্তির নাম পেতেন। আমি শুধু জয়ন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপন্যাসে সমাজদৃষ্টি: বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ' (কলকাতা ১৯৯০) গ্রন্থ থেকে খানিকটা অংশ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি 'বঙ্কিমের মোটিফের আর একটি অপ্রকাশ্য অংশ আছে, যা নিগূঢ় তাগিদ হিসাবে তাঁকে মুসলমান বিরোধিতার দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। হিন্দুধর্মের রক্ষণশীল অংশের মুসলিম বিরোধিতা ছিল খুবই প্রকট। শ্রেণীবদ্ধতা ও আচার সর্বস্বতার কারণে সনাতন ধর্ম ক্রমেই জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। এই সত্যকে আড়াল করার জন্য বিধর্মী মুসলমানদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে দায়িত্ব সেরেছেন তাঁরা। সনাতনপন্থী বঙ্কিমের মনেও মুসলমানদ্রোহিতা একটা নির্যুক্তিক সংস্কার তৈরি করে দিয়েছিল। বাংলার মুসলমান শাসনের শেষ দিককার প্রশাসনিক অব্যবস্থা ইতিহাসবেত্তা বঙ্কিমের পীড়ারাই কারণ হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ চিত্তের সেই প্রতিক্রিয়ার চিহ্ন ফুটে বেরিয়েছে আনন্দমঠ উপন্যাসে। মৃণালিনীর হেমচন্দ্রের মিশন অসফল ও অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল। আনন্দমঠে ক্রমে সেই প্রতিরোধের সার্থক জবাব মিলল। মুসলমানদের সম্পর্কে বঙ্কিমের বিরূপ প্রতিক্রিয়া এতই প্রবল ছিল যে স্থানে অস্থানে অসংলগ্ন যুক্তিহীন সংলাপ তাঁকে পেয়ে বসত। বিবিধ প্রবন্ধের ইতিহাস বিষয়ক কয়েকটি রচনা থেকে মুসলমান সম্বন্ধে বঙ্কিমের ব্যবহৃত বিশেষণের নমুনা এরকম — গো-হত্যাকারী, ক্ষৌরিত চিকুর, আত্মজাতি গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী, মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ ইত্যাদি...। সুতরাং বিরূপ চিত্তসংস্কারের তাগিদ থেকেই বঙ্কিম আনন্দমঠে অজান্তেই মুসলমান বিরূপতার মাঝখানে গিয়ে পড়েছেন।'

সমালোচক মহাশয় দাবি করেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' ও 'আনন্দমঠ' উপন্যাসদ্বয় থেকে ডাইলগ উদ্ধৃত করে তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন, বঙ্কিম কট্টর সাম্প্রদায়িক।' এমন তো হতে পারে না যে, তিনি আমার উদ্ধৃতিগুলি 'ভাল ভাবে পড়েও দেখেননি'। তা হলে তিনি দেখতে পেলেন না কেন

যে, আমি যেগুলি উদ্ধৃত করেছি তার মধ্যে শুধু সংলাপই নেই, বঙ্কিমের নিজের বর্ণনাও আছে। সে বর্ণনা ইংরেজ বিরোধিতার নয়, মুসলমান শাসকশ্রেণীর বিরোধিতাও নয়; গ্রাম্য লোকের মুসলমান দেখলেই তাড়িয়ে মারতে যাওয়ার, রাতে দলবদ্ধভাবে মুসলমানদের পাড়ায় গিয়ে সর্বস্ব লুঠ করার, অনেক যবন নিহত হওয়ার, অনেক মুসলমানের দাড়ি ফেলে গায়ে মাটি মেখে হরিনাম করার, দলে দলে ত্রস্ত মুসলমানদের নগরাভিমুখে ধাবিত হওয়ার। মাননীয় সমালোচক মহাশয়ের কাছে প্রশ্ন, এগুলি কি সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন নয়?

একথা স্বীকার করতেই হবে যে, গল্প-উপন্যাস-নাটকে ব্যবহৃত অনেক সংলাপই লেখকের নিজের কথা না-ও হতে পারে। যেন গান্ধীকে নিয়ে কোনও উপন্যাস লিখতে গেলে গান্ধীর মত যেমন সংলাপ ঠাঁই পাবে তেমনই গান্ধীবিরোধী মুসলিম লিগ এবং হিন্দু মহাসভার নেতাদের মতও সংলাপে উঠে আসতে পারে। আর এই তিন মতের সবগুলি সংলাপই লেখকের নিজের কথা না-ও হতে পারে। এক্ষেত্রে দেখতে হবে লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় কি এবং সেই প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপায়িত করতে আলোচ্য সংলাপের প্রয়োজন ছিল কি না। যদি লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় আপত্তিজনক হয় কিংবা প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপায়িত করতে অপরিহার্য নয় এমন কোনও আপত্তিজনক সংলাপ বা মন্তব্য ব্যবহার করেন তবে লেখক তার দায় এড়াতে পারেন না। 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি অনেক উপন্যাসে বঙ্কিমের প্রতিপাদ্য বিষয়ই আপত্তিজনক। তাছাড়া প্রতিপাদ্য বিষয়কে রূপায়িত করতে অপরিহার্য নয়, এরকম অনেক মুসলমান-বিরোধী মন্তব্য বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে করেছেন। এরপরেও মানতে হবে, বঙ্কিম সাম্প্রদায়িক নন। কেন? সমালোচক মহাশয়ের ব্যাখ্যা, 'উদ্ধৃত অংশে মুসলিমবিরোধী যে সব ঝাঁঝালো বক্তব্য আছে, তার মধ্য দিয়ে লেখক ছুঁৎমার্গীদের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ রচনা করতে চেয়েছেন, এ ধারণা করাও অসমীচিন হবে না।' জানি না সমালোচক মহাশয় নিজের বোঝার ক্ষমতার প্রতি ব্যঙ্গ রচনার জন্যই এরকম 'চাইল্ডিশ' মন্তব্য করেছেন কি না! না হলে উপন্যাসগুলি 'ভালভাবে' পড়ার পর কোনও সুস্থমস্তিষ্কসম্পন্ন লোকের পক্ষে এরকম ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়।

সমালোচক মহাশয় দাবি করেছেন, '... বহু বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমান জনতার মধ্যে বর্তমান সমালোচকের যে ভাবমূর্তি আছে, তাতে গ্রন্থকারের দেওয়া ব্যাড সার্টিফিকেট কিছুই দাগ কাটতে পারবে না।' আমার প্রশ্ন, শুধু মুসলমান জনতার মধ্যে কেন? অমুসলমান জনতার মধ্যে নয় কেন? তিনি কি ধরেই নিয়েছেন যে, তিনি যে সব ভুল পরিসংখ্যান, বিকৃত তথ্য এবং অন্যান্য সিদ্ধান্ত ব্যবহার করেছেন এবং আমি সে সব উল্লেখ করেছি তার জন্য অমুসলমান জনতার মধ্যে তাঁর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হওয়ার কোনও রকম সম্ভাবনাই নেই? এটা কি ধরনের মানসিকতা তা সমালোচক মহাশয় নিজেই ভেবে দেখবেন।

আমি জানি না, 'বহু বিস্তৃত অঞ্চলের মুসলমান জনতার মধ্যে' তাঁর ভাবমূর্তি কী রকম! জানি না, তিনি যেরকম ভুল, বিকৃত, অন্যায্য, একপেশে ও 'চাইল্ডিশ' সমালোচনা লিখেছেন এবং আমি সেগুলি ধরিয়ে দেওয়ার ফলে তাঁর সেই ভাবমূর্তিতে 'কিছু দাগ কাটতে পারবে' কি না। কিন্তু তাতে কি প্রমাণ হয়? নেহরু, আজাদ প্রভৃতি নেতারা যাই বলুন তাতে কি 'মুসলমান জনতার মধ্যে' জিন্নার ভাবমূর্তিতে দাগ কাটতে পেরেছিল। পারলে ১৯৪৫–৪৬ সালের নির্বাচনে সব মুসলমান আসনগুলি জিন্নার নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগের দখলে যেত না। তাতে কি প্রমাণ হয় যে, জিন্না যা করেছিলেন বা বলেছিলেন তা সব ঠিক? সমালোচক মহাশয় কি বলেন! এরকম দাবি করে তিনি কি নিজেকেই হাস্যম্পদ প্রমাণ করেননি? □

বাংলাদেশে চতুরঙ্গের পরিবেশক
পাঠক সমাবেশ
১৭/এ, আজিজ মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা

কাঙাল হরিনাথ

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ সংখ্যা চতুরঙ্গে শ্রদ্ধেয় চিত্তব্রত পালিত একটি মহৎ কর্তব্য পালন করেছেন — তিনি 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' সংকলন থেকে কিছু উৎকৃষ্ট নমুনা তুলে দিয়ে কাঙাল হরিনাথের কথা আলোচনা করেছেন।

এখন থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে আমাদের গ্রামের লাইব্রেরিতে 'গ্রামবার্তা'র পুরাতন ফাইল দেখে তার গুরুত্ব বুঝিনি। ৫৯ বছর আগে কলকাতায় এসে 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার তরুণ লেখক হিসাবে প্রবীণ সম্পাদক রায় জলধর সেন বাহাদুরের সংস্পর্শে আসি। তিনিই ছিলেন 'রবিবাসর'-সাহিত্যসভার সর্বাধ্যক্ষ অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট। তাঁর কাছে কাঙাল হরিনাথের অনেক কাহিনী শুনি ও তাঁর লেখা জীবনী পড়ি।

গত বইমেলার সময় বাংলাদেশ থেকে শওকত ওসমান কলকাতায় এলে দক্ষিণ কলকাতায় একটি সভায় তাঁকে সংবর্ধনা জানানো হয়। সেখানে আমার সভাপতির ভাষণে পূর্ববঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যিক মীর মশারফ হোসেনের সঙ্গে তাঁর পরম বান্ধব হরিনাথের কথা ওঠে। সভায় কাঙাল হরিনাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক পারিজাত মজুমদারের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে অনুষ্ঠিত কাঙাল হরিনাথের তিরোধানের শতবর্ষ (১৯৯৬) পালনে প্রকাশিত একখানি পুস্তিকা উপহার দেন। কাঙাল হরিনাথের জীবনী নিয়ে নির্মীয়মান একটি তথ্যচিত্রে আমাকে কিছু বলতে বলেন এবং যথাসময়ে তাও চিত্রায়িত হয়। রবিবাসরে সেই চিত্রটি প্রদর্শন করে কাঙাল হরিনাথের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে চতুরঙ্গে প্রকাশিত কাঙাল হরিনাথের রচনার নমুনাগুলি প্রকাশ বিশেষ সময়োচিত হয়েছে। এজন্য লেখক ও সম্পাদক উভয়কেই সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাই। বাঙালি কাঙাল হরিনাথকে পুনর্বার স্মরণ করছে। নমস্কার।

সন্তোষকুমার দে
সম্পাদক-রবিবাসর
৪৯বি গোবিন্দপুর রোড, কলকাতা-৪৫

সন্তোষকুমার ঘোষের 'চলার পথে'-এর সমালোচনা

(১)

প্রয়াত সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের একটি গ্রন্থ সমালোচনার অজুহাতে শ্রীশরৎকুমার মুখোপাধ্যায় (চতুরঙ্গ, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৪০৪) যা সব লিখেছেন, তা তাঁর ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রসূত অশোভন কটাক্ষ এবং চতুরঙ্গের মতো সমৃদ্ধ ঐতিহ্যশালী পত্রিকার পাতাকে কলঙ্কিত করেছে। এর প্রতিবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমরা যারা সুদীর্ঘকাল সন্তোষকুমার ঘোষের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে ছিলাম, তারা তাঁকে বন্ধুবৎসল, পরোপকারী, সর্বাঙ্গে শিল্পী একজন মহৎ মানুষ হিসাবেই জানি। শ্রীমুখোপাধ্যায় কানে শুনেই (তাঁরই উক্তি: 'শুনতে পাই') শ্রদ্ধেয় সন্তোষদা সম্পর্কে যেসব অভিযোগের ফিরিস্তি দিয়েছেন, তা একেবারে মিথ্যা, মিথ্যা এবং মিথ্যা। ছয়ের দশকে তাঁর হাতে যে-ক্ষমতা ছিল, তা প্রকৃতপক্ষে সব দৈনিকের বেতনভোগী সম্পাদকেরই থাকে। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার তো তিনি করেনই নি, বরং আনন্দবাজারকে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ করার কাজে প্রয়োগ করেছিলেন। মতি নন্দী, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এবং এই পত্রলেখককে তিনি আনন্দবাজারের সঙ্গে যুক্ত করেন। শুধু তা-ই নয়, আরও অনেককে তিনি উপযুক্ত সম্মান দিয়ে যথাযোগ্য স্থানে বসান এবং আনন্দবাজার তারই ফলে বাংলা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে উজ্জ্বলতম স্থানটি অধিকার করেছিল। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উল্লেখ থেকে বিরত থাকাই শোভন। তবে সন্তোষদার একটি চিঠিতে 'কত মেজাজ দেখিয়েছি। গালমন্দ করেছি...' এটুকু উক্তি থেকে শ্রীমুখোপাধ্যায় নিজের যে মনগড়া ধারণার ভিত্তি তৈরিতে সচেষ্ট হয়েছেন, তা উদ্ভট। কারণ মেজাজ দেখানো বা গালমন্দ করার সঙ্গে সন্তোষদার তথাকথিত ক্ষমতার কোনও সম্পর্ক ছিল না। ওই প্রবণতা অনেক মানুষেরই থাকে এবং ওটা নিছক ব্যক্তি-স্বভাব। এই পত্রলেখকের তো কোনও ক্ষমতাই ছিল না। তা সত্ত্বেও আনন্দবাজারের অনেকেই সাক্ষি, আমিও যখন-তখন প্রচণ্ড মেজাজ দেখিয়েছি। অগ্রজ সহকর্মী এবং এমনকী, বিখ্যাত ব্যক্তিদের মুখোমুখি যাচ্ছেতাই গালমন্দ করেছি। অপমান করেছি।

আবার পরে ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। আনন্দবাজারের এক প্রবীণ সাহিত্যিককে একদিন তর্কের পরিণামে তাঁর মুখের উপর 'আপনি সাম্প্রদায়িক' বলেছি। পরে আবার তাঁর সঙ্গে আপনা-আপনি স্বাভাবিক. সম্পর্ক ফিরে এসেছে। এঁরা সবাই জানতেন, আমি রাগি। সন্তোষদার মেজাজ ছিল এই ধরনের। তদুপরি তিনি ছিলেন প্রচণ্ড আবেগপ্রবণ মানুষ। তাঁর ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিরা জানেন, তাঁর মধ্যে ছিল এক অবুঝ বালক। সাংবাদিকতার দিকে অধিকতর মনোযোগই ক্রমে সাহিত্যে তাঁর ব্যর্থতার কারণ হয়ে উঠেছিল। এটা তিনি পরে বুঝতে পারেন এবং সেই ব্যর্থতার জ্বালায় তিনি ছটফট করতেন। আর স্তাবকতা বা চাটুকারিতা? দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি, স্তাবকতা বা চাটুকারিতা টের পেলেই ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে তিনি ঘর থেকে চলে যেতে বলতেন। একদা আমি তাঁর একটি লেখার প্রশংসা করায় তিনি আমার দিকে পেপার ওয়েট ছুড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু তারপরই তিনি অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন। এ শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়। অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। যিনি একদা তাঁকে তাঁর অফিসের ঘরে মেরে হাত ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি পরে তাঁকে ক্ষমা করার জন্য পাগল হয়ে ছুটে বেড়িয়েছিলেন। শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় এর সাক্ষী। শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের চাকরি যায়নি। শ্যামল নিজে পদত্যাগ করেছিল। সন্তোষদা সমরেশ বসুর 'বিবর'-কে 'বাংলা সাহিত্যের মাইলস্টোন' বলে দেশ পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রয়াত সমরেশের সঙ্গে তাঁর মধুর সম্পর্কের কথা সবার জানা। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়-ই বা কেন তাঁর 'লৌহ আলিঙ্গন থেকে' পালিয়ে বাঁচবেন? এই উদ্ভট বাক্যের অর্থ কী? অনেক কথা বলা যেত। সে-কথা ব্যক্তিগত বলে বিরত থাকলাম।

শ্রীমুখোপাধ্যায় এম. জে. আকবরের সঙ্গে তুলনা টেনেছেন। আলু ও আলুবোখারা এক নয়। তা ছাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায় জানেন না, আকবর যে পরিমাণ ক্ষমতা ভোগ করতেন, তার এক-তৃতীয়াংশ সন্তোষদার ছিল না। আকবর সাহেবের স্বেচ্ছাচারিতার কথাও তাঁর জানা নেই। বস্তুত ছয়ের দশকের শেষাশেষি সন্তোষদাকে ক্রমশ ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছিল। তারপর তাঁকে বিস্তর চামচিকে লাথি মেরেছে। অপরিমিত ব্যয়, উড়নচণ্ডী স্বভাবের জন্য তারপর তাঁকে বাধ্য হয়ে চাকরি করতে হয়েছে। শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর ক্যান্সারের যে কারণ আবিষ্কার করেছেন, তা থিসিস আকারে লিখে বিশ্বের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞদের কাছে পাঠান। হাস্যকর ব্যাপার! ক্যান্সারের কারণ সম্পর্কে এখনও নিঃসংশয় হবার মতো প্রমাণ মেলেনি। তাছাড়া শ্রীমুখোপাধ্যায় জানেন না, অনুরূপ ব্যর্থতা বা স্ট্রেসের ঘটনা আকবরসাহেবের জীবনেও ঘটেছে। এখনও তাঁর ক্যান্সার হয়েছে বলে জানি না।

সৈয়াদ মুস্তাফা সিরাজ
৩৭/১ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-১৭

(২)

চতুরঙ্গ পত্রিকার বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ সংখ্যাতে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'সফলতার শেষ কথা' শীর্ষক রচনাতে সন্তোষকুমার ঘোষের 'চলার পথে' গ্রন্থটির সমালোচনা করেছেন।

সামান্য কিছু ব্যাজস্তুতির আড়ালে প্রায় আড়াই পৃষ্ঠার গ্রন্থ সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মানুষ সন্তোষকুমার এবং তাঁর সাংবাদিক বৃত্তির নিখাদ নিন্দা করে শরৎ যে কি সন্তোষ পেলেন জানি না, তবে পূর্বাপর বিচার করে আমার মনে হয়েছে যে শরৎ এক বিকৃত রুচির ফাঁদে আটকে আছেন। পূর্বাপর বিচারে আমি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পরে অন্য একটি বাংলা পত্রিকাতে শক্তি প্রসঙ্গে শরৎ মুখোপাধ্যায়ের লেখাটির কথা মনে করাতে চাই। উভয় ক্ষেত্রেই অসূয়া-স্পৃষ্ট শরৎ যে মানবিক সত্যকে অবজ্ঞা করেছেন তা হচ্ছে—Man wars not with dead. শরৎ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'অনিয়মিত ও পীড়াদায়ক জীবনযাপন থেকে সন্তোষকুমার ঘোষ পঁয়ষট্টি বছরের আয়ু পেয়েছিলেন।' হতে পারে—সংযমহীন জীবনাচরণ ও প্রতিভার সাজুয্য সারা বিশ্বে অনেক আছে। শরৎ কিন্তু সন্তোষ ঘোষের প্রতিভা স্বীকার করেন না, কারণ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সন্তোষ ঘোষ চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবার দাবিদার এবং শরতের মতে সাংবাদিকতা একটা বৃত্তি, তাতে সাফল্য ও অর্থ উপার্জন করা যায়। কিন্তু সেই সুনাম ক্ষণস্থায়ী। তাই কি? নিজস্ব বৃত্তিতে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে বেশ কিছু ডাক্তার বা ব্যারিস্টার স্মরণীয় হয়ে আছেন। শিশির ভাদুড়ী বা সমরেশ বসু স্ব স্ব বৃত্তিনির্ভর অর্থ উপার্জন করেও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাই বৃত্তির নিরিখে প্রতিভার বিচার না করাই ভাল।

সন্তোষকুমার ঘোষ একটি সাধারণ দৈনিক পত্রিকাকে নেতৃত্ব দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠান রূপে মর্যাদা দিতে পেরেছিলেন এবং ভারতীয় ভাষাতে সর্বাধিক প্রচারিত পত্রিকার স্তরে উন্নীত করেছেন—তার জন্যে তাঁকে দাপটেই কাজ করতে হবে, ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহারে প্রয়োজনে রুক্ষও হতে হবে, না হলে পুরনো প্রতিষ্ঠানের স্থবির, নির্লিপ্ত, গয়ংগচ্ছ ভাব কাটত না। মালিকপক্ষ সেটা স্বীকার করতেন বলেই সন্তোষকুমারের বেতন রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি এবং তাঁর রোগের রাজকীয় চিকিৎসা

হয়েছে। এতে শরৎবাবুর উষ্মা কেন? সন্তোষকুমার যদি তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ রাষ্ট্রপতির চেয়ে বেশি মাইনে পাওয়ার কথা জনে জনে নয়, একজনকে বলে তৃপ্ত হাত চান, সেটা তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই কথা শুনে ফেলে তাঁর মৃত্যুর পরে অনাকাঙ্ক্ষিত ও অযাচিত ভাবে কেউ যদি সেটা অহংকার বলে প্রচার করতে চান সেটাই অস্বাভাবিক ও বিকৃত মানসিকতা। নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রমুখ প্রসঙ্গে জনশ্রুতি-নির্ভর কাদা শরৎ একজন মৃত মানুষের গায়ে না ছেটালেই শোভন হত। মুখচোরা কৃতী সাহিত্যিককেও চাকরির ক্ষেত্রে প্রমোশনের জন্যে কর্মদক্ষতার উপরে নির্ভর করতে হয়। প্রতিষ্ঠানের উন্নতিকল্পে এই ধরনের কঠিন ও নাতিজনপ্রিয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল বলে প্রতিষ্ঠানটির উন্নতি অনিবার্য হয়েছে এবং অবারিত হয়েছে সন্তোষ ঘোষের প্রতি অনেকের বিরাগ। প্রেস ক্লাবে তাঁর আবক্ষ মর্মরমূর্তি যে স্থাপিত হয়নি, সেটা আমাদেরই লজ্জা। অধস্তন কর্মীকে বসতে না বললে বসে না—এই বিশ্বে সব প্রতিষ্ঠানের রীতি, সন্তোষ ঘোষ এই প্রথার স্রষ্টা নন। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সুবোধ ঘোষের মতো হাতেই লিখতে হবে? ডিক্টেশন দিয়ে লেখালে কি এমন ক্ষতি?

সন্তোষকুমার ঘোষ পরিচালিত বাংলাভাষার দৈনিক পত্রিকাটি সর্বতোমুখী সাফল্য অর্জন করবার পরেই প্রতিষ্ঠানটি নতুন ছেলে মেয়েদের নিয়ে ইংরাজি সাপ্তাহিক ও দৈনিক নিয়ে এগোতে পেরেছিল। সেই প্রসঙ্গে এম. জে. আকবরের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য এবং শরৎ মুখোপাধ্যায় তাঁর মধ্যে সফল পেশাদারি ম্যানেজারের গুণ দেখলে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু এম. জে. আকবরের সাফল্যের ঘাড়ে কেন বন্দুক রাখতে হবে সন্তোষ ঘোষকে তাক্ করতে হলে? এক সাধারণ প্রতিষ্ঠানের পুরনো লোকেদের নিয়ে বাংলা ভাষার পত্রিকাকে সাফল্যের শিখরে নিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও সন্তোষ ঘোষকে যদি অপেশাদার ম্যানেজারের তকমা দেওয়া হয়, তখন সেটা উদ্দেশ্যমূলক মনে হতেই পারে। সৈন্যাধ্যক্ষরা সন্ধ্যেবেলা হুকুম দিয়ে ডিনার খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে—এটা আমার অল্প-পড়া ইতিহাসে বিশেষ পাইনি। রোমেল মিত্রপক্ষকে ধোঁকা দেওয়ার কোনও পদ্ধতি চালু করবার হুকুম দিয়েও বিনিদ্র রাত কাটাতেন সেই পদ্ধতিতে আরও ব্যাপক অকল্পনীয়তা আনতে। জেনারেল প্যাটন যুদ্ধের গোলাগুলির মধ্যে নিশ্চিন্তে ডিনার খেতেন। কিন্তু প্রায়ই রাতের অন্ধকারে ফ্রন্টে চলে যেতেন। তাঁর পরিকল্পনা মাফিক সব কাজ হচ্ছে কি না দেখতে।

শরৎ লিখেছেন, 'সন্তোষকুমার ঘোষের চরিত্রে পেশাদারি গুণ ছিল না। কাজ নিয়ে তাঁর গর্ববোধ ছিল।' সাফল্য যদি যোগ্যতার মাপকাঠি হয় সেখানে পদ্ধতিকে অপেশাদার বলা যায় কি? কাজ নিয়ে গর্ববোধ করার মধ্যেই বা দোষের কি আছে যদি গর্ব করবার মতো কৃতিত্ব কারও থাকে? সুন্দরী রমণী আর সফল পুরুষ গর্বিত হলেও মানিয়ে যায়। শরতের মতে তিনি 'মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছেন'—এই হাওয়ায় ভাসা হঠকারি মন্তব্যের বিরুদ্ধে সত্তরের দশকের বহু নবীন সাহিত্যিক ও সঙ্গীতশিল্পী সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত। সন্তোষবাবু মেজাজি লোক ছিলেন, কিন্তু অচেনা কবি সাহিত্যিকদের উৎসাহ দিয়ে কাছে ডেকে নিতেও পরাঙ্মুখ ছিলেন না।

রবীন্দ্রসঙ্গীত যাঁর শিরায় শিরায় নিত্য বহমান, যিনি ভাবেন, এ সঙ্গীত যেন শেষ অনুভবে অপৌরুষেয় 'শ্রুতি'—তাঁর সম্পর্কেও যখন শরৎ বলেন, এই মানুষটির বোধ 'শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্র দর্শনে মিশতে গিয়ে শিকড়ে আর উপযুক্ত মাটি পায়নি'—তখন আমাদের প্রতিবাদের ভাষা থমকে যায়।

'চলার পথে' যেহেতু দিনলিপি, পত্রাবলী এবং একটি ছোট গল্পের সমাহার, তাতে অবশ্যই ব্যক্তিকে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। সেই দিনলিপি বা পত্রাবলীতে লেখকের এবং উদ্দিষ্ট ব্যক্তির যে অনন্য পরিচয় ও অন্তর্লোকের স্বরূপ উদঘাটিত হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে কোনও আলোচনা না করে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় এখানে গ্রন্থ সমালোচনার বাহানাতে ব্যক্তি সন্তোষকুমার ঘোষের চরিত্র হননে নেমেছেন এবং এই অপকীর্তির বাহন হতে হল চতুরঙ্গের মতো ঐতিহ্যশালী পত্রিকাকে—এটাই দুঃখের। শরৎ এই জিনিস করেছিলেন শক্তির মৃত্যুর পরেও। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের সমকালীন সাহিত্যিক কৃতী বন্ধুরা অনেকেই বেশ অস্বস্তিতে দিন কাটাচ্ছেন।

শরৎবাবু, আপনার কবিতা আমাদের ভাল লাগে। উপন্যাস গল্প কম লেখেন কেন? আপনার উপন্যাসও জনপ্রিয় হওয়ার দাবি রাখে। আমরা জানি কৃত্তিবাস পত্রিকার পিছনে আপনার অবদানের কথা। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারছি না, শরতের আকাশে এত কালো মেঘ কেন?

সৃজন বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭ এম ইস্ট রোড, কলকাতা-১২

(৩)

আমি আপনার পত্রিকার নিয়মিত পাঠক এবং শ্রদ্ধাশীল প্রশংসক। বাণিজ্যায়ন ও দুর্বৃত্তায়নের যুগে মিডিয়ার অশুভ প্রভাবে সাহিত্যপত্রগুলি আজ প্রায় নিশ্চিহ্ন। চতুরঙ্গ টিমটিম করে জ্বলছে। ভয় হয়, এই বুঝি নিবে যাবে।

আপনি যে পাঠকপ্রিয় হওয়ার জন্য আপোস করেন না তা এবারের সংখ্যায় শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের গ্রন্থ সমালোচনায়

পুনরায় প্রকাশ পেয়েছে। শরৎবাবু যা লিখেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং প্রাসঙ্গিক। কেননা আলোচ্য গ্রন্থটি সন্তোষকুমার ঘোষের আত্মজীবনীমূলক রচনা। তাঁর স্বীকারোক্তিতে ভরা। শরৎবাবু সঙ্গত কারণে সেই সব স্বীকারোক্তির পশ্চাৎপট উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। এর মধ্যে কোনও ব্যক্তিগত উষ্মা নেই। আমার মনে পড়ে এই ভদ্রলোকই বছর চার পাঁচ আগে সন্তোষকুমার ঘোষের ছোটগল্প নিয়ে দীর্ঘ সমালোচনা লিখেছিলেন দেশ পত্রিকায় এবং সেটি ছিল প্রশংসায় ভরা। শিল্পী হিসাবে প্রশংসার্হ কিন্তু মানুষ হিসাবে হীনপ্রকৃতির — এমন দৃষ্টান্ত দুলর্ভ নয় এবং সব মিলিয়ে মানুষটিকে দেখা আমাদের কর্তব্য।

জীবিতকালে সন্তোষকুমার ঘোষ একটি cassette-এ কয়েকজন ব্যক্তি সম্পর্কে তাঁর মনোভাব রেকর্ড করে গিয়েছিলেন। মৃত্যুর পর সেই আলোচনা একটি ছোট পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সেটি পড়ে বোঝা যায় তিনি প্রকৃত ব্যক্তি কেমন ছিলেন। কী অদম্য ছিল তাঁর দুঃসহ অহমিকা।

বনশ্রী চৌধুরী

নর্থ সাইড, আদ্রা, পুরুলিয়া

(৪)

বৈশাখ-আষাঢ় ১৪০৪ সংখ্যা চতুরঙ্গে গ্রন্থসমালোচনায় 'সফলতার শেষ কথা' শিরোনামে কবি শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় 'চলার পথে'-র গ্রন্থকার প্রয়াত সন্তোষকুমার ঘোষ সম্পর্কে এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় দিয়েছেন যা কবিতার থেকেও মনোরম মনে হয়েছে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার প্রকাশিত বুলেটিনের সাম্প্রতিক সংখ্যায় ইংরাজিতে লিখিত তাঁর আমেরিকা ও কানাডা ভ্রমণের যে চমৎকার বিবরণ পড়েছি এই গ্রন্থ সমালোচনাটি তার থেকেও প্রাণস্পর্শী হয়েছে। যাঁরা সন্তোষবাবুকে চিনতেন ও অন্তরঙ্গভাবে জানতেন, তাঁরা রচনাটিতে তাঁর জীবন্ত উপস্থিতি অনুভব করবেন। গ্রন্থসমালোচনা ছাপিয়ে উঠেছে গ্রন্থকারের প্রখর ব্যক্তিত্ব।

সন্তোষকুমার দে

সম্পাদক—রবিবাসর

৪৯ বি গোবিন্দপুর রোড, কলকাতা-৪৫

সমালোচকের কৈফিয়ৎ

প্রথমেই বলে রাখি, প্রয়াত সাহিত্যিক সন্তোষকুমার ঘোষের সঙ্গে কখনও আমার মনোমালিন্য হয়নি। আমি তাঁর গল্পের একজন ভক্ত পাঠক, একথা অন্য পত্রিকায় বিশ্লেষণ করে জানিয়েছি। এখানেও গোপন করিনি।

দ্বিতীয় কথা, আলোচিত 'চলার পথে' গ্রন্থটি হল ব্যক্তি সন্তোষকুমারের এক অসাধারণ পরিচিতি। অনাবৃত স্বীকারোক্তিমূলক। তাই এখানে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের আলোচনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তার ইন্ধন তিনিই যুগিয়েছেন। যে ব্যক্তি প্রায়ই স্বজন ও সহকর্মীকে গালমন্দ করে আর তারপর ক্ষমা চায়, সে আসলে একজন অব্যবস্থিতচিত্ত মানুষ। একথা বলার মধ্যে দোষ কোথায়?

সিরাজ সাহেবের চিঠিতে যে পাঁচজন (এবং আরও) প্রতিশ্রুতিমান সাহিত্যিককে আনন্দবাজারভুক্ত করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে, আমি বলব, তার প্রয়োজন ছিল না। সেই সময় প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করতে এই সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল এবং অবশ্যই এর ফলে বাংলা সাংবাদিকতায় সাহিত্যরসের আস্বাদ এসেছে। কিন্তু বিনতস্বরে জানাই, পরবর্তীকালে তাঁদের কারুর কারুর সৃজনশীল লেখায় সাংবাদিক অগভীরতা প্রবেশ করে বাংলা সাহিত্যের ক্ষতিও করেছে। পাঠক খোলা মন নিয়ে অবস্থানটি বিচার করুন।

আমি মনে করি, সাংবাদিকতা একটি পেশামাত্র, এতে উৎকর্ষ বিধানের সুযোগ থাকলেও সাহিত্য দীর্ঘস্থায়ী শিল্পের সাধনা। আমি এ-ও মনে করি, শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির জীবন ও কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করতে হলে আড়াল না রেখে তার সবটাই মানুষকে জানতে দিতে হবে। এই তাগিদ আছে বলে বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র, রবিশংকর পর্যন্ত মনীষীদের জীবনকথা নতুন করে লেখা হচ্ছে।

আমার আর কিছু বলার নেই। পত্রলেখকরাই আমার বক্তব্য বিশদ করে দিয়েছেন। তবে আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনা প্রকাশ করে চতুরঙ্গ-এর মতো অভিজাত পত্রিকার গৌরব যদি ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে, সেজন্য আমি দুঃখিত।

শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

মেঘমল্লার

১৮/৩, গড়িয়াহাট রোড, কলকাতা-১৯

সম্পাদকের নিবেদন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী নিঃসন্দেহে আমাদের জাতীয় জীবনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অর্ধশতাব্দীর সাফল্য এবং ব্যর্থতাগুলি সমীক্ষার এটি একটি উপলক্ষও বটে। এই সমীক্ষার ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দূরদর্শন আকাশবাণী ইত্যাদি সংবাদ মাধ্যমগুলির উৎসাহপূর্ণ উদ্যোগ সপ্রশংস উল্লেখের দাবি রাখে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক এবং আধা অ্যাকাডেমিক সংস্থাগুলির উদ্যোগ। আপাতদৃষ্টে মনে হয় হেন বিষয় নেই যা এই সম্মিলিত ব্যাপক সমীক্ষাপর্ব থেকে বাদ গেছে। তবুও যেসব বিষয়ে আলোকপাত অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে কিংবা যেসব বিষয়ে আদৌ মনোযোগ দেওয়া হয়নি সেগুলি নিয়ে ভবিষ্যতে চতুরঙ্গেও কিছু কিছু নিবন্ধ ছাপার পরিকল্পনা আমাদের আছে।

চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যার প্রস্তুতি পর্ব চলাকালেই আমরা হারিয়েছি নাট্যজগতের প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব শম্ভু মিত্রকে। তাঁর জীবনকাহিনী এবং সৃজনশীলতা নিয়েও আলোচনা ইতিমধ্যে কম হয়নি। সেসবের পুনরাবৃত্তি না করে কিংবদন্তির এই নায়ক সম্পর্কে বর্তমান চতুরঙ্গ-পাঠকদের উপলব্ধির সীমাকে আরও কিছুটা প্রসারিত করার চেষ্টা আমরা করেছি। এ ব্যাপারে কুমার রায়ের দীর্ঘ নিবন্ধ ছাড়াও আমরা সাহায্য নিয়েছি শম্ভু মিত্রের লেখার। চতুরঙ্গের পুরাতন সংখ্যাগুলি ঘাঁটলেই বোঝা যায় একসময় শম্ভু মিত্র ছিলেন এই পত্রিকার নিয়মিত লেখক এবং নাট্য সমালোচক। তাঁর সেসব লেখা থেকে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটি নিবন্ধ আমরা বর্তমান সংখ্যায় পুনর্মুদ্রিত করেছি উল্লেখিত উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। ভবিষ্যতে পুরাতন চতুরঙ্গ থেকে তাঁর এ ধরনের আরও লেখা পুনর্মুদ্রণের বাসনা আমাদের রইল। প্রয়াত শম্ভু মিত্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে এটাই হবে আমাদের অন্যতম পদ্ধতি।

শম্ভু মিত্রের সঙ্গে চতুরঙ্গের সম্পর্ক তাঁর জীবনের শেষ অধ্যায় অবধি অটুট ছিল। যে সময়টায় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার তরফে ইন্টারভিউ ইত্যাদির আর্জি শুনলে সরাসরি না করে দেওয়াই হয়ে উঠেছিল শম্ভু মিত্রের রেওয়াজ সেই পর্বেও চতুরঙ্গের আবেদন তিনি নাকচ করেননি। ১৯৯২-এর মাঝামাঝি সময়ে সলিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরুন্ধতী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্মিলিত ভাবে তাঁর যে দীর্ঘ সাক্ষাৎকারটি চতুরঙ্গের জন্য নিয়েছিলেন সেটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ওয়াকিবহাল পাঠকমাত্রেরই স্মরণে থাকার কথা। সাক্ষাৎকারটি 'শম্ভু মিত্র: একটি পরিচয়' নামে ছাপা হয়েছিল ১৯৯২ এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর সংখ্যায়।

জীবনের শেষের দিনগুলিতেও শম্ভু মিত্র ছিলেন চতুরঙ্গ পত্রিকার আগ্রহী পাঠক। পাছে চতুরঙ্গ পাওয়ায় কোনও বিঘ্ন ঘটে তাই ২৮/১এ, গড়িয়াহাট রোড থেকে বাসস্থান বদল করে ৬৫/২১ জ্যোতিষ রায় রোডে যাওয়ার সময় সেকথা নিজের হাতে চিঠি লিখে চতুরঙ্গ সম্পাদককে জানাতে তিনি ভোলেননি। সেই পত্রে চতুরঙ্গের বর্তমান সংখ্যাগুলি সম্পর্কে এক লাইন প্রশংসা বাক্যও ছিল। শম্ভু মিত্রের মতো মানুষের প্রশংসার যোগ্য হয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে শ্লাঘার বিষয়। তাই তাঁর সংক্ষিপ্ত পত্রটি ছেপে আমাদের প্রাপ্তির আনন্দ পাঠকদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাইলাম।

সবিনয় নিবেদন

চতুরঙ্গের শ্রাবণ সংখ্যা পেয়েছি। প্রবন্ধগুলো পড়তে খুবই ভাল লাগছে। — অনেক ধন্যবাদ।

একটা খবর হয়তো জানাতে ভুলেছি। আমার বাসস্থানের বদল হয়েছে। নতুন ঠিকানা হোল:

....

....

নমস্কারান্তে

ইতি—

শম্ভু মিত্র

৪।৯।৯৪